বিপুলা এ পৃথিবী

উত্তর ক্যানাডার জলপথ

উত্তর আমেরিকার মধ্যে ক্যানাডা যে শুধু একটি সুবৃহৎ দেশতাহা নহে। প্রকৃতি ইহাকে নানা সৌন্দর্যে বিভূষিতকরিয়াছেন। পৃথিবীর সুবৃহৎ হ্রদগুলির মধ্যে কয়েকটি এইদেশেই অবস্থিত। তাহা ছাড়া কয়েকটি বড় বড় নদীও এই দেশের শোভাবর্ধন করিয়াছে। ক্যানাডার উত্তরাংশে বহুসহস্র একর জমি এখনো সম্পূর্ণ অনাবাদী অবস্থায় পতিতআছে। ইউরোপের জনবহুল দেশগুলি হইতে উৎসাহী ওসাহসী লোকেরা উত্তর ক্যানাডার নানাস্থানে গিয়াগবর্নমেন্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া বসবাসকরিতেছে।

ক্যানাডার জলপথগুলি বিচিত্র সৌন্দর্যময়। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথমে ক্যানাডার পশুলোম ব্যবসায়ের প্রথম পত্তনহয়। তখন রেল স্টিমার ছিল না, এই জলপথগুলিতে ডোঙাচালাইয়া ইউরোপীয় বণিকদল এই বিস্তৃত দেশের নানাঅজানা ও অনাবিষ্কৃত পথে যাইয়া আদিম অধিবাসীগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সদ্ভাব স্থাপন করেন ও তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া ধীরে ধীরে এই বিস্তৃত পশুলোম ব্যবসা গড়িয়াতুলিতে থাকেন। হড্‌সন্ নদীর উত্তর তীর তখনজনমানবশূন্য ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল, দুর্দান্ত ইন্ডিয়ানজাতির বিভিন্ন শাখা বর্শা ও ধনুর্বাণ হস্তে নদীর নানাঘাঁটিতে বিদেশী শত্রুর বক্ষে লক্ষ্যভেদ করিবার আগ্রহে ওৎ পাতিয়া থাকিত, কিন্তু উক্ত বণিকদল তাহাতে ভয় খাইয়াপিছাইয়া যায় নাই—সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্যকরিয়া তাহার উত্তরেহড্‌সন্ উপসাগর ও উত্তর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সকল ভূভাগেই পশুলোম সংগ্রহকরিবার কুঠী ও আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। কালে বিখ্যাত "হড্‌সন্ বে কোম্পানি" এইভাবেই গড়িয়া উঠে। শুনিলেআশ্চর্য হইবার কথা বটে কিন্তু ইহা সত্য যে, উত্তরক্যানাডার জলপথ সমূহে ডোঙায় চড়িয়া মেকেঞ্জি নদীর মুখ হইতে উত্তর মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারিহাজার মাইল একাদিক্রমে যাওয়া চলে।

রেলপথ নির্মিত হইবার পরে ডোঙায় চড়িবার সুবিধাওবর্ধিত হইয়াছে, কারণ বড়বড় নদীগুলির ধারের শহরগুলিরসব প্রায় রেলপথের ধারে অবস্থিত। কেহ যদি ডোঙায়চড়িয়া উত্তর ক্যানাডার জলপথগুলির বিচিত্র সৌন্দর্য, বৃহৎহ্রদগুলির নীরব শান্তি ও জনমানবহীন পাইন অরণ্যের রহস্যউপভোগ করিতে চান, তবে যে-কোনো শহরে রেল হইতে নামিয়া নদীপথ ধরিতে পারেন। যাঁহার সময় সংক্ষেপ, তিনিচার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি ভ্রমণ শেষ করিতেপারেন, কিন্তু সবটা খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে গেলে দুই তিনমাসের কমে হইবার কথা নহে। পূর্বে কোনো একটা বিশেষপথ ধরিবার পূর্বে একশত দেড়শত মাইল ডোঙা বাহিয়াবৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত, কিন্তু আজকাল ইউনাইটেড স্টেটসের পূর্ব বা উত্তরাংশ যে কোনো শহর হইতে রওনাহইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভ্রমণকারী অভীষ্ট স্থানেউপনীত হইয়া ডোঙা-ভ্রমণ শুরু করিতে পারেন।

ম্যানিটোবা প্রদেশের উত্তরার্ধ হইতেহড্‌সন্ উপসাগরপর্যন্ত ভূভাগের জলপথ সমূহের সুবিধা বেশি থাকায় এইঅংশই ডোঙা-ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ইহা প্রায়ই পর্বতসঙ্কুল ও অরণ্যময়, সমুদ্রগর্ভ হইতে এই অংশেরউচ্চতা প্রায় বারোশত ফুট, স্থানে স্থানে আরো বেশি। বড় বড় নদীগুলির অধিকাংশই এই প্রদেশে অবস্থিত, মাঝে মাঝে বড় ছোট নানা আকারের হ্রদ আছে। নদীর তীরে ঘন অরণ্য, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই উচ্চ উচ্চপর্বতমালা—অপূর্ব রহস্যে আচ্ছন্ন বিচিত্র অরণ্য ভূ-ভাগ।এই প্রদেশের অধিকাংশ কৃষিকার্যের উপযুক্ত নয় বলিয়া অনেক স্থলে আদৌ মনুষ্য-বসতি নাই—দিনের পর দিনডোঙায় চড়িয়া গেলেও হয়তো কোনো কোনো অংশে একটিও মানুষ চোখে পড়ে না। নদীর এ-বাঁকে ও-বাঁকে নবনব সৌন্দর্য প্রতি মুহুর্তে চোখে পড়িতে থাকে, কোথাও স্বচ্ছসলিল হ্রদ, গম্ভীরনাদী জলপ্রপাত, ছোট বড় দ্বীপ, পাইনও সরল গাছের বন। বেশি পশ্চিম ঘেঁষিয়া যাওয়া চলে না, কারণ এই অংশ অত্যন্ত পর্বতময়, অনেক বাধা

বিপত্তি ওমাঝে মাঝে প্রস্তরসঙ্কুল rapid থাকার দরুন এই দিকেরনদীগুলিতে ডোঙা চালানো একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এইঅংশের প্রাকৃতিক দৃশ্যই আবার সর্বাপেক্ষা রমণীয়।

ক্যানাডার নদীপথগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদেরসৌন্দর্য কখনো একঘেয়ে হইয়া যায় না। কখনো হ্রদবক্ষের শান্তি; কখনো সুবাসিত পাইন অরণ্যের ঘন ছায়া, কখনোনৃত্যশীল জলপ্রপাত, কখনো উচ্চাবচ ভূমি, কখনো বা রুক্ষগ্রানাইট শিলার বন্ধুর সৌন্দর্য, মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলিয়া রাত্রি কাটাইবার উপযুক্ত মনোরম দ্বীপ। Rapid-গুলি কিছুবিপজ্জনক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকিলে এ পথে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই। তবে নিতান্ত যেখানেডোঙা চালানো অসম্ভব, সে সকল স্থানে ভোঙা জল হইতেউঠাইয়া লইয়া অরণ্যের ভিতরকার পথ ধরিতেহয়—পথ-প্রদর্শকেরা এই সকল পথ চিনে বা জানে। ভ্রমণের সময় ডোঙাগুলিতে বেশি বোঝাই না লওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ডোঙা উঠাইয়া অরণ্যপথে বহিয়া লইয়া যাইবার সময় বোঝাই বেশি থাকিলে বড় অসুবিধা ঘটে। সব সময় বাহকমেলে না।

ক্যানাডার উত্তরতম প্রদেশগুলিতে এখনো রেল যায় নাই, ডোঙায় চড়িয়াই সেসব স্থানে পৌঁছিতে হয়। রেলেপৌঁছানো যায় না বলিয়াই এই প্রদেশের সৌন্দর্য আরোবেশি, রহস্য আরো বিচিত্র। ইন্ডিয়ান জাতিদের গাছেরছালের তৈয়ারি ডোঙাই এই দেশে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল, অবশ্য আজকাল ভ্রমণকারীগণ নানারূপ উন্নত প্রণালীতে ডোঙা ব্যবহার করিতেছেন না এমন নহে। কিন্তু এ দেশের জলপথগুলি যে ধরনের, তাহাতে ইন্ডিয়ানদের গাছের ছালের ডোঙাই এদেশের পক্ষে বেশি উপযোগী। নদী ওহ্রদগুলি মৎস্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যাঁহারা মাছ ধরিতে জানেনবা ভালোবাসেন, ভ্রমণকালে তাঁহারা নিছক ভ্রমণের আনন্দছাড়া শিকারের আনন্দও উপভোগ করিয়া থাকেন, খাদ্যবস্তুরও অভাব হয় না।

কিন্তু যাঁহারা পরগাছা সংগ্রহ করিতে ভালোবাসেন, তাঁহাদের আনন্দই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি হইবার কথা—কারণ এই প্রদেশের অরণ্যগুলিতে নানা অদ্ভুতধরনের পরগাছা আছে। নদীপথগুলি হইতে কিছুদূরে নিবিড়অরণ্যমধ্যে খোঁজ করিলে বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞাত নানাশ্রেণীর পরগাছা পাওয়া যায়—ইউরোপীয়বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিশেষজ্ঞগণ মাঝে মাঝে ইহার সন্ধানেআসেন ও সময়ে সময়ে জীবনকে বিপন্ন করিয়াও নতুনধরনের পরগাছা ও অন্যান্য গাছপালা লইয়া যান।

যাঁহারা জনবহুল নগরগুলির কর্মকোলাহল হইতেকিছুদিন অবসর লইতে চান, প্রাণের শান্তি ফিরিয়া পাইতেইচ্ছা করেন, এই নির্জন ভূভাগের শান্ত বনরাজি, স্তব্ধরাত্রিরমহনীয় সৌন্দর্য, মুক্ত প্রকৃতির অবাধ লীলারঙ্গ তাঁহাদেরক্লান্ত দেহমনকে নূতন আয়ু দান করিবে সন্দেহ নাই।

তবে খুব বেশিদিন এ প্রদেশ এরূপ থাকিবে কিনা বলাযায় না। পশুচর্ম ব্যবসা যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে ওনদীপথগুলির উত্তর পার্শ্বের কুঠীগুলির সংখ্যা বৎসরেবৎসরে যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে বোধ হয় দশ পনেরোবৎসরের মধ্যেই এই সকল অরণ্য জনপদে পরিণত হইবে। বড় বড় বন-কাষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ গবর্নমেন্টের নিকট হইতেইজারা লইতেছে এবং মৎস্য ব্যবসায়ীগণও কলের জাল প্রভৃতি লইয়া স্টিমার ও নৌকা আমদানি শুরু করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া দক্ষিণ ক্যানাডাতে জমি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিক হইতে লোকজনকৃষিকার্যের জন্য জমি খুঁজিতে আসিয়া ছোটোখাটো উপনিবেশস্থাপন করিতেছে।

কিলিমান্জারো—আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত

আজ হইতে সাতাত্তর বৎসর পূর্বে জার্মান মিশনারি রেব্ম্যানতাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়া যান যে তিনি দূর হইতে একটিউচ্চ পর্বতের চূড়া দেখিয়াছেন; প্রথমে উহা মেঘ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শক বলে উহামেঘ নহে “বেরেডি”—ঠাণ্ডা। ক্রমে আরো নিকটে আসিয়াতিনি বুঝিতে পারেন উহা মেঘ নহে, বহু দূরবর্তী কোনোউচ্চ পর্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরদেশ। এই সর্বপ্রথমকিলিমান্জারো পর্বত ইয়োরোপীয়দের নজরে পড়িল।

ইহার পূর্বে ইউরোপের কেহ জানিত না যে বিষুবরেখা হইতে মাত্র ৩ ডিগ্রি দূরে একটি বিশাল তুষারাবৃত পর্বতেরঅস্তিত্ব আছে। সুতরাং মিশনারি রেব্ম্যানের কথা কেহশোনে নাই, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। রেব্ম্যানের পক্ষেওএকটু মুশকিল হইয়াছিল—তিনি জোর করিয়া কোনো কথা বলিতে পারেন নাই। কিলিমান্জারোর শিখরদেশ বৎসরের অধিকাংশ সময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা মেঘ কি তুষার এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরমনেও সকলের কথা শুনিবার পরে সন্দেহ উপস্থিতহইয়াছিল। এ লইয়া তিনি আর কোনো তর্ক করেন নাই।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, এ সম্বন্ধে এত রাশি রাশি প্রমাণ জমিতে শুরু করিল যে বৈজ্ঞানিকগণব্যাপারটাকে আর হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না।ইহার কিছুকাল পরেই নানা দিক হইতে ভৌগোলিকঅভিযান আরম্ভ হইল—শুধু কিলিমান্জারো আবিষ্কারেরজন্য নয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ পর্বত উচ্চ তাহারএকটি তুলনামূলক হিসাব প্রস্তুতের জন্য এবং আফ্রিকা মহাদেশে এরূপ কোনো উচ্চ পর্বত আছে কিনা তাহাঅনুসন্ধানকরিয়া দেখিবার জন্য। একটি দুইটি করিয়া উপরি উপরি কয়েকটি দল কিলিমান্জারো পর্বত খুঁজিয়া বাহির করিতে রওনা হন ও সে সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কারকরেন। ওই সকল অভিযানের বিবরণ পড়িলে বিস্মিত হইতে হয় শুধু এই ভাবিয়া যে সাতাত্তর বৎসরের মধ্যে বর্তমান সভ্যতা কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর পর্বত ও অরণ্যময় প্রদেশেও নিজের অধিকার বিস্তারকরিতেছে। পূর্বে কিলিমান্জারো পর্বত ছিল আফ্রিকার অতিদুর্গম স্থানে অবস্থিত—সেখানে পৌঁছাইতে হইলে জনবিরল অরণ্য, মরুভূমি, নানা পর্বত ও দুর্দান্ত জাতিদের দেশের মধ্যদিয়া বহুদিন ধরিয়া যাইতে হইত। আর এখন সেই কিলিমান্জারো পর্বত ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ট্রেনেমাত্র আঠারোঘণ্টার পথ। যে সকল ব্যক্তি এই পর্বত সম্বন্ধেতথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ডা. হ্যান্স মেয়ারের নাম সর্বপ্রথমেউল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকদিন ধরিয়া কিলিমান্জারোপর্বতের সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৃক্ষলতা ওজীবজন্তু সম্বন্ধে যে বই লিখিয়া গিয়াছেন, এখনো পর্যন্ত তাহাই কিলিমান্জারো সম্বন্ধে একমাত্র মূল্যবান গ্রন্থ। তখন ইহার নিকটবর্তী দেশসমূহে জার্মানেরা নিজেদের অধিকার বিস্তার কার্য শুরু করিয়াছিল এবং হয়তো কালে ইহার সমগ্রঅংশই জার্মানদিগের অধিকারে আসিত। কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ পাঠকেরা জানেন কিরূপে অল্পকাল মধ্যেই এই সকলপ্রদেশে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে কিলিমান্জারো পর্বত ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার সীমারমধ্যে ঢুকিয়া গেল। এই ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার বর্তমান নামকেনিয়া।

জার্মানি এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল—সেটাখুবই স্বাভাবিক; কারণ কিলিমান্জারো পর্বতের ম্যাপ প্রস্তুতকরা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারকার্য সবটাই তাহাদেরইউদ্যোগে হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার্মান সম্রাট কাইজারউইলিয়ম এই পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানাউচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারআত্মীয় মহারানী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করেন,—পর্বতটা তাঁহাকে জন্মদিনের উপহার স্বরূপ দেওয়া হউক। ইহারঅল্পদিন পরেই তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার সীমার কিছু পরিবর্তন ঘটিল এবং কিলিমান্জারো পর্বত পুনরায় জার্মানির অধিকৃত ভূভাগে ঢুকিয়া গেল।

সুবিখ্যাত পর্যটক স্যার হ্যারি জনস্টন ইংরাজদিগেরমধ্যে সর্বপ্রথম এই পর্বতে আরোহণ করেন এবং ইহার উদ্ভিদ সংস্থান বিষয়ে স্যার হ্যারি জনস্টনের যে বই আছেতাহা একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ১৯১৪ সালে মি. ওয়েস্টনামে জনৈক ইংরেজ পর্যটক ইহার সর্বোচ্চ শিখরেআরোহণ করেন ও পর্বতের ক্রেটারেও নামেন, এবং দুর্গম বরফাবৃত অধিত্যকা পার হইয়া ইহার আর একটি উচ্চ শিখরযেখানে এ পর্যন্ত কেহ যায় নাই সেখানে গিয়া ফটোগ্রাফসংগ্রহ করেন।

দূর হইতে কিলিমান্জারো পর্বতের দৃশ্য অতীব সুন্দর।অন্যান্য পর্বতের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না—বিশেষ করিয়াএইজন্য যে, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ পর্বত আরোঅনেক আছে কিন্তু সেগুলি কোনো একটি বড় পর্বতমালারঅংশমাত্র। কিন্তু কিলিমান্জারো সেরূপ নহে। ইহা যেখানে অবস্থিত সেখানে অন্য কোনো পর্বত নাই। নিম্নের সমতলভূমি হইতে একেবারে খাড়া প্রায় বিশ হাজার ফিট উচ্চ ইহার তুষারাবৃত শিখরের সে অপূর্ব সৌন্দর্য না দেখিলেবোঝা যায় না। প্রধানত ইহার দুইটি শিখর—কিবো (উচ্চতাপ্রায় ২০,০০০ ফিট) ও মায়েনজী (১৭,০০০ ফিট)—মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইল ব্যাপী একটি বিস্তৃত অধিত্যকা প্রদেশ। যেদিক হইতেই দৃষ্টিপাত করা যায়, এই পর্বতের দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর যে সমগ্র আফ্রিকা ভূখণ্ডে একমাত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ছাড়া এত সুন্দর জিনিস আর নাই।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন শিখর দেশের তুষার গলিতেআরম্ভ করে তখন নানা দিক হইতে জল পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। চিরতুষাররেখার অর্ধমাইলের মধ্যেই ঘন আরণ্যভূমি—এই বনের নানা অংশ দিয়া এইসকল প্রপাতের জল নীচে নামিতে নামিতে সবগুলি মিশিয়াযায় ও মাত্র দুইটি বড় বড় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে।সমতলভূমি হইতে এই জলপ্রপাতের দৃশ্য অতি গম্ভীর।পর্বতের উভয়দিকে ঢালু জমিতে আজকাল অনেকেকৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা এবংপ্রধানত কফি চাষের উপযোগী। এই অংশে ইউরোপীয়দেরপরিচালিত বহু কষিক্ষেত্র আছে—স্থানীয় অধিবাসীরাওসম্প্রতি কিছু কিছু জমি লইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবেতাহারা প্রধানত আলু, ভুট্টা ও তরিতরকারির চাষ করে।কফিক্ষেত্র পরিচালনের জন্য যে বিপুল মূলধনের আবশ্যক তাহা তাহাদিগের নাই। তবে

অধিবাসীদিগের অনেকেই এই সকল ক্ষেত্রে মজুরের কাজ করিয়া কফি উৎপাদনের প্রণালীশিখিয়া লইতেছে। আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে ইহারাএদিকে মন দিবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই অধিবাসীগণ অসভ্য ওরক্তপিপাসু বর্বর ছিল। তাহারা সব সময়ই পরস্পরেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত এবং কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। নরবলি ও নরমাংস ভোজন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহারাঅত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও কৃষিজীবী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে না ভুলিলেও প্রায়ই তাহার মধ্যে যায়না।ইহারা প্রধানত কলার চাষ করিয়া থাকে। উত্তর অংশেরঢালু জমি প্রায়ই কফিক্ষেত্র ও কলাবাগান। কৃষিক্ষেত্রসমূহেরকিছু উপর হইতে ঘন অরণ্যময় ঢালুর আরম্ভ। এই অরণ্যসাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহে—ইহা অত্যন্ত নিবিড় ও প্রায়এগারো হাজার ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত। বনে হস্তী খুব বেশী, —যদিও গরিলা, বানর ও অন্যান্য জন্তুও আছে। আদিমঅধিবাসীগণ খুব ভালো শিকারি নয় বলিয়া বোধ হয়হস্তীবংশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেক সময় অরণ্যেরপ্রান্তবর্তী কফিক্ষেত্রসমূহ ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করাশক্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহারা দলবদ্ধভাবেকৃষিক্ষেত্রসমূহের উপর আসিয়া পড়ে এবং মাইলের পর মাইল ধরিয়া গ্রাম ও ফসল একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াআবার বনে পলাইয়া যায়। একবার ইহাদের উপদ্রব এতবেশি বাড়িয়াছিল যে গবর্নমেন্ট ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযানকরেন ও এক বৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টার ফলে পাঁচশত হাতিমারা পড়ে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত বেশি যে এতমারিয়াও তাহাদের উপদ্রব বিশেষ কিছু কমে নাই।

আজকাল কিলিমান্জারো পর্বতে আরোহণ খুব দুঃসাধ্য নহে। উত্তর ও পূর্ব দিকের ঢালু দিয়া যাওয়াই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক; একদিকে বড় বড় পথ তৈয়ারি করা হইয়াছেএবং অনেক ধনী ও অবস্থাপন্ন ইউরোপীয় কফিক্ষেত্রের মালিক পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের বাসস্থান করিয়াছেন। এইবাসস্থান অবশ্য শিখরদেশে বা অরণ্যময় ঢালুর নিকটে নয়; তাহাদের অনেক নীচে। আশা করা যায়, অল্পদিনের মধ্যেএই পর্বত দেখিতে কৌতূহলী আমেরিকান ট্যুরিস্টদের ভিড়হইবে।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত ভূভাগ

অস্ট্রেলিয়ার মতো সুবৃহৎ দেশের কোথায় কি আছে এখনোপর্যন্ত সমুদয় আবিষ্কৃত হয় নাই বা সভ্য মানুষও সকল স্থানেএখনো বসতি স্থাপন করে নাই। বিশেষ করিয়া পশ্চিমঅস্ট্রেলিয়ায় এখনো সভ্য মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প; পঞ্চাশবৎসর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার এই অংশে একটিও সভ্য লোকেরবাস ছিল না, এখনো যে খুব বেশি তাহা নহে। সর্বসুদ্ধ সাতহাজার লোকের উপর ইহাদের সংখ্যা হইবে না। অবশ্যএকদিক হইতে দেখিতে গেলে খুব অল্পদিনেই লোকসংখ্যা এত বাড়িয়াছে,কারণ ১৮৬৩ সালে এই অংশে রোবাক উপসাগরের উপকূলে (Roebuck Bay) সর্বপ্রথম উপনিবেশস্থাপিত হয়। তখনো এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই অজ্ঞাতছিল—১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারক ও পর্যটক স্যার জন্ ফরেস্ট এদিকে অনেকদিন ধরিয়া ভ্রমণকরিয়াছিলেন। উপকূল হইতে বহুদূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে ঢুকিয়া গিয়া তিনি ইহার ম্যাপ তৈয়ারি করেন। কয়েক বৎসরপরেই খনিবিদ হল্ ও স্লাটারি যখন এদেশে সোনার খনিআবিষ্কার করিলেন তখন হইতেই হু হু করিয়া লোকসংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিল।

অস্ট্রেলিয়ার এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিচমৎকার—যাঁহারা বারোমাস ঘরে বসিয়া কাটান, তাঁহারাপৃথিবীর এইসব অপূর্ব দেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনোধারণাই করিতে পারিবেন না।

উপসাগরের কূলে কূলে সর্বত্রই ম্যানগ্রোভ গাছের বন।এ ধরনের গাছ কেবল লোনা জলের সোঁতার ধারে জন্মিয়াথাকে—পৃথিবীর সর্বত্রই নদী যেখানে আসিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে, এমনস্থানে কর্দমাক্ত উপকূলভাগে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যানগ্রোভ বনের ধারে এসব অঞ্চলেলক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যাইবে—কতকনীলবর্ণ কিন্তু বেশির ভাগই টক্‌টকে লাল। কতকগুলি কাঁকড়াহলুদ রং-এরও আছে; তবে এগুলি আরো বড় বড়—একএক দলে দুইতিন শত থাকে, উত্যক্ত হইলে মানুষকেআক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসে।

অস্ট্রেলিয়ার এ অংশে নদীর মুখেও সমুদ্রে যথেষ্ট মাছপাওয়া যায়। তারের একপ্রকার ফাঁদ পাতিয়া মাছ ধরিবারপদ্ধতি এদেশে প্রচলিত আছে। নদীখালের মুখে ভাঁটারসময় তারের তৈয়ারি ফাঁদগুলি পাতিয়া রাখা হয়, জোয়ারের সময় মাছ ঢুকিয়া পড়ে কিন্তু আর বাহির হইতেপারে না—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে দেখা যায়এক-একটা ফাঁদ মাছে ভরিয়া গিয়াছে। এই দেশেরনিকটবর্তী সমুদ্রগর্ভ হইতে দশ বৎসরে এগারো লক্ষডলারের ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হইয়াছে।

রোবাক উপসাগর হইতে কিং সাউন্ড পর্যন্ত প্রায় এগারোশত মাইল উপকূলভাগ আজকাল মুক্তা উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীগণের উপনিবেশে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে বৎসরে যত ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হয়—তাহারতিন-চতুর্থাংশ এখান হইতে পাওয়া যায়। মুক্তা ব্যবসায়ীগণযে ডুবুরি নিযুক্ত করে, তাহাদের অধিকাংশ এশিয়াবাসী কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ জাতি। অস্ট্রেলিয়ার আইনানুসারে তথায়ইহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; কেবলমাত্র মুক্তা উত্তোলনের কার্যেইহাদের লাগানো যাইতে পারে—আইনের একটি বিশেষধারাঅনুসারে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলভাগ প্রবালের ঝাড়ে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত সাবধান হইয়া জাহাজ নাচালাইলে—এইসকল স্থানে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা খুব বেশি। স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে জাহাজ একেবারেইচলে না।

ডুগং নামক সামুদ্রিক জন্তু এ অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ডুগং (Dugong) স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনেকটাতিমির মতো দেখিতে, অবশ্য তিমি অপেক্ষা অনেক ছোট।ডুগং-এর গাত্রচর্ম অত্যন্ত মোটা ও দুর্ভেদ্য। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ অনেক সময় ছোট ছোট ভেলায় করিয়াডুগং শিকার করিতে যাইয়া থাকে—তাহাদের অস্ত্রের মধ্যেবর্শা সম্বল কিন্তু বর্শা দ্বারা ডুগং প্রায়ই মারা পড়ে না, অনেকবর্শা ভাঙিবার পরে হয়তো কাহারও ভাগ্যে একটা জুটিয়া যায়। ডুগং-এর মাংস খাইতে সুস্বাদু—সভ্য ও অসভ্য তাবৎ লোকেই খুব আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। ইহার চর্বি হইতে একপ্রকার মূল্যবান তৈল পাওয়া যায়, ঔষধার্থেব্যবহৃত হয় বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ইহারমূল্য খুব বেশি। তিমি শিকারের ব্যবসায় যেরূপ লাভজনক, ডুগং শিকার তাহা অপেক্ষা কম লাভের নহে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্রই আজকাল এ ব্যবসায় ছড়াইয়াপড়িতেছে।

উপকূল হইতে কিছুদূরে পাহাড়ের উপর ঘন অরণ্য। এই সকল অরণ্যে নানা মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে এখনো পর্যন্ত কাষ্ঠের ব্যবসায়ের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। নদীর মুখে নৌকা চালাইয়া যাওয়া অনেক সময় বিপজ্জনক, কারণ এই সকল স্থান বড় বড় কুমিরে পরিপূর্ণ, তাহারা এত হিংস্র যে অনেক সময় নৌকায় উঠিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মুক্তা ব্যবসায়ীগণ আজকালমোটরবোট ব্যবহার করে, মোটরবোটের শব্দে ইহারা ভয় পাইয়া তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

স্থানীয় আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথাপ্রচলিত আছে। ইহারা নিজেদের পিঠ বা বুকে একপ্রকারঝিনুক দিয়া চামড়ার উপর লম্বা লম্বা দাগ কাটে, পরে কোনো লতার রস মাখাইয়া তাহা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করে, কোনো কোনো স্থলে ম্যানগ্রোভ দেশের তলাকার কর্দমও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এক এক জাতীয় চিহ্ন এক এক রূপ—কেহ পিঠে গোল দাগ কাটে, কেহ কেহ কতকগুলিসমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করে—পিঠের ও বুকের এই চিহ্ন দেখিয়া কে কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা ধরিতে পারা যায়।

কয়েকটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক এ অঞ্চলে ফলের চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। তাঁহাদের বাগানে উষ্ণমণ্ডলের নানাবিধ ফুল ফল পাওয়া যায়। ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ভেড়া ও ছাগল পোষাও এঅঞ্চলের একটি লাভজনক কারবার।

এ প্রদেশের আদিম অধিবাসীগণ ভারী দুর্দান্ত ও কলহপ্রিয়।ইহাদের মধ্যে মালয়ী রক্ত আছে, সম্ভবত প্রাচীনকালেমুক্তাসংগ্রহের লোভে মালয়ের অধিবাসীরা এ সকলঅঞ্চলে আসিত। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য কয়েকটি পাদ্রি তাঁহাদের মিশন স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পোট জর্জ মিশন খুব ভালো করিতেছে। এই মিশনের কর্তা মি. উইলসন্ সস্ত্রীক এখানে বাস করেন।

একপ্রকার সামুদ্রিক সাপকে প্রায়ই জলের মধ্যে কুণ্ডলীপাকাইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল সাপঅত্যন্ত বিষধর, দৈর্ঘ্যে এক একটা বারো-তেরো ফিটের কমনহে।

নেপিয়ার উপকূলে স্পেনীয় দিকের আর একটি মিশনআছে—ইহা প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়। এ স্থানটি খুবই নির্জন, সারা বৎসরের মধ্যে হয়তো একবার কোনোসভ্য মানুষ এদিকে আসে। খাইবার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না।মিশনের নিজেদের ছোট জাহাজে করিয়া দুইশত মাইল দূরেক্রম নামক ছোট শহর হইতে জিনিসপত্র আনিতেহয়। তবেআজকাল মিশন বাড়ির চারিপাশের জমিতে ইঁহারা ধান ওতামাকের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ উপসাগরে লাক্রোস নামে একটি ছোটবসতিশূন্য দ্বীপ আছে—এই দ্বীপের কূলে বড় বড় সামুদ্রিককচ্ছপের আড্ডা। শুধুমাত্র চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিলেইকচ্ছপেরা আর নড়িতে পারে না—এই উপায়ে একবার একরাত্রের মধ্যে

জনৈক শিকারি তিরাশিটি কচ্ছপধরিয়াছিলেন। এই সকল কচ্ছপ এতবড় যে মানুষকে পিঠে অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। মি. জ্যাকসন্ নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এই সকল সামুদ্রিককচ্ছপের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিবারজন্য এখানে বাস করিতেছেন।

ফরেস্ট নদীর ধারে আর একটি মিশন স্থাপিতহইয়াছে—ফরেস্ট নদীর তীরবর্তী অসভ্য জাতিগণের মধ্যেসভ্যতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই মিশনের প্রতিষ্ঠা।ইঁহারাও সম্প্রতি কৃষিকর্ম আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ গরুও ভেড়ার ব্যবসায়ে মন দিতেছেন। তবে যাতায়াতের ভালো রাস্তা নাই, দেশ শুধু জঙ্গল ও পাহাড়ে ভরা, অভ্যন্তরভাগের অধিকাংশই ঊষর বালুকাময় মরুভূমি—এইসব অসুবিধার জন্য এখনো বিস্তৃতভাবে সভ্য জাতির উপনিবেশ এদেশে গড়িয়া উঠে নাই।

'যাচ্ছি-যাব'র দেশ আফ্রিকা

সোহালি ভাষায় 'বার্ডো কিডোগো' বলে একটা কথা প্রায়ইশোনা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের যে কোনো দেশের যেকোনো জাতই হোক সে জুলু, বাসুতো, মাটাবেল বাকাফির—ওদের মুখের বুলিই—'বার্ডো কিডোগো'।আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত, কায়রো থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত, এই কথাটাই সবাই বোঝে এবং এই কথার অলস ছন্দে নিজেদের জীবনের গতির লয় ওরা বেঁধেছে। কথাটার মানে "একটুখানি অপেক্ষা করো"।আফ্রিকার প্রত্যেক কাজে কথায়, তার বিচিত্র প্রাকৃতিকদৃশ্যাবলীর মধ্যে, তার বড় বড় নদীতে, জলাভূমিতে, কর্দমাক্ত পথে—এই কথার প্রভাব বর্তমান।

যখন আমি কলোরাডো আফ্রিকান্ অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে আফ্রিকা যাই তখন যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই গিয়েছিলাম।আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বন্যজন্তুর চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা। আদিম অধিবাসীদেরও বটে। কিন্তু পূর্বউপকূলের কিলিন্ডিলি বন্দরে যে দিনটিতে পদার্পণ করলাম, সেদিন থেকে আর পশ্চিম উপকূলের লাপোস বন্দরে যে দিন আবার দেশে ফিরবার জন্যে জাহাজে চড়ি সে দিনটি পর্যন্ত প্রত্যেক কাজে পদে পদে অনুভব করেছি, আফ্রিকা ইউরোপ নয়, এখানকার জীবনের তাল দীর্ঘ বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি এখানে কিছু করা যায় না। সবতাতেই দেরি, 'একটুখানি অপেক্ষা করো', 'বার্ডো কিডোগো'—এখানেজলে-হাওয়ায় এর প্রভাব।

কলোরাডো আফ্রিকান অভিযানে যোগদান করবারদুবছর আগে আমি একবার একা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকারকাওকো ভেল্ড ও কালাহারি মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করি। সিংহের দেশের মধ্যে দিয়ে হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেও একবার একটি মাত্র ছাড়া আর কোনো সিংহই দেখিনি। তাইএবার যখন আবার আফ্রিকায় এসে পড়লাম তখনভাবছিলাম, এ দেশের সেই 'যাচ্ছি যাব' বাণীর প্রভাবথেকে মুক্ত হয়েছি কিনা।

কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে মোটর ট্রাক নিয়েআমরা টাঙ্গানিয়াকা প্রদেশের সেরেনপেটি প্রান্তরে তাঁবুফেললাম। সেরেনপেটি সমতলভূমি, বন্যজন্তু বিশেষ করেসিংহের প্রধান আড্ডা। সুতরাং আমরা আমাদের জায়গার নাম দিলাম ক্যাম্প সিম্বা—মাসাই ভাষায় সিম্বা কথার মানে সিংহ। আমাদের তাঁবু থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে একটাগভীর সংকীর্ণ উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানেসিংহ বাস করে।

একমাস ধরে আমরা ক্যামেরা নিয়ে সিংহদের চলচ্চিত্রতুললাম। একটি দুটি নয়, এক একটি দলে পেয়েছিলাম চারটি সিংহ—এদের সংখ্যা কখনো বেড়ে ছয় এবং আটওদাঁড়াত। সিংহ ও সিংহিনী দুই-ই ছিল এদের দলে। সিংহশিকার আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না—তার তোড়জোড়ও ছিলনা।শুধু এদের ছবি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের কাজ।অনেক সময় মাত্র ছ'ফুট দূর থেকে এদের ছবি নিতে হয়েছে, অনেক সময় আমাদের ও সিংহের দলের মধ্যে ব্যবধান ছিলমাত্র একটা পাতলা বেড়া। জঙ্গলের ডালপালা দিয়ে তৈরি।এ রকম বেড়াকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের ভাষায় বলে 'বোমা'।

আমরা একটি মৃত জেব্রাকে এক জায়গায় ফেলেরাখতাম। জেব্রার মাংস সিংহের অতি প্রিয় খাদ্য—মাংসেরগন্ধ পেয়ে দুটি একটি করে সিংহ সিংহিনী জড়ো হত মৃতজেব্রার চারধারে, আমরা সেই সময় ফটো নিতাম।আমাদের সঙ্গে ওদের যেন মিতালি গড়ে উঠেছিল, জেব্রারমাংস বিনামূল্যে খেতে পেয়ে হয়তো বা ওরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েই আমাদের কিছু বলত না, আমরাওওদের কিছু বলতাম না।

সিংহের দল যে কত ধরনের খেলা, লাফালাফি, দৌড়-ঝাঁপ করত জেব্রার মাংস খেতে খেতে, তা আমরাওচোখে দেখবার আগে বিশ্বাস করতাম না যে সিংহ এসবকরতে পারে। তবে মৃত্যু নিয়ে খেলা করছি এ সব সময়েই আমাদের মনে সজাগ থাকত। নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়েনাড়াচাড়া করা আর সিংহ নিয়ে কারবার করা দুই-ই সমান—কখন কি বিপদ ঘটবে, একথা কিছু বলবার জোনেই। মৃত্যু যখন আসবে তখন আসবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে।

আফ্রিকায় একটা কথা প্রচলিত আছে, ‘অনিশ্চয়তাইসিংহের চরিত্রের একমাত্র নিশ্চয়তা’—আমরা সব সময় একথাটি মনে রেখে চলতাম বটে, কিন্তু আমাদের কাজের প্রকৃতি ছিল যে রকম, তাতে দৈবের ওপর নির্ভর করা ছাড়াঅন্য কোনো উপায়ও ছিল না আমাদের।

দশ ফুট বা বড় জোর পনেরো ফুট দূর থেকে ছবিতুলতাম। সিংহ এক লাফে যায় প্রায় আঠারো ফুট। সুতরাংক্রুদ্ধ সিংহের প্রথম ঝম্পের সীমানার মধ্যেই আমরা আরআমাদের চলচ্চিত্রের ক্যামেরা—এস্থলে দৈবের উপর নির্ভর না করে উপায় কি ?

একবার একটি সিংহিনী সম্পূর্ণ অকারণে আমার দিকেছুটে এল এবং ততোধিক অকারণে আমার ছ’ফুট মাত্র দূরে থমকে গেল দাঁড়িয়ে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র পরে সে পনেরো ফুট দূরে বেশ শান্ত নিরীহ পোষ-মানা জন্তুটির মতো বিচরণকরছিল। কেন বা কি মনে করে সে হঠাৎ আমার দিকেবিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল, কেনই বা সে আবার ফিরেগেল—এর খবর কেউ দিতে পারে না, —সিংহ ভয়ানকখামখেয়ালী প্রকৃতির জানোয়ার।

এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে প্রথমে আমার মনে হওয়ার অবকাশই হয়নি—তারপর বিপদ যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন আমি বাতাহতবৃক্ষপত্রের মতো কাঁপতে লাগলাম এবং অনেক কষ্টে বন্দুকটা বাগিয়ে ওর দিকে ধরলাম। সিংহটা আর ছ’ফুট আমার দিকেএগিয়ে এলে আমার কাঁপুনি বা রাইফেল কোনো উপকারইদর্শাত না।

ক্যামেরাতে ছবি তোলবার কাজ যতদিন চলছিল ততদিন সিংহ শিকার করবার কোনো চেষ্টা করিনি বা কোনোকারণেই ওদের বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার করিনি। তাঁবুর সকলের ওপরও আমি এই মর্মেই আদেশ জারি করেছিলাম। এর আগেও আমি কখনো সিংহ শিকারকরিনি এবং দু-দু’বার আফ্রিকার সিংহবহুল অঞ্চলে ভ্রমণকরেও একটা মৃত সিংহের চামড়া ও মুণ্ড যে আমি গর্বের সঙ্গে সকলকে দেখাতে পারতুম না, এতে আমার নিজেরইলজ্জা বোধ হত।

আমরা তাঁবু খাটাবার দু’সপ্তাহ পরে একদিন আমাদেরউপত্যকা থেকে কিছু দূরে একটা হলদে-কেশরওয়ালা বড়সিংহ দেখা গেল। এ সিংহটা আমাদের পরিচিত সিংহ দলের সভ্য নয়, যারা আমাদের ক্যামেরার সামনে খেলাধুলা করে, জেব্রার মাংস খেয়ে ছবি তুলতে দেয়। একটা সিংহিনীর সঙ্গে সে গাছের ছায়ায় শুয়ে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল, দূর থেকে শুভ্র সূর্যালোকের প্রখরতার মধ্যে ওদেরদুটিকে দুটি কালো দাগের মতো দেখাচ্ছিল যেন।

আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ছোট ছোট ঘাসেরবনের ওপর দিয়ে দু’জোড়া কান খাড়া হয়ে উঠতেই আমিবন্দুক বাগিয়ে ধরলাম। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ঘন ঘাসেরবনের মধ্যে থেকে। তার লেজটা একবার ডাইনে একবারবাঁয়ে চাবুকের মতো আন্দোলিত হচ্ছে—এইবার আক্রমণকরতে ছুটে আসবে আমার দিকে, এটা তারই চিহ্ন।

সিংহটা আক্রমণ করত হয়তো, কিন্তু সিংহিনীটা সেইসময় হঠাৎ লাফিয়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ধারের বনের দিকে পালিয়ে গেল—আমার কাছ থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায়কুড়ি গজ। সিংহটা সঙ্গিনীর ব্যবহারে সম্ভবত ক্ষুব্ধ হয়ে আক্রমণ স্থগিত রাখলে এবং ধীরে ধীরে তার অনুসরণকরলে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, বনের মধ্যে ঢোকার আগে সে কৌতূহল চাপতে না পেরে আমার দিকে একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে গেল—আমি সেইসময় গুলি করলাম। সিংহটা তখন বজ্রাহতের মতোই সেখানে পড়ে গেল, গুলিলেগেচে এটা বুঝতে দেরি হল না আমার। আমি আরো কিছু এগিয়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে কয়েক ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়েদু-একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে দেখলাম, সিংহটা নড়েচড়ে না।বন্দুকটা এক জায়গায় রেখে দিয়ে আমি মৃত সিংহেরফটো-তুলবার ব্যবস্থা করছি, সেই সময় বন্দুকের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দলের সব লোক এসে সেখানে পৌঁছল। আমাদের কুলির সর্দার মাইক ওর কেশরাশি সরিয়ে দেখতে চাইল গুলি কোথায় বিঁধেছে। দেখা গেল একটা চোখের মধ্য দিয়ে গুলি গিয়েচে। এমন সোজা চলে গিয়েচেযে চোখের ভ্রু পর্যন্ত অক্ষত আছে।

ফটো তুলবার সুবিধের জন্যে কুলিরা লম্বা লম্বা ঘাস কেটে সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা করতে ব্যস্তহল—ওদের মধ্যে একজন কুলি মৃত সিংহের লেজটা ধরেএক পাশে দেহটা সরাতে যাবে—এমন সময় সিংহটা ভীষণ গর্জন করে উঠলো। সবাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লঙ জাম্পের প্রতিযোগিতার মতো লাফ দিয়ে পিছু হটে গেল। সিংহ ক্রমশ লম্বা

নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো—তার বুক উঠতে নামতে লাগলো, ক্রমশ সে জেগে উঠবে। তাহলে সিংহটা মরেনি, মুর্ছা গিয়েছিলমাত্র। কালবিলম্ব না করেআমি বন্দুকের নল প্রায় ওর গায়ে ঠেকিয়ে পুনরায় গুলিছুঁড়লাম। তাতেই সেটা সাবাড় হল। নিগ্রো কুলিদের মধ্যেযারা ইতিমধ্যে বেগতিক বুঝে গাছে চড়ে বসেছিল, ভরসা পেয়ে তারা আবার নেমে এল।

আমার মনে হয় সিংহ যেন আফ্রিকার বিরাট বন্যপ্রকৃতির প্রতীক। ও কাউকে ভয় করে না। যেখানে সেখানেসগর্বে বিচরণ করে। নিজের তৈরি আইন ছাড়া কারো আইন মানে না। হত্যাই ওর জীবনের মূলমন্ত্র—আফ্রিকার বিশাল বন্য প্রান্তরে বনচারী জীবের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত না হয়েপড়ে—এই তদারক করে বেড়াবার এবং বেড়ে গেলে তার প্রতিকার করবার দায়িত্ব দিয়েই প্রকৃতি যেন ওকেপাঠিয়েচে। সিংহ নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, তবে প্রয়োজন নাবুঝলে সে কখনো পশুহত্যা করে না। হায়েনার মতো নীচপ্রকৃতির হত্যাকারী এবং ভীষণ পেটুক নয় সিংহ। হায়েনারমতো ভীরু কাপুরুষ নয় সিংহ।

আমার পরিচিত এক নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর সিংহেরব্যাপারে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল অল্পদিন পরেই। ওরা আফ্রিকায় এসেছে এই প্রথম, সঙ্গে একজন পাকাশিকারি নিয়ে। কুলিদের মাথায় তাঁবু ও মোট চাপিয়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের অঞ্চলেই হাজির হল। ক্যাম্প সিম্বাথেকে আট মাইল দূরে একটা উপত্যকার মধ্যে আমরা ওয়াটার বাক হরিণ শিকার করতে গিয়েছি—পাহাড়ি পথেরমোড় ঘুরেই দেখলাম ওরা এক জায়গায় তাঁবু ফেলে। কথায়কথায় আলাপ হল। জানা গেল ওরা নাইরোবি শহরেআমাদের কথা শুনেচে এবং আমাদের সঙ্গে অসংখ্যসিংহের প্রতিদিন দেখাশুনো হচ্ছে খবর পেয়ে এই দিকেইএসেচে সুলভ সিংহ শিকারের আশায়। ওদের মধ্যে একজনজিজ্ঞেস করলে, যে জায়গাটায় আমরা তাঁবু ফেলছি এরকাছাকাছি সিংহ আছে তো ?

বুঝলাম লোকগুলি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। টাঙ্গানিয়াকায় সেরেনপেটি প্রান্তরে ঘন ঘাসের বনের মধ্যে তাঁবু ফেলেজিজ্ঞেস করতে এসেচে সিংহ এখানে আছে কিনা। কদিনআগেও ঠিক এই জায়গায় ছ'টা সিংহকে একত্রে দেখেছি। শুধু দেখা নয়, হরিণের মাংস পেটভরে খাইয়ে তাদেরতৃপ্তিসাধন করেছিলামও বটে। ঘটনাটা এইরূপ।

সেদিন আমরা একটা হরিণ শিকার করেছিলাম এবং যখন আমাদের কুলি হরিণের ছালটা ছাড়াচ্ছিল, তখন ছ'টি সিংহ মৃত হরিণের কিছু দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবংমাঝে মাঝে গর্জন করছিল। ছালটা ছাড়ানো হয়ে গেলেমৃতদেহটা আমরা ওদের জন্যে ফেলে রেখে চলেএসেছিলাম।

এই স্থানে আর একদিন আর এক কুলি একটা বড় সিংহিনীর দর্শন পায়—একটা জেব্রা মেরে সে মৃতদেহেরদুদিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আর তাকে চক্রাকারে ঘিরেকতকগুলো শকুনি আর হায়েনা কলরব করছিল। আমিএকদিন এই সিংহিনীর ফটোগ্রাফ নিয়েছিলাম আমাদেরতাঁবুর নিকটবর্তী একটা ঝরনার কাছে।

আমার কুলিরা জানত আমি যে সিংহের ফটোনিই—তাকে হত্যা করি না—সেজন্যে ওরা আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে ওকে মারবার অনিচ্ছা সত্ত্বেওঅনুমতি দিতে হল এবং সিংহিনীর জীবলীলা সাঙ্গ হতে দশমিনিটের বেশি সময় নিলে না এবং সে ঘটনাটি ঘটেছিল যে বড় কাঁটাগাছের তলায়, সেখানেই নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর নিগ্রো পাচক রান্নার বাসনপত্র সাজাচ্ছিল।

এই জায়গার চারিপাশে উঁচুপাহাড় ও পাষাণময়মালভূমি, জলের ধারাটি সব উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে জমা হয় এই সংকীর্ণ উপত্যকার খোঁড়লে—সে জল থাকেওঅনেকদিন। সুতরাং বন্য জন্তু জলপানের জন্যে এখানেসন্ধ্যার পর দলে দলে আসে। সিংহ এখানে দেখা যদি নাযায় তবে টাঙ্গানিয়াকার আর কোনো জায়গায় দেখা যাবে না।

আমাদের নরওয়েবাসী বন্ধুটির সেরাত্রে ভালো নিদ্রাহল না। তিনি ইতিপূর্বে কখনো আফ্রিকায় আসেননি, আফ্রিকার বন্য প্রান্তরের বিচিত্র নৈশ শব্দ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল কিনা জানি না। মোটের উপর নিদ্রার আশা পরিত্যাগ করে তিনি অবশেষে তাঁবুর বাইরে মুক্ত প্রান্তরে নক্ষত্রালোকিত আকাশতলে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করবার মতলবে তাঁবু থেকে বের হলেন।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি মন্দ ছিল না।

কিন্তু বহুদূরবর্তী স্বদেশ নরওয়ে ত্যাগ করবার পূর্বে নিরীহ ভদ্রলোক একটি কাজ করেছিলেন, যার জন্যে সে রাত্রে তাঁকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনিএকটি সাদা এবং কালো ডোরাদার পায়জামা কিনেছিলেন।নৈশভ্রমণের সময় এই পায়জামাটা ছিল পরনে।

হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে তাঁর কানে গেল, কোন্ দিকেযেন দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্চে এবং শব্দটা ক্রমশনিকটবর্তী হচ্চে। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে এক বৃহৎকায় জন্তুকে তিনি তাঁর দিকে ছুটে আসতেদেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন কতকটা ভয়ে এবং কতকটাকৌতূহলে। যখন তিনি দেখলেন সেটা একটা বৃহদাকার সিংহ এবং সিংহটি এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে তাঁকে লক্ষ্যকরেই ছুটে আসচে, তখন তাঁর চলৎশক্তি রহিত হবারউপক্রম হয়েচে।

সিংহটা তাঁর খুব কাছে এসে ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে হঠাৎথেমে দাঁড়ালো এবং তাঁর দিকে বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গেঅল্পক্ষণ চেয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই প্রস্থান করলে। তার ধরন দেখে মনে হবার কথাযে সে রীতিমতো বিরক্ত হয়েচে। এই ব্যাপারটি আমরা পরদিন শুনলাম। সিংহের এরকম অদ্ভুত ব্যবহারেরএকটিমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করতে পারা যায়, তা হচ্চে এই যে, আধ-অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে পায়জামাপরিহিত বন্ধুকে জেব্রা বলে ভুল করেছিল এবং কাছে এসেযখন দেখল যে এই অদ্ভুত জীবটি জেব্রা নয়, তখন তারসন্দেহ হল এ হয়তো কোনোরকম ফাঁদ হবে। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করে ফিরে চলে গেল। এ হল আমারঅনুমান, অন্য কোনো কারণ যে নির্দেশ করা যেতে পারে নাএমন কথা আমি বলব না। আফ্রিকায় ভ্রমণের ফলে অনেকসিংহের সংস্পর্শে এসে ওদের প্রচলিত জনপ্রবাদটিরসত্যতা আমি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছি যে, অনিশ্চয়তাই সিংহের একমাত্র নিশ্চয়তা। অমন খায়খেয়ালীপ্রকৃতির জীব আফ্রিকাতে আর দুটি পাওয়া যাবে না।

মোটের ওপর পরদিন সকালেই ওঁরা জায়গাটা থেকেতাঁবু উঠিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি একস্থানে এসেআড্ডা করলেন। অত যেখানে সিংহের চলাচল, সকলেরপক্ষে সে স্থানটা বাসযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে।

ক্যাম্প সিম্বাতে যখন ছিলাম, মাসাই জাতির বাড়িঘর, গরুবাছুর ও তাদের জীবনপ্রণালীর ফিল্ম তোলবার প্রস্তাবকরি ওদের জাতির সর্দারের কাছে। ওরা বড় দেরি করতেআরম্ভ করে—আফ্রিকার সে চিরন্তন বুলি 'বার্তোকিডোগো'—'হচ্ছে হবে' ! দু মাস লেগেছিল ওদের ফিল্ম তুলতে।

মাসাইদের ব্যাপার যদি বাদ দিই, তবে আমাদের দিন ওখানে বেশ কেটেছিল। তারপর একটা দুর্দৈব উপস্থিত হল, ক্যামেরাটা একদিন বিগড়ে গেল। সেই জঙ্গলে ক্যামেরাসারানোর লোক কোথায় পাই ?সন্ধান নিয়ে জানা গেলগিলগিল বলে একটা গ্রামে একজন ইংরেজ মিস্ত্রি থাকে, সেএ কাজ জানে।

মোটর ট্রাক নিয়ে গিলগিল যাবার পথে মোটর এঞ্জিনেরকি এক গোলমাল হল, সেটা সারাবার জন্যে যেতে হল নাইরোবি শহরে। এই সব ব্যাপারে কেটে গেল তিন সপ্তাহ। হিসেব করে দেখলাম এই তিন সপ্তাহে আমি বিষুবরেখা পারাপার হয়েছি ছ'বার এবং সবসুদ্ধ হাজার মাইল মোটরচালিয়েছি।

আফ্রিকার বন্য প্রকৃতি এ থেকে ভালোই বোঝা যাবে।

এই হাজার মাইল মোটর চালানো ও ছুটোছুটির সময়আমার একটা কথা মনে পড়লো। মাসাই ও পদি জাতীয় লোকেরা কি করে সিংহ শিকার করে, তার একটা ছবিতোলা—জন পনেরো মাসাই বর্শাধারী যোদ্ধাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে ক্যাম্প সিম্বায় রওনা করতে হবে মোটর ট্রাকে, তারপর সেখানে ওরা ওদের সিংহ শিকারের অভিনয়করবে—আমরা তাদের ছবি নেব। তদনুসারে আমি গ্রামেগ্রামে ঘুরে লোক জোগাড় করলাম, তারা রাজি হল, মোটর ট্রাক যোগে তাদের সকলকে সুশৃঙ্খলায় ক্যাম্প সিম্বাতেপাঠিয়ে দেওয়াও গেল।

কিন্তু তারপর বাধলো গোল।

ওরা তাঁবুতে এল বটে, কিন্তু কিছুতেই শিকারের অভিনয়করতে রাজি হয় না। তারা অভিনয় করতে রাজি নয়, সত্যকার সিংহ শিকার করবে। আমরা বললাম, ভালোইতো, তাই কর। সিংহের অভাব কি ?

দু-তিন দিন পরে সিংহ শিকারের সুযোগ উপস্থিত হলওদের। মাসাই জাতির শিকারিরা সিংহ-শিকারের সময় যেরকম সাহস ও কৌশল প্রদর্শন করে, তাতে তাদের বদমেজাজকে সহজেই ক্ষমা করা যায়। এদের সিংহ-শিকারএকটা দেখবার জিনিস। আমরা এর নিখুঁত ছবি তুলেছিলাম এবং সভ্য জগতের প্রায় সকলেই আমাদের ছবিতে এইবিখ্যাত সিংহ শিকার দেখছেন।

ক্যাম্প সিম্বা পরিত্যাগ করবার পূর্বে আমার মনে হলযাদের সাহায্যে আমার ছবি তোলার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাদের প্রতি কিছু সম্মান দেখানো দরকার। আমরাআশপাশের তাঁবুর সকলকে এক বিদায় ভোজে নিমন্ত্রণকরলাম। সবসুদ্ধ লোক হল সতেরো জন—মুক্ত আকাশেরতলায় আমাদের লম্বা ডিনার-টেবিল পাতা হল।

এই সতেরো জন লোকই অবশ্য ইউরোপীয়—এরা আফ্রিকা ভ্রমণে অভিজ্ঞ, নানা বিষয়ে এরা আমাদের সাহায্যকরেছে। সন্ধ্যার পর আমাদের ভোজ আরম্ভ হল, আমাদের ঘিরেসেই বিস্তৃত বন্য প্রান্তরে হায়েনা ও শৃগালকুলের নৈশ চিৎকার যেন ইউরোপে আমেরিকার বড় হোটেলেরভোজের সময় ঐকতান বাদনের কাজ করছিল। সে অদ্ভুতরাত্রি এবং সেই বিদায় ভোজের বিচিত্র পটভূমি আমারবহুদিন মনে থাকবে। শুধু হায়েনা ও শৃগাল নয়, সিংহেরগর্জনও শ্রুত হয়েছিল আমাদের ভোজের সময়।

এর কয়েকদিন পরে আমরা ক্যাম্প থেকে তাঁবু ওঠালাম। এখান থেকে চলে যাবার সময় আমরা চারিপাশে শুকনোঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এখানকার সব ছিল ভালো, কিন্তু এত উইয়ের উপদ্রব আর কোথাও দেখিনি। আমাদেরসব জিনিসে তাদের ভাগ বসানো চাই-ই। তাঁবুর উপরের কাঠ খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছিল উইয়েরদল—টেবিল পেতে খাবার সময় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কাঠেরগুঁড়ো খেতে হত রোজ। আগুন দিয়ে এই উইয়ের বংশধ্বংস করে যাবোই।

সেরেনপেটি প্রান্তরে নানারকম বন্যজন্তু আছে। এরাঅনেক সময় এক এক দলে অনেকগুলো করে থাকে।ইল্যাড্, রিড্‌বাক্, হার্টিরিস্ট প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ারেরদল মানুষ দেখলে যে খুব ভয় পায় তা নয়, তাদের কাছেওযাওয়া যায়—কিন্তু যেই ক্যামেরার ছবি তোলার জন্যতেপায়া ইত্যাদি খাটানো হচ্ছে—অমনি তারা ছুটে পালাবে।কিন্তু ছুটে বেশি দূরে যাবে না।ফটো নেবার পাল্লার বাইরে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সকৌতূহলে আমারক্রিয়াকলাপ লক্ষ করবে। আবার যদি আমরা এগিয়ে যাই, ওরাও আবার কিছুদূর সরে গিয়ে দাঁড়াবে।

অবশেষে আমরা এ সমস্যার মীমাংসা করেছিলাম।ওদের দিকে কখনো দ্রুত অগ্রসর হতে নেই বা চারিপাশের প্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিশ খায় এমন কোনো আবরণেরআড়ালে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। ঘাসের তৈরি বেড়াসামনে রেখে একজন বা দুজন ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে যেতেহয়, তাড়াতাড়ি করতে নেই। এভাবে আমরা বড় বড় দলেরছবি তুলতে পেরেছিলাম তারপর, জিনিসটা যখন বুঝতেপারলাম।

তবে যদি ওদের ক্লোজ আপ ফটো নিতে হয়, তবেকোনো জলের ধারে লতাপাতার আড়াল তৈরি করেধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করাই বিধি। এ ব্যাপারেও আমাদেরবিফল হতে হয়েচে অনেকবার, কিন্তু দিনের পর দিন কোনোজলের ধারে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবার পরে অবশেষে দেখা গেল ইল্যাড্ বা হার্টিরিস্টের দল এ জলাটা ছেড়ে দিয়ে আজকাল অন্য কোনো জায়গায় জল খেতেযাচ্চে।

জেব্রা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, জেব্রার গাত্রচর্মের বর্ণসংস্থান প্রকৃতির কি খেয়ালে হয়েছিল সেবিষয়ে যাঁরা বাড়ি বসে প্রাণীবিদ্যা আলোচনা করেন, তাঁদেরমতের সঙ্গে আফ্রিকা ভ্রমণকারী বা শিকারিদের মত মেলেনা।

পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন, এ ধরনের সাদা-কালোডোরাকাটা গাত্রচর্ম মরুপ্রান্তরের মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়েনিরীহ জেব্রাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। যাঁরা একথা বলে থাকেন, তাঁরা কখনো জেব্রা দেখেননি কিংবা জেব্রাকেদেখলেও দেখেচেন সার্কাসে। তারা জানেন না যে জেব্রারএই গায়ের রংটি তাকে সমতল প্রান্তরে বহু দূর থেকে শত্রুরকাছে ধরিয়ে দেয়, যদি সে আলোর বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে নাথাকে এবং শত্রুর দিকে মাথা দিয়ে লম্বালম্বিভাবে দাঁড়িয়ে নাথাকে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শুধু জেব্রা কেন, যেকোনো জন্তু আফ্রিকার মরুপ্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়েযায়।

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা ভেবে দেখতে হবে।আফ্রিকার বনপ্রান্তরে জেব্রার স্বাভাবিক শত্রু মানুষনয়—সিংহ। সিংহ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে শিকার খুঁজে বার করে, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তত নয়। সেরেনপেটি প্রান্তরেকঙ্গোনি বলে এক প্রকারের হরিণ বা ষাঁড়ের মতোজানোয়ার আছে, ফেটোগ্রাফারের জীবন তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত জানোয়ার, যখন কোনো বড় জানোয়ারের ছবি তোলার চেষ্টা করেছি, সবতোড়জোড় করে এবার কল ঘোরাতে যাব, অমনি কঙ্গোনিদলের সর্দারটি এক ভীষণ হুঙ্কার ছাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে যতজানোয়ার যেখানে ছিল, সব নক্ষত্রবেগে এদিক-ওদিকছুটতে আরম্ভ করলে। দিনটাই মাটি হয়ে যেত একেবারে।সেরেনপেটি প্রান্তর ছাড়তে হল, কারণ আমায় যেতে হবে

সাদা গণ্ডারের ছবি নিতে বেলজিয়ান কঙ্গোতে। সাদা গণ্ডারআফ্রিকা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, এখনো সামান্য যাঅবশিষ্ট আছে, এইবেলা ওদের ছবি তুলে না রাখলে এরপর আফ্রিকার শ্বেত গণ্ডার রূপকথার জীব হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যাম্প সিম্বা ছেড়ে আমরা গেলাম ইতুরীয় অরণ্যপ্রদেশে বন্য বামনজাতির ফটো নিতে। ইতুরীয় গভীর অরণ্যে এই অদ্ভুত-দর্শন বামনেরা বাস করে এবং সাধারণতএরা অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির। বিদেশী লোক দেখলেই গহন বনে পালায়। তীর ধনুক এদের প্রধান অস্ত্র।ধনুকের ব্যবহারে এরা এমন দক্ষ যে বড় বড় বন্য হস্তীঅবলীলাক্রমে এদের নিক্ষিপ্ত তীরের মুখে প্রাণ দেয়।

ফরাসি-অধিকৃত কঙ্গোতে উরাঙ্গি জাতির স্ত্রীলোকেতাদের অধর ও ওষ্ঠ চিরে তার মধ্যে আট ন'ইঞ্চি ব্যাসযুক্তধাতুর গোল চাকতি পরিয়ে রাখে। এতে ওদের কুশ্রীদেখায়। পূর্বে যখন আরব দস্যুরা ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যেউরাঙ্গি জাতির গ্রামসমূহে লুঠ করত, তখন গ্রামেরস্ত্রীলোকদের এই বর্বর দস্যুদলের কবল থেকে রক্ষা করবারজন্যেই নাকি এই প্রথা উরাঙ্গি জাতির মধ্যে প্রচলিতহয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলতে পারি যে আমার মতে মাসাইও নান্দি জাতির মেয়েরা পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষাসুশ্রী ও লাবণ্যবতী।

আমার ইচ্ছা ছিল বেলজিয়ান ও ফরাসি কঙ্গোর মধ্যেদিয়ে ক্রমশ মধ্য-আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হব। পথে নাইজিরিয়া প্রদেশ ও ক্যামেরুন পর্বতমালা পার হয়ে যাব।এই পথে যাবার সময় দীর্ঘসূত্রী আফ্রিকা তার 'যাচ্ছি যাব' মন্ত্র নিয়ে আমার পিছু লাগলো বড় বেশি করে। প্রত্যেককাজে পদে পদে বাধা পাওয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামিলহয়ে দাঁড়ালো। লাগোস্ পৌঁছুবার পূর্বে ভ্রমণকারীর অদৃষ্টেযত প্রকার দুর্দৈব ঘটা সম্ভব, তার সবগুলিই আমাদের ঘটেগেল।

নেমে গেল ভীষণ বর্ষা, দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৃষ্টির বিরাম নেই। রাস্তাঘাট কাদায় দুর্গম হয়েউঠলো, মোটর ট্রাক কাদায় ডুবে যায় তো আর উঠতে চায় না। কুলিরা দিন দিন অলস হয়ে উঠলো, বোঝা বইতে কাজকরতে অত্যন্ত দেরি করতে থাকে। পথের মাঝখানে বড় বড়নদী পড়তে লাগলো, পার হবার সেতু নেই সে নদীর ওপর। এর ওপর দলের লোকের মধ্যে দেখা দিল রোগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, পেটের পীড়া। আমাদের সকলের মন ওশরীর ভেঙে গেল, উৎসাহ কমে গেল।

এখনো সেসব দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

আফ্রিকার ভ্রমণপর্ব যখন আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেচে, সে সময় আমি শহর থেকে সত্তর মাইলদূরে—আমাদের মোটর ট্রাক এক জলার মধ্যে কাদায় আটকেগেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত চেষ্টা করা হল, আমাদের কুলিরা একটুও নাড়াতে পারলে না গাড়িখানা। সারা রাত্রি ধরে এইব্যাপার চললো। অবশেষে সকাল হল। আমি আমাদেরদলের কুলি সর্দারকে নিকটবর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম লোকসংগ্রহ করে আনবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে আমার কানে প্রবেশ করলো রণবাদ্যের আওয়াজ এবং বাজনার তালে তালে সম্মিলিত বহু কণ্ঠের যুদ্ধ-সংগীত। ক্রমে বাজনা ও গানের শব্দ নিকটবর্তী হল। ঘোড়ার পায়ের খুরের ধ্বনিও শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোলের শব্দ। বনজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলএকজন অশ্বারোহী আমাদের দিকে আসচে।

ব্যাপার কি, ক্রমে বোঝা গেল।

নিকটবর্তী গ্রামের আমীর আমাদের বিপদের কথা শুনেতাঁর সৈন্য নিয়ে সাহায্য করতে আসচেন। এই সৈন্যদলের পুরোভাগে স্বয়ং আমীর। তাঁর সুদর্শন কৃষ্ণকায় অশ্বটিসোনালি ও রুপালি সাজে সজ্জিত, আমীরের পরিধানে বহুমূল্য লাল ও নীল রেশমের রাজপরিচ্ছদ, সর্বাঙ্গেমণিমুক্তা ঝলমল করচে।

আমীরকে কোনো প্রাচীনকালের রাজপুত্রের মতোদেখাচ্ছিল। কিন্তু আমীর যে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করেন না, পরক্ষণে বুঝলাম। তাঁর আদেশে অশ্বারোহী সৈন্যদলদাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে সবাই গিয়ে কাদার মধ্যেআটকানো মোটর ট্রাকে কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগলো, ওদিকেওদের রণবাদ্য সমান তালেই বাজছে তখনো।

সৈন্যদলের সমবেত চেষ্টার ফলে চক্ষের নিমেষেআমাদের মোটর ট্রাক শুকনো ডাঙায় উঠলো জলাভূমিছেড়ে। তারপর আমীর আমার নিকটে এসে ঘোড়া থামালেনএবং ঘোড়ার ওপর বসেই গম্ভীরভাবে করমর্দন করলেন।পরক্ষণে তাঁর মুখ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ নির্গত হল, সৈন্যদল যেমন এসেছিল আবার ঠিক সেভাবেই গ্রামেরঅভিমুখে চললো।

এই অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র রাজাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরকাল মনে রাখব, আফ্রিকার আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতাকে ইনিজয় করেচেন অতি অদ্ভুতভাবে।

আরিজোনা মরুভূমির পর্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি

পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন যে অতীতকালের অতিকায় সরীসৃপ বংশ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার অনেক পরে পৃথিবীতেমনুষ্যের আবির্ভাব হয়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের আরিজোনাস্টেটের অন্তর্গত মরুভূমিতে, পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অনেকগুলি পশুপক্ষীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার সবগুলিই অধুনালুপ্ত সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর। ছবিগুলিযেভাবে আঁকা তাহাতে মনে হয় এ এমন এক সময়েরদৈনন্দিন ইতিহাসের কাহিনী, যে সময়ে অতিকায় হস্তী, ডাইনোসর ও অন্যান্য অধুনালুপ্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষেরসদাসর্বদা বিবিধ প্রয়োজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত। শিকার বাআত্মরক্ষার কার্যে মানুষকে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে, এডওয়ার্ড ডোহানি নামকএকজন তরুণ যুবক আরিজোনা প্রদেশে তৈলের খনির সন্ধান করিতে করিতে একস্থানে পর্বতগাত্রে প্রাচীন যুগেরআঁকা কতগুলি রঙিন ছবি ও খোদাই করা মূর্তি দেখিতেপান। ছবিগুলি সে সময় তাঁহাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে ওতিনি বিশেষজ্ঞ না হইলেও বুঝিতে পারেন যে এগুলি বহু প্রাচীনকালের আদিম অধিবাসীগণ কর্তৃক অঙ্কিত। মি.ডোহানি বর্তমানকালে আমেরিকায় একজন ধনকুবের, গত১৯২৪ সালের শেষে তিনি নিজের অর্থে একদলবিশেষজ্ঞকে আরিজোনা প্রদেশের নির্জন পর্বতগাত্রে অঙ্কিতএই ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রেরণ করেন। একবৎসর ধরিয়া এই বিশেষজ্ঞ দলটি সেখানে অবস্থান করেন ও বহু কৌতূহলপ্রদ তথ্যের আবিষ্কার করেন—তন্মধ্যেসর্বপেক্ষা কৌতূহলজনক সিদ্ধান্ত এই যে, ডাইনোসর ও অন্যান্য সরীসৃপ বংশ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়ারপূর্বেই মানুষ পৃথিবীতে আসে।

আরিজোনার যে অঞ্চলে এইসকল ছবি আছে, তাহাঅতি দুর্গম মরুভূমির অন্তর্গত, এখনো তাহার সকল অংশআবিষ্কৃত হয় নাই, খুব কম লোকই সেসব স্থানে যায়। Dohney Expedition-এর দলপতি ছিলেন মি. হুবার্ড, ইনি ওকল্যান্ড মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ। ইঁহারাশুধু একস্থানে নয়, এই দুর্গম মরুপ্রদেশের নানা স্থানে এক বৎসর ধরিয়া বেড়াইয়া বহুস্থানের পর্বতগাত্রে এরূপ অনেক ছবি ও খোদাইকাজ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর আরকোথাও এইসব অতিকায় সরীসৃপদিগের ছবি নাই, কিইউরোপ, কি এশিয়া। একই সময়ে যে মানুষ ও ডাইনোসরপৃথিবীতে ছিল আমেরিকার মরুদেশের এই বিস্ময়করছবিগুলি হইতে তাহা অনুমিত হয়। শুধু ছবি নয়, কলোরাডো নদীর পর্বতময় তীরভূমিতে একস্থানে ইঁহারা ডাইনোসর ও অতিকায় হস্তীর প্রস্তরীভূত পদচিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই ছবি কে বা কাহারা আঁকিয়াছে বা সে লুপ্ত জাতিরইতিহাস কি,Dohney Expedition সে সম্বন্ধে কিছু স্থিরকরিতে পারেন নাই। ওই স্থানে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে যেসকল আদিম অধিবাসী বর্তমানে বাস করে, তাহারা Hava-supai রেডইন্ডিয়ানদের শাখা। ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ওকুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিজেদের অতীত ইতিহাসের কথা কিছুইজানে না, কোনোপ্রকার প্রাচীন গাথা ও কাহিনীও ইহাদেরমধ্যে প্রচলিত নাই। বস্তুত ইহাদের বুদ্ধি এত কম যে মনে হয়, পর্বর্তগাত্রের এসকল অদ্ভুত ছবি এই জাতির অঙ্কিতনহে।

বড় জোর হাজার বৎসর হইল ইহারা এ প্রদেশে বাসকরিতেছে। কিন্তু যে জাতি কর্তৃক ছবিগুলি অঙ্কিত হইয়াছেতাহারা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে এখানে বাস করিত।

অনুমান করা যায় যে প্রাচীনকালের এই জাতি যখনএখানে বাস করিত তখন এ অঞ্চলে জল এত দুষ্প্রাপ্য ছিলনা।পাষাণময় নদীখাতগুলি দেখিলে মনে হয় এক সময়েএখানে বড় বড় নদী ছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত কারণে সেগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়, খুব সম্ভবত নদী শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল হইতে মানুষের বাস উঠিয়া যায়।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি লাল বেলে পাথরের। পাথরের সঙ্গে বহুল পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত আছে। বৃষ্টির জল চুয়াইয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পড়ার দরুন এই লৌহেরগুঁড়া জলের সহিত মিশিয়া তরল অবস্থায় পাহাড়ের গাবাহিয়া পড়িয়া থাকে এবং বহুকাল ধরিয়া এরূপ পড়ায়পাথরের উপর কালক্রমে লৌহরসের একটা কঠিন সরপড়িয়া গিয়াছে। এই লৌহরসের সর থাকার জন্যই প্রাচীনকালের শিল্পীদিগের এই প্রকারের ছবি আঁকা সম্ভবহইয়াছে।

একখণ্ড পাথর বা ধারালো চকমকির টুকরা লইয়া এইলৌহরসের সরের উপর আঁচড় কাটিলে পাহাড়ের আসললাল রংটা বাহির হইয়া পড়ে—চারিপাশের লৌহরসের রংথাকে কালো আর আঁচড়টার রং লাল। তুলি ও রং দ্বারাছবি আঁকার

অপেক্ষা এ উপায়ে অনেক সুবিধা, কারণ ইহাতেপ্রথমত ছবি হয় লাল বেলে পাথরের স্বাভাবিক রং-এর, চারিপাশে থাকে লৌহরসের কালো রং—তাহা ছাড়াঝড়-বৃষ্টি, শিশির, তুষারপাত প্রভৃতি কোনো প্রাকৃতিকউপদ্রবেই এ ছবি মুছিয়া যায় না। ছবি নষ্ট হইতে পারে একমাত্র একটি কারণে, যদি পাথরগুলা গুঁড়া হইয়া ঝরিয়াপড়ে তাহা হইলে। কিন্তু সেরূপভাবে পাথর ক্ষয়প্রাপ্তহইতেও লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়া যায়। এই স্থানটির নির্জন পাহাড়ের ফাটলে বহু সর্পের বাস। মানুষ বড় এদিকে একটা আসে না বলিয়া এই সর্পকুল সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিরূপদ্রবেএখানে বংশবৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছে। Dohney Expedition-এর লোকজনকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল; এতসাবধানতা সত্ত্বেও একটি কুলিবালক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখেপতিত হয়। অপরপক্ষে আবার এই র‍্যাটল সর্পগুলিকেখুঁজিয়া বাহির করিতে ও মারিয়া ফেলিতে গিয়াও পাহাড়ের নানা নিভৃত অংশের বহু ছবি বাহির হইয়া পড়ে।

এই পর্বত হইতে কিছুদূরে মরুভূমির মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ ডাইনোসরের প্রস্তরীভূত পদচিহ্ন দেখিতে পান। ইঁহারাঅনুমানকরেন, মরুভূমির বালুরাশি সরাইয়া ভালো করিয়াঅনুসন্ধান করিলে এই জাতীয় সরীসৃপের ডিম পাওয়াও খুবআশ্চর্যের বিষয় নহে। ছবি দেখিলে বোঝা যাইবেপ্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল শিল্পীর সহিত ডাইনোসরজাতীয় সরীসৃপের কিরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ছবিতে সেই বিরাটকায় জানোয়ার পিছনের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াআছে, ইহা আঁকা হইয়াছে। ডাইনোসর যে এরূপ ভঙ্গিতেউঠিয়া দাঁড়ায়, শিল্পী নিশ্চয়ই ইহা দেখিয়াছিলেন, নতুবা তাহাকে এরূপভাবে আঁকিবার অন্য কি কারণ থাকিতেপারে ?

ছবিটির উচ্চতা ১১.২ ইঞ্চি; বিস্তৃতি ৭ ইঞ্চি; পায়েরদৈর্ঘ্য ৩.৪ ইঞ্চি, লেজের দৈর্ঘ্য ৯.১ ইঞ্চি। এক খণ্ড পাথরবা চকমকির সাহায্যে এরূপ একটা ছবিকে কঠিন লৌহেরসর কাটিয়া তৈয়ারি করিতে শিল্পীর বহুদিন সময় লাগিয়াছিলএ বিষয়ে কোনো ভুল নাই।

নানা প্রশ্ন এখানে স্বভাবতই মনে উদয় হয়। মানুষ কতপ্রাচীন ?সরীসৃপ যুগ বর্তমান সময় হইতে এককোটিবৎসরের পূর্বের কথা; তখন মানুষ পৃথিবীতে ছিল ?নামানুষের আবির্ভাবের পরও অতিকায় সরীসৃপের দু-একটিউপজাতি এখানে ওখানে নির্জন মরুভূমির মধ্যেআত্মগোপন করিয়া বাস করিত ?

কে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে ? Dohney Expedition অন্তত এ সকল প্রশ্নের কোনো সমাধান করেন নাই।

মেচিওরা নামক স্থানে পর্বতের উপর কতকগুলি প্রাচীনকালের মঠ আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেগুলি সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। এগুলিতে উঠিবার কোনো রাস্তা বা সিঁড়ি নাই। দড়ি বা জীর্ণ মই ঝোলানো আছে, তাহাই ধরিয়া উঠিতে হয়।

কলোরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

অনেকে কলোরেডোকে খনিপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশবলিয়াই জানেন, কিন্তু এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেসত্যিই অতুলনীয়, সেকথা বোধহয় সকলে জানেন না; এইসৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ইহার পার্বত্য প্রদেশসমূহে বহু সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে।কলোরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক ধরনের বা একঘেয়ে নয়। মর্মরনাদী পার্বত্য তটিনী, তুষারাবৃত পর্বতশিখর, হ্রদ, বনানী ও নানা ধরনের বনপুষ্পের বিচিত্র সমারোহে এদেশ সত্যই এত অদ্ভুত যে একবার আসিয়া বা দেখিয়া তৃপ্তি হয়না। যে একবার আসে তাহাকে বার বার আসিতে হয়।এখানে আসিবার রাস্তাঘাটের সুবিধাও খুব, রেল বা মোটর সব রকমেই আসা যায়। আমেরিকার অধিবাসীরা ক্রমশইঅত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের সুবিধার জন্যএই সব পথঘাট স্থানীয় গভর্নমেন্ট কর্তৃক তৈয়ারি হইয়াছে।পর্বতগুলির ও সুন্দর উপত্যকাটির যে কোনো স্থানে এইসকল পথ চলিয়া গিয়াছে। এই উপত্যকার মধ্যে স্থানে স্থানেগভর্নমেন্ট হইতে খানিকটা বন ও পার্বত্যভূমিকে সাধারণেরবিচরণভূমির জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনো কোম্পানিকে এই সকল স্থান হইতে কাঠ কাটিবার ওখনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিবার অধিকার দেওয়া হয় না।ছুটিছাটার সময় বহু সহস্র নরনারী, রেল বা মোটর যোগে এই পার্কগুলিতে আসিয়া থাকে, দশ-পাঁচদিন তাঁবু খাটাইয়াথাকে। এই দলে শিকারি, বৈজ্ঞানিক, পর্বত-আরোহণকারী, খনি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ—নানা ধরনের লোক থাকে এবং সকলেই নিজের নিজের প্রিয় বিষয়টির চর্চা করিবার জন্যআসে। অথচ কিছুকাল পূর্বেও এইসব বিচরণভূমির কথা সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

কলোরেডোর পার্বত্য প্রদেশ আমেরিকার অন্য অন্যপার্বত্য প্রদেশের মতো দুর্গম বা দুরারোহ নয়, ইহাই একটাপ্রধান সুবিধা; ইহার জন্য উপরোক্ত পার্কগুলি সাধারণেরঅত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মোটরের রাস্তা এত বেশিযে, উপত্যকাগুলির তো বটেই, এমনকি পর্বতশিখরেরওঅধিকাংশ স্থানে মোটরযোগে যাওয়া চলে—দশ হাজার ফুটের

কাছাকাছি উচ্চভূমিতে ক্রিপল্ ক্লিক ও লেড্‌ভালি নামে দুইটি ছোট শহর আছে—এখানে প্রধানত খনির মজুর ও মালিকেরা বাস করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আট-দশটি খনি আছে। কিন্তু ইউরোপের আল্পস পর্বতে এ রকমউচ্চস্থানে যাতায়াত অনেক বেশি বিপজ্জনক। সামান্য ছুটিপাইলেই সমতলভূমির ও শহরের নরনারীরা এখানে অবসরযাপন করিতে আসে।

কলোরেডোর জলবায়ু খুব ভালো। গ্রীষ্মকালে অন্য অন্যদেশের পার্বত্যভূমির মতো হঠাৎ বৃষ্টি বা ঝড় হয় না, সব সময়েই সূর্য কিরণ দেয়, আকাশ নীল থাকে, অথচ খুব বেশি গরমও বোধ হয় না, রাত্রিতে কিছু কিছু ঠাণ্ডা বোধ হয়। গ্রীষ্মকালের দিনগুলিতে প্রায় ষাট ডিগ্রি উত্তাপ সমভাবেবজায় থাকে।

অত্যন্ত উচ্চভূমি হইতে তুষারাবৃত শিখরগুলির সৌন্দর্য, বিশেষ করিয়া তাহাদের অহরহ পরিবর্তনশীল মূর্তি বড়অদ্ভুত দেখায়—এই হয়তো কোনোটা মেঘাবৃত আছেআবার এখনি মেঘ সরিয়া গিয়া পরিপূর্ণ সূর্যকিরণে তাহার প্রতি অঙ্গ স্নাত হইতেছে—দূরে অন্য একটা ছোট শিখরেহয়তো ততক্ষণ বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, অথচ এখানে মাথারউপরকার আকাশ ঘন নীল, মেঘগুলির প্রান্ত রৌদ্রে চিকমিককরিতেছে। এখানকার সূর্যাস্তগুলিও দেখিবার জিনিস—সমতলভূমিতে এ ধরনের সন্ধ্যার দৃশ্য চোখে পড়ে না।

যাহারা মৎস্য-শিকার পছন্দ করে, তাহাদের সুযোগসর্বাপেক্ষা বেশি। এখানকার পার্বত্য নদীগুলি নানা প্রকারমৎস্যে পরিপূর্ণ, হ্রদগুলিতে মৎস্যের সংখ্যা আরোবেশি—প্রতি বৎসর শুধু মৎস্য-শিকার করিবার জন্যই কতলোক আসিয়া থাকে ও দশ দিন, পনেরো দিন ধরিয়া নির্জননদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বাস করে। এ প্রদেশের পর্বতগুলির গঠন পর্যবেক্ষণ করিবার জন্যভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রায়ই আসেন। কখনো কখনোউদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণেরও আমদানি হইয়াথাকে—রকি পর্বতমালার অন্য কোনো স্থানে এত বিচিত্রধরনের পক্ষী বা গাছপালা নাই।

অনেকে আসে শুধু সাঁতার দেওয়া বা অশ্বারোহণেরআনন্দের জন্য—জল খুব বেশি ঠাণ্ডা না হওয়ার দরুনগ্রীষ্মকালে বা শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে এখানকার পার্বত্যহ্রদগুলিতে সাঁতার অত্যন্ত সুবিধা।

বনের মধ্যে নানা ধরনের শিকার মিলিয়া থাকে, এজন্যঅনেক শিকারিও আসে। পর্বতের উপরের দুর্গম স্থানগুলিতে এক জাতীয় পাহাড়ি-ভেড়া চড়িয়া বেড়ায়—তাহাদের সিংখুব বড় বড়, গায়ের লোমও খুব লম্বা ও কর্কশ। এই জাতীয় ভেড়া সহজে শিকার করিতে পারা যায় না বলিয়াই ইহাকেমারিবার ঝোঁক শিকারির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। অনেকেবন্দুক হাতে দিনের পর দিন এই ভেড়ার সন্ধানে নির্জনবনের মধ্যে দুর্গম পার্বত্য পথগুলি বাহিয়া একা একাবেড়াইয়া থাকে—কখনো কৃতকার্য হয়, কখনো বা ভেড়ারসন্ধানই মেলে না।

পাহাড়ি ভেড়া ছাড়া নানা ধরনের হরিণ, ভালুক, পাহাড়ি-সিংহ, বন্য বিড়াল প্রভৃতি বন্যজন্তুও যথেষ্ট। এতধরনের পাখি অন্য কোনো পার্বত্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়াযায় না—এ পর্যন্ত ৪০৫ প্রকার জাতি ও ৫০ প্রকারউপজাতির পাখি হ্রদের ধারের বনগুলিতে দৃষ্ট হইয়াছে।বনের মধ্যের নির্জন স্থানগুলিতে একা বেড়াইলে নানাবিচিত্র ধরনের পাখি চোখে পড়িবে—মানুষের সর্বদাগতিবিধির স্থানে ইহারা প্রায়ই থাকে না।

দশ হাজার ফুটের ঊর্ধ্বে গাছপালা ক্রমশই কমিয়াআসিয়াছে—এখানে হিম ও তুষারপাতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রায় কোনো গাছপালা টিকিতে পারে না, কয়েকটিবিশেষ জাতীয় বৃক্ষ ছাড়া। ইহাদেরও পাতাগুলি বাঁকা এবংপত্রহীন, গুঁড়ি অনেকস্থলেই ঝড়ের বেগে দুমড়াইয়া গিয়াছে,অধিকাংশই খর্বাকৃতি—অনবরত তুষারঝটিকার সঙ্গে যুঝিতেগিয়া ইহারা বাড়িবার সুযোগ পায় নাই।

উপত্যকাগুলির মধ্যে একটিতে বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণআছে। তাহার জলের গুণ খুব অদ্ভুত—বাত ও নানা ধরনেরঅসুখ এখানকার জলে স্নান করিলে আরোগ্য হয় বলিয়াবহুদূর হইতে রোগীরা আসিয়া থাকে। এই উষ্ণ প্রস্রবণের চারিপাশে অনেক খনি আছে—রৌপ্য, সিসা, তামা এমনকিসোনারও খনি আছে। এখানকার আকরিক দ্রব্য হইতে রেডিয়াম বাহির করিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।সম্ভবত উষ্ণ প্রস্রবণের জলের এই রেডিও-অ্যাকটিভপ্রকৃতির জন্যই তাহাতে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে এবংতাহাই স্বাভাবিক।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হই জ্যাকসন এতঅঞ্চলে প্রথম সোনার খনি আবিষ্কার করেন। ডেনভারমোটরপথের ধারে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ আছে। জ্যাকসনসোনার খনি বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল লোকে ভরিয়া যায়। কাঞ্চনের লোভে দলে দলে লোক আসিতে থাকে। শীঘ্রই এমন অবস্থা হইয়া ওঠে যে খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য গভর্নমেন্টকে

নানা ধরনের বিধিনিষেধপ্রণয়ন করিতে হয়—ইহারই নিকটে চেরী ক্রিক নামক স্থানেআর একটি বৃহৎ সোনার খনি আছে—বিখ্যাত জর্জটাউনলুপ নামক রেলপথ দ্বারা এই উভয় স্থান সংযুক্ত।

জর্জটাউন হইতে ৫০ মাইল দূরে নির্জন পর্বতগাত্রেপ্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের বসতিস্থান সম্প্রতি আবিষ্কৃতহইয়াছে। এগুলি সত্যই দেখিবার জিনিস। নিকটেইগুহাগুলির মধ্যে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের একটি মিউজিয়ম স্থাপিতহইয়াছে, ইন্ডিয়ানদের কয়েকটি গ্রামও অল্প দূরে অবস্থিত। দু'তিন মাইলের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ প্রাচীন মানুষের বসতিস্থান আছে। এগুলির বিশেষত্ব এই যে দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গের পার্শ্বদেশ কাটিয়া এই সকল বসতি প্রস্তুত করিতেহইয়াছিল—এই প্রাচীন জাতির বহু মৃৎপাত্র ও বিশাল পাত্রের অস্ত্রশস্ত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এগুলি দেখিবারজন্য গ্রীষ্মকালের প্রথমে মিউজিয়ামটিতে খুব নরনারীর ভিড়হইয়া থাকে।

ইহার দক্ষিণে বিখ্যাত ঈস্টস্ পার্ক। এটি একটি বিশাল অরণ্যভূমি। ১৯১৫ হইতে গভর্নমেন্ট কর্তৃক ইহা বেড়াইবারস্থান হিসাবে রক্ষিত হইতেছে। সমগ্র কলোরেডো অঞ্চলেরমধ্যে এমন অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা আর কোথাও নাই। জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে আসা চলে। এখানকার জলপ্রপাতগুলি অতীব মনোরম এবং একসঙ্গে এতজলপ্রপাত বোধ হয় আমেরিকার কোনো অঞ্চলেই নাই।অক্টোবর মাসের পরেই শীত পড়িলে যাতায়াতের রাস্তাতুষারে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্গম হইয়া পড়ে—ঘোড়া বা মোটরকিছুই আর চলে না। সেই সময়ে বিপজ্জনক বলিয়াঅক্টোবরের পর হইতে গভর্নমেন্ট যাতায়াত বন্ধ করিয়াদেন।

নীল নদীবক্ষে ইজিপ্ট হইতে সুদান

জনৈক আমেরিকান ও তাঁর স্ত্রী কায়রো হইতে কেপটাউন ভ্রমণ করিয়াআফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহুঅভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৩৫ দিনে ইঁহারা ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেন, এবং এই দীর্ঘ পথের অধিকাংশই তাঁহাদিগকেপদব্রজে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, কারণ মধ্যআফ্রিকায় কোনো যানবাহনের বিশেষ সুবিধা নাই।

স্বামী-স্ত্রী পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আন্ডিজপর্বতমালা হইতে মলোলিয়ার সমতলভূমি, সাউথ সি হইতেভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান কিছুই বাদ রাখেন নাই।ভারতবর্ষে প্লেগ আরম্ভ হইবার খবর শুনিয়া তাঁহারা বম্বেবন্দরে পি অ্যান্ড কোম্পানির জাহাজে চড়িয়া ইউরোপেরদিকে রওনা হন। সে সময়ে টুটেনখামেনের সমাধি প্রথমআবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র লর্ড কারনারভন ও টুটেনখামেন সংক্রান্ত নানা চকমপ্রদ সংবাদে পরিপূর্ণ।

তাঁহারা প্যারিসে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদেরখেয়াল হইল কায়রো হইতে শুরু করিয়া সোজা আফ্রিকাভ্রমণ করিয়া তবে প্যারিসে ফিরিবেন। প্যারিসের প্রশস্তবুলভারগুলির অপেক্ষা আফ্রিকার জনবিরল মরু ও অরণ্যের ডাক প্রবল হইয়া উঠিল।

জাহাজে কথাটা তুলিতেই বন্ধুবান্ধবেরা বারণ করিল।চিরকালই করিয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবে কখনো ভালো কাজ করিতে দেয় না।

“আফ্রিকার মধ্যে এ সময় যায় ?কী সর্বনেশে কথা ! কায়রো থেকে কেপ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ! তাছাড়া এখন এই গ্রীষ্মকালে ! সামনে বর্ষা আসছে ! মরুভূমিতে ঝড় বইবে, সুদান ও ইউগান্ডাতে বন্যা নামবার সময় এখন, জিজিমাছির উপদ্রবে মধ্য আফ্রিকার অনেক স্থান জনশূন্য হয়ে পড়বে, যাবে কি করে সেসব জায়গা দিয়ে এখন ?বিশেষকরে তোমার স্ত্রী সঙ্গে রয়েছেন। যেয়ো না, মারা পড়বে। এসো বরং এক গ্লাস বরফ লেমনেড খাও।”

আমেরিকান ভদ্রলোকটির নাম পোর্টার শে। স্ত্রীর সঙ্গেপরামর্শ করিয়া পোর্ট সৈয়দে দুজনে নামিয়া পড়িলেন।সেখানে হইতে কায়রো ও খাটুন পর্যন্ত রেলের টিকেটকিনিলেন।

কায়রো আজকাল আর প্রাচ্যদেশীয় শহর নয়। কায়রোশহরে পৃথিবীর সর্বজাতিই মিলিয়াছে। কিন্তু স্থাপত্য, আদবকায়দায়, ভাষায় ও সভ্যতায় ফরাসি প্রভাব বড় বেশি।ইজিপ্ট ফরাসি প্রতিভার ও সভ্যতার দীপ্তিতে মুগ্ধ, তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, ভালো লোক মরিলে প্যারিসেযায়।

কায়রো হইতে রাত্রি আটটায় ট্রেন ছাড়িল লুকসরেরঅভিমুখে। লুকসরে নীল নদী পার হইয়া মরুভূমির মধ্যেকিছুদূর যাইলে প্রাচীন ফ্যারাওদের সমাধিস্থান, প্রসিদ্ধ “ভ্যালি অফ্ দি কিংস” অনুচ্চ ও অনাদৃত শৈলমালাপরিবেষ্টিত নির্জন মরুপ্রান্তর।

পথে আরব বালক-বালিকা হাসিমুখে বক্‌শিশ চাহিয়াফিরিতেছে। ফেলাহিন কৃষক মাঠে লাঙ্গল চষিতেছে। মাঝেমাঝে দু'একজন শ্মশ্রুযুক্ত প্রাচীন লোক গাধার পিঠে চড়িয়া গম্ভীর মুখে নিজের কাজে চলিয়াছে। ইজিপ্টের যে অংশদিয়া নীলনদ প্রবাহিত, সে অংশ শস্যশ্যামল, যে অংশ নীলনদ হইতে যতদূরে তাহা ততই রুক্ষ ও বৃক্ষলতাশূন্য, ঠিকমরুভূমি যদিও নয়, মরুভূমির ভূমিকা বটে।

সম্রাট ষষ্ঠ রামেসিসের কবরের নীচে টুটেনখামেনেরকবর এতদিন লুকানো ছিল। এতকাল ধরিয়া ইটালিয়ান, ফরাসি, ইংরেজ, মার্কিন সকল জাতি 'ভ্যালি অফ দি কিংস'খুঁড়িয়া তন্ন তন্ন করিয়াছিল, কোনো কবর বাদ দেয় নাই, অধিকাংশ রাজার কবর বহু প্রাচীন যুগেই দস্যুতস্করে লুণ্ঠন করিয়াছিল—কিন্তু ফ্যারাও টুটেনখামেনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই কেহই এতকাল।

মি. শে ও তাঁহার পত্নী এখান হইতে ট্রেনে খাটুমেরদিকে রওয়ানা হইলেন। লুকসর ছাড়িয়া কিছুদূর যাইতেইমরুভূমি শুরু হইল। গাড়িতে বেজায় গরম, দরজার হাতলইত্যাদি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল, হাত দিলে মনে হয় ফোস্কা পড়িবে। গাড়ির জানালার বাহিরে শুধু বালি আর রৌদ্র আর উত্তাপ, মরুভূমি ক্রমশ ভীষণতর হইয়া উঠিল, গাড়ির মধ্যে শুধু বালি আর উত্তাপ, অগ্রসর হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে শুধু বালি আর উত্তাপ দুই-ই বাড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যায় তাঁরা একটা ছোট্ট স্টেশনে নামিয়া নীল নদীতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। হালফা পর্যন্ত নৌকাপথে যাইয়া পুনরায় রেলপথ, খাটুম পর্যন্ত। হালফা পর্যন্ত গোটা পথের অন্তত অর্ধেক শুধু মরুভূমি। সে মরুভূমির রং জাফরানের মতো—দুপুরের খররৌদ্রে তাহা দেখাইতেছিলসোনালি রংয়ের।

অনেকে ভাবেন সাহারা মরুভূমি সাদা ও ধূসর বর্ণেরবালিরাশির সমষ্টি। আসলে সাহারার বর্ণবৈচিত্র্য অপূর্ব। আরকোথাও সমতল নয়, বালির পাহাড় চারিদিকেই, জমি সর্বত্রউঁচুনীচু।

মরুভূমির আরবেরা অত্যন্ত অপরিষ্কারভাবে থাকে। নিকটেই নীল নদ, কিন্তু জীবনে কেহ কোনোদিন নদীতেস্নান করে কিনা সন্দেহ, দেশ কিরূপ উত্তপ্ত তাহা ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বিস্ময়কর দাঁড়ায়। অধিকাংশ আরবচক্ষুরোগে ভুগিতেছে, অন্ধের সংখ্যাও খুব বেশি। ইহার কারণ দুইটি, তাহাদের অপরিষ্কারভাবে বাস করিবারঅভ্যাস, আর মরুভূমির প্রখর রৌদ্রদগ্ধ বালুরাশির দিকেসর্বদা চাহিয়া থাকা। চক্ষুর বিশ্রামদায়ক শ্যামলতা এ অঞ্চলেসম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নীলনদের ধারে গাছপালা নাই, এখানে ওখানে দু'দশটা তালগাছ ছাড়া। তাও জলের নিতান্ত কিনারায়। নদী হইতে একশো হাতের পরে শুধু জাফরান রংয়ের বালিয়াড়ি দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে নদীর ধারে আরবগ্রাম, কতকগুলি মৃৎকুটিরের সমষ্টি।

সুদান বাস করিবার উপযুক্ত দেশ নয়। কোনো না কোনোদুর্বিপাক লাগিয়াই আছে। কোনো বছর ঘোর অনাবৃষ্টি।পরের বছরেই নীলনদীতে প্রবল বন্যা নামিয়া সব ভাসাইয়ালইয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে হয়তো বেজায় দুর্ভিক্ষ দেখাদিল। কোনো বছরের ম্যালেরিয়াতে দেশ উজাড় হইল, পরের বছর স্লিপিং সিকনেসে মাছির মতো লোক মরিতেলাগিল।

অ্যান্টনি যখন ক্লিওপেট্রার প্রেমে মত্ত, তখন রোমানসৈন্যবাহিনী যে দুর্গপ্রাচীর হইতে শত্রুবাহিনীর গতিবিধিলক্ষ করিত, ফিলি নগরির সেই দুর্গ আজ আসোয়ান বাঁধবাঁধিবার দরুন অর্ধেক বছর জলমগ্ন থাকে। ফিলিরসুবিখ্যাত আইসিস দেবীর মন্দিরেরও ওই অবস্থা।

খাটুম শহর সুদানের রাজধানী। সেখানে দিন দুইকাটাইবার পরে তাঁহারা পুনরায় স্টিমারে করিয়া রেজাফঅভিমুখে চলিলেন। নীলনদীর এই অংশ 'শ্বেত নীলনদী' বলিয়া অভিহিত। জাহাজে অনেকগুলি আরোহী ছিল, তন্মধ্যে দুজন মিশনারি ডাক্তার সুদানের স্লিপিং সিকনেসগ্রস্ত অঞ্চলে রোগ সারাইতে যাইতেছেন। একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী, দুজন ভবঘুরেইংরেজ, একজন সিরীয়দেশীয়খর্জুর ব্যবসায়ী, একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার।

খাটুম শহর ছাড়াইলেই মরুভূমি প্রায় শেষ হইল।

নদীর ধারে মাঝে মাঝে শ্যামল ক্ষেত্র, গৃহপালিত পশুচরিয়া বেড়াইতেছে। এ অঞ্চলে আরব অপেক্ষা নিগ্রোআরব বর্ণসঙ্কর ও খাঁটি নিগ্রো জাতীয় লোক বেশি।

পাঁচদিন নদীপথে যাইবার পর বন্যজন্তুর দেশ আরম্ভহইল। জলে হিপোর দল মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতেছে, নদীর দু-ধারের প্রান্তরে দলে দলে হরিণ, নদীর ধারের পাঁকে বড় বড় কুমির নিশ্চিন্তে শুইয়া ঘুমাইতেছে।

জলচর পাখি যে কত রকমের তাহার সংখ্যা নাই।

কিন্তু আফ্রিকার এই অঞ্চলে সভ্যতার আলোক এখনো প্রবেশ করে নাই। সুইডিশ ব্যবসায়ী একটি গল্প আরম্ভকরিল। এক সময়ে তাহার একটি নিগ্রো বালক ভৃত্য ছিল।বালকের গলায় ব্যথা হওয়ায় সুইডিশ ভদ্রলোকটি তাহাকে ডাক্তারের কাছে লইয়া গেল। ডাক্তারের ঘর হইতে ছেলেটি ছুটিয়া জঙ্গলের দিকে পালাইতেছে। তাহার প্রভু ডাক্তারেরঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে অবাক হইয়া বলিল—কিহয়েচে রে ?পালাস কেন ?বালক ছুটিতে ছুটিতে বলিল—আরে বাপ, ডাক্তার আমার সমস্ত গা টিপে টিপেদেখছে নরম কিনা !

আফ্রিকার এ অঞ্চলে কীটপতঙ্গের মেলা। মশা দু'তিনরকমের; উই, কালো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, উড়ন্ত পিঁপড়ে, নানা শ্রেণীরমাকড়সা, মাছি যে কত বিভিন্ন ধরনের তারলেখাজোখা নাই। রাত্রে নিগ্রো খালাসিরা একটা মশালজ্বালাইয়া রাখিত, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু পিঁপড়ে আসিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া ঝলসাইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। নিগ্রোর দল মহা আনন্দে সেই ঝলসানো পোড়া পিঁপড়েররাশ খাইতে শুরু করিয়া দিল।

এইবার স্টিমার যে অঞ্চল দিয়া চলিল, সেখানে নদীর দুই তীরে দীর্ঘ তৃণভূমি। মাঝে মাঝে বড় বড় জলা—এইসব জলাভূমিতে প্যাপিরাসের বন। প্যাপিরাস নলখাগড়া জাতীয় গাছ, প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাস হইতে লিখিবার পুঁথিতৈরি হইত। নীল নদীর এই অংশে পূর্বে এত ঘনপ্যাপিরাসের বন ছিল যে, নৌকা যাতায়াত করিতে পারিতনা।আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হইবার পরে নদীপথ অনেকসুগম হইয়া উঠিয়াছে।

স্টিমারের ত্রিশ গজের মধ্যে তীরের লম্বা ঘাসের বনে বন্য হস্তী দাঁড়াইয়া অলস কৌতূহলের দৃষ্টিতে স্টিমারেরদিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ স্টিমারের বাঁশি শুনিয়া ভয়পাইয়া আপনমনে একদিকে চলিতে শুরু করিল, কিন্তু হাতিকি দ্রুত যাইতে পারে ?দশ-বারো মিনিটের মধ্যে তাহারবৃহৎ শরীরটা দূর চক্রবালে একটি কৃষ্ণবিন্দুতে পর্যবসিতহইল।

যাঁহারা মনে ভাবেন মশা জিনিসটা তাঁহারা ভালোই দেখিয়াছেন, তাঁহারা নীলনদীর এই জলাভূমি অঞ্চলে যেন একবার বেড়াইতে আসেন, মশা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন। স্টিমারে যে ইংরেজ ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনিএই অঞ্চলের একটা ছোট্ট স্টেশনে নামিয়া গেলেন। তাঁহাকেজিজ্ঞাসা করা হইল আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে অসুখবিসুখ কেমন ?মশা তো এদিকে খুব বেশিই মনে হয়।

তিনি উত্তর দিলেন, আমি সম্প্রতি আছি একটা ছোট নিগ্রো গ্রামে। সেখানে নেই এমন কোনো রোগ তো দেখিনা। ম্যালেরিয়া আছে, প্লেগ আছে, বসন্ত আছে, স্লিপিং সিকনেস আছে। কিন্তু কি করব, ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানেথাকি। বাঁচি তো ভালোই, দেশে ধনী হয়ে ফিরতে পারব,না বাঁচি অদৃষ্ট।

আফ্রিকার লোকে শীঘ্রই অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়। নাহইয়া উপায় নাই।

নীল নদীতে ঝড়ে মাঝে মাঝে স্টিমার ডুবিয়া যায়, সুতরাং ঝড় আসিবার সম্ভাবনা বুঝিলেই স্টিমারের কাপ্তেন ডাঙার ধারে জাহাজ ভিড়াইয়া নোঙর ফেলিত। ঝড় শেষহইয়া যাইবার পরে আকাশের রং ও চেহারা সম্পূর্ণবদলাইয়া যাইত। চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত একটা অসীমতার মধ্যেসরু সাদা রেশমের ফিতার মতো হোয়াইট লাইন সবুজ প্যাপিরাসের বনের ধার দিয়া বহিয়া যাইতেছে। দূরে দূরে বেগুনি রংয়ের অনাবৃত শৈলমালা, মাথার উপর ইন্দ্রনীলআকাশ, স্টিমারের ডেকে সকলে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত।

এখান হইতে প্রত্যেক আরোহী দৈনিক পাঁচ গ্রেনকুইনাইন সেবন করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের ডেকেএকজন মিশনারি ডাক্তার বেশ মজার গল্প করিতেন। একদিন গল্পের সময় তীরবর্তী ঘাসের বনে চোদ্দটি বন্য হস্তীআসিয়া দাঁড়াইতে গল্প শোনা বন্ধ করিয়া সকলে সেদিকেচাহিয়া রহিল। হাতির ঘ্রাণশক্তি প্রবল, অনেক সময় দুই মাইল দূর হইতেও শিকারির অস্তিত্ব পূর্ব হইতে বুঝিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এত কম যে একশো ফুট দূরের লোকস্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অসভ্যনিগ্রোদের ডোঙা প্রায়ই দেখা যাইত। স্টিমারেরঢেউ লাগিবার ভয়ে তাহারা ডাঙার কাছে ঘেঁষিয়া থাকিতস্টিমারের বাঁশি শুনিলেই। স্টিমারের ঢেউকে তারা বড় ভয়করে।

নিগ্রোদের গ্রাম ছোট ছোট পর্ণকুটিরের সমষ্টি। কুটিরেরচালা ছাতার মতোগোল। গ্রামগুলির চারিধারে নলখাগড়ারবেড়া। ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী অনেক জায়গায় এখনো কেনাবেচা হয়। কঙ্গোর মধ্যে এমন সব স্থান আছে, যেখানেএকটি তরুণী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীর মূল্য দশখানা কোদাল।

রেজাফ হইতে মি. ও মিসেস শে পদব্রজে উত্তরমুখেযাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন এ অঞ্চলের দৃশ্য দেখিয়া। তাঁহারা আশাকরিয়াছিলেন জনমানবহীন বনানী বা মরুভূমি দেখিবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিলেন ইংল্যান্ডের পল্লিগ্রাম বাআমেরিকার নিউ জার্সি অঞ্চলের পরিচিত দৃশ্যাবলি

গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট লোকের বাস। চাষিরা চাষবাসকরিতেছে। মিশনারিগণ গ্রাম্য লোকদিগকে মৌমাছি পালনকরিতে শিখাইয়াছে, অনেক গ্রামেই মৌমাছির চাষ দেখা গেল। গভর্নমেন্টের ট্যাক্স দিবার একটি সুন্দর নিয়ম এঅঞ্চলে প্রচলিত। যাতায়াতের রাজপথ বৎসরে কয়েকবার মেরামত করার ভার প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীগণের উপর।কোনো গ্রামের লোকে পথের ধারের আগাছা কাটিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কোনো দল বা রাস্তায় মাটি দিতেছে।এই উপায়ে তাহারা গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দেয়।

পথিকদের বিশ্রামের সুবিধার জন্য পথের ধারে মাঝেমাঝে গভর্নমেন্টের তৈরি বাংলো আছে। এইসব বাংলোনির্মিত হইয়াছে জলাশয়ের সান্নিধ্যে। আফ্রিকার এ অঞ্চলে জল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া গেলেও সব স্থানের জল সভ্য মানুষের ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নয়। বাংলোগুলি সাধারণত মাটির দেওয়াল ঘেরা খড়ের ছাউনি। মেঝেওমাটির। বন্যজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য বাংলোরচারিধারে শক্ত করিয়া কাঠের খুঁটির বেড়া। আফ্রিকায় এই রকমের বেড়াকে ‘বোমা’ বলে।

মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড়। বড় বড় গাছ চারিধারেই। আফ্রিকার সূর্য এখানে তত উত্তপ্ত নয়, কেবলমাত্রদুপুরবেলাটা ছাড়া। সন্ধ্যার পর হইতে বিষম শীত পড়ে।

একজায়গায় বনের মধ্যে অসংখ্য বেবুন দেখা গেল। বেবুন মানুষকে বড় একটা ভয় করে না। অনেক সময়দাঁতমুখ খিচাইয়া তাড়া করিয়া আসে। ধাড়ি বেবুনগুলিহিংস্র-প্রকৃতির, বন্দুক হাতে না থাকিলে বেলুনের সান্নিধ্যেএকটু সাবধান হইয়া চলাফেরা করা বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষদেখিলে ধাড়ি বেবুন কুকুরের ডাকের মতো একপ্রকার ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে। এক এক দলে শত শত বেবুন থাকে।

সুদানের মধ্য দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করার মতো কষ্টদুনিয়ায় আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। একে তো মশারউৎপাতে বাংলোগুলিতে রাত্রে তিষ্ঠোবার উপায় নাই, তাহার উপর দারুণ জলকষ্ট আছে, ম্যালেরিয়া আছে, খাদ্যাভাব আছে—সকলের উপর আছে বন্যজন্তু, বিশেষতসিংহের উপদ্রব।

এক বিষয়ে মি. শে ও তাঁহার পত্নী একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। আফ্রিকার বনে বন্যপুষ্পের একান্ত অভাব।অন্তত বৎসরের যে সময়ে তাঁহারা ওই অঞ্চল দিয়া গিয়াছিলেন তখন কিছু দেখেন নাই। হয়তো সেটা বন্যপুষ্পফুটিবার সময় নয়।

কেনিয়াতে কমলালেবুর বাগানের মালিকেরা নিজেদেরচারিপাশে রঙের মেলা বসাইয়াছে বটে, কিন্তু তাদেরআনীত বেশির ভাগ ফুলই বিলাতি মরসুমি ফুল। জুঁইলতা ছাড়া অন্য কোনো ট্রপিক্যাল ফুলের আদর তাহাদের মধ্যেনাই।

কাপ্তেন কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস

একটু ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইট্‌বি বন্দরেআসচে।

তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নয় যে সে জগতেকোনোদিন কিছু করতে পারবে।

আগে যেখানে কাজ করত, সেখান থেকে চাকরি ছেড়েপালিয়ে আসচে সে। তার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, সমুদ্রে নাবিকের কাজ নেওয়া এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা।

সবাই ভাবচে ছোকরার মাথা খারাপ আছে।

বহুকাল আগের হুইট্‌বি। সরু সরু রাস্তা, দু-ধারেপুরোনোবাড়ি। নোংরা ড্রেন পথের ধারে।মাঝে মাঝেজাহাজি জিনিসপত্রের দোকান—নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল।

জলের ধারে ছোট বড় পালের জাহাজ, তিমি মাছ ধরা বোট—অমুক জাহাজখানা লোহা ও পাথর বোঝাই করে ব্রিটেন যাবে। ওখানা ড্যানজিগ, আর একখানা ফটকিরিবোঝাই দিয়ে যাচ্চে সেন্ট পিটার্সবুর্গ।

জেলেরা বন্দরে রোদ পোয়াচ্চে, মুখে লম্বা পাইপ।

সারাদিন এরা গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনো কাজ নেই করবার। কিন্তু এদের কাজ আরম্ভহবে দুপুর রাতের পরে; তারপর থেকে জার্মান সমুদ্রেরঢেউ ও তুষারশীতল বায়ুর সঙ্গে এদের সংগ্রাম হবে শুরু।

গ্রাম্য বালকটির পিঠে একটা বোঁচকা, নিতান্ত গ্রাম্যধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তার পরনে, যা দেখচে তাতেইঅবাক হয়ে সেদিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

দু-একজন জেলে তার রকমসকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরেজিজ্ঞেস করলে—নাম কি ছোকরা ?

ছেলেটি বল্লে—জেমস কুক।

তারপর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বল্লে—সে কোনো জাহাজেনাবিকের কাজ খুঁজচে। আছে তাদের সন্ধানে এমন কোনোচাকুরি খালি ?

কেউ কেউ তার বাড়ি, বাপ-মার কথা, বয়েস জিজ্ঞেসকরলে। সবাই তাকে বোঝাল, জাহাজের কাজে বড় কষ্ট।কুকুর বেড়ালের মতো জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখনসমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ যায়। খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। এত অল্পবয়সে জাহাজে কাজ কেন খুঁজচে সে ?

ছেলেটি বল্লে—ওর বয়েস আঠারো। তার বাবা মাটি কাটা কাজে দিনমজুরি করে। তাদের গ্রামের একটি দয়ালুমহিলার কাছে ছেলেটি সামান্য লেখাপড়া শিখেচে। তারপর সে মাঠে মজুরের কাজ করেচে; দিনকতক একটা মুদির দোকানে খাতা লিখত। কিন্তু এসব তার ভালো লাগে না। সে সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবে।

সবাই অবিশ্যি হেসে উঠল। জাহাজের চাকুরি জোগাড় করা অত সোজা নয়। বহুদিন জলের ধারে ঘোরাঘুরি করতেহবে তবে যদি কিছু হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানত না, সে ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিষ্যতে সে হবে কাপ্তেন জেমস কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সে সময়ে কোনোনির্ভরযোগ্য ম্যাপ ছিল না। ১৭৬৮ সালের একখানা ওইঅঞ্চলের ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান কালের একখানা ম্যাপেরতুলনা করলে এ সকল বোঝা যাবে। দু-চারটা দ্বীপের নামপুরানো ম্যাপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদের অবস্থিতিস্থান সম্বন্ধে মানচিত্রকরের কোনো ধারণা ছিল না। কাপ্তেনকুক প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ আবিষ্কার করেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শেক্সপীয়ারের জীবনের অনেকখানি যেমন অজ্ঞাত, কুকেরও তাই। কিছুদিন হুইট্‌বিতে আসার পর কুক একখানাছোট জাহাজে চাকরি পেয়ে সমুদ্রে বার হয়েছিলেন। কিন্তু সে জাহাজের দৌড় ছিল ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের উপকূলেরবন্দরগুলো পর্যন্ত। এই জাহাজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়েতিনি তেরো বছর কাটিয়েছিলেন। এই তেরো বছরেরবিশেষ কোনো বিবরণ জানা যায় না।তবে উপকূলবর্তীসমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অতি অপকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে, সামান্য একটু জায়গার মধ্যে জড়সড় হয়ে শুয়ে থেকে এবংউত্তর সমুদ্রের ভীষণ শীতবাত্যা সহ্য করে তিনি এমনঅভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনোকষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতেন না।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী পরস্পরের খুবনিকটে এসেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এই ব্যাপারনিয়ে খুব একটা সাড়া পড়ে যায়। শুক্রগ্রহ যখন সর্বাপেক্ষানিকটে আসবে পৃথিবীর, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানেঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল শুক্রগ্রহ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করারজন্যে।

ওই সালের ৩রা জুন ওই ঘটনার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। গ্লাসগো ও আরো দু-একটা বড় শহরের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শহরবাসীদের সন্ধ্যার পরে আগুন জ্বালাতেনিষেধ করা হল। কারণ অতিরিক্ত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে না।

ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটি রাজা তৃতীয় জর্জের সাহায্যেএকখানা জাহাজ পাঠালেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের টাহিটি দ্বীপে, সেখান থেকে এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বেশিসুবিধা হবে বলে। কাপ্তেন কুকের ওপরে এই জাহাজচালানোর ভার পড়ল।

জাহাজে সেকালের দুজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ লিনিয়াসেরছাত্র ডা. সোলানডার।

কুকের জাহাজে ৪১ জন সাধারণ মাল্লা ও ১২ জনজাহাজের কর্মচারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাবিকেরাপশুত্বের জন্যে প্রসিদ্ধ, কুকের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগল যে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন, মূর্খ লোকগুলো এত দীর্ঘদিন সমুদ্রে শান্তভাবে থাকবে কিনা।

জাহাজ প্লিমথ সাউন্ড ছাড়ল আগস্ট মাসের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ম্যাডিরা দ্বীপে নোঙর করলে।ম্যাডিরাতে লোকে শুনলে জাহাজে দুজন বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা প্রকৃতির সব বড় বড় রহস্য অবগত আছেন। বেজায় লোকের ভিড় হল তাঁদের দেখবার জন্যে।ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের একটি মঠ এখানে ছিল। মঠেরকয়েকটি সন্ন্যাসিনী এসে তাঁদের বল্লেন—একটা উপকারকরবেন আমাদের? ভালো জলের ঝরনা কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছিনে। ভালো জলের বড় অভাব হয়েচে। বলে দিন না কোথায় খুঁড়লে ভালো জল পাব ?

বহু বৎসর পরে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা বুঝেছিলেন যে পানামা খাল কাটানোর পূর্বে ম্যালেরিয়া জ্বর ওপীতজ্বরের দমন আবশ্যক, নয়তো মজুর ও কর্মচারীর দলজ্বরে মরে গেলে খাল কাটবে কে ?কুকও তেমনি বুঝেছিলেন শত সমুদ্র পার হয়ে যদি সুন্দর প্রশান্ত মহাসমুদ্রেতাঁকে পৌঁছাতে হয়, তবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে জাহাজে স্কার্ভে রোগ না দেখা দেয়। টাটকা শাকসব্জি বাফলমূল দীর্ঘকাল না খাওয়ার দরুন এই রোগ হয় বলে কুকযখন যে বন্দরে জাহাজ থামাতেন, সেখান থেকে প্রচুরপরিমাণ ফল ও তরি-তরকারি কিনে নিতেন। কিন্তুজাহাজের মাল্লারা এসব খেতে রাজি হল না। তারা লবণাক্তগোমাংসের বড় বড় টুকরো খেতে অভ্যস্ত এবং খোসা লাগাওটমিলের বিস্কুট। কাপ্তেন কুক কড়া হুকুমজারি করলেন,প্রত্যেক মাল্লাকে সপ্তাহে দশ সের পিঁয়াজ খেতেই হবে। একজন মাল্লা আদেশ মানেনি, তাকে বারোটি বেত মারবারহুকুম হল।

কেপ হর্ন পার হবার পরে আর কোথাও টাটকা শাকসব্জিপাওয়া গেল না। কাপ্তেন কুক জাহাজে রাশিকৃত নারিকেলনিয়েছিলেন বাহাম দ্বীপপুঞ্জ থেকে। এবার সমুদ্রের ধারথেকে বোঝা বোঝা সবুজ ঘাস উঠিয়ে জাহাজের খোলভর্তি করলেন। হর্ন পার হবার পরে সবাইকে কাঁচা নারিকেলও সেই ঘাস একত্রে সিদ্ধ করে তাই খেতে বাধ্য করলেন।জাহাজে হইচই পড়ে গেল।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাজ টাহিটি দ্বীপেপৌঁছে গেল। নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে কুক তাদেরবিবরণ লিখলেন এবং রয়েল সোসাইটির সম্মানার্থে এদেরনামকরণ করলেন ‘সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ’।

পলিনেসীয় এইসব দ্বীপবাসীদের সরল আচার ব্যবহার ফিল্মের কল্যাণে আমাদের সকলেরই সুপরিচিত।

কুক ও জাহাজের লোকেরা অধিবাসীদের এই প্রথম দেখে তো অবাক। একটা ছোট দ্বীপের রানিকে ডা.সোলানডার একটা পুতুল উপহার দিলেন, তাতে সেইদ্বীপের বাহান্ন বছর বয়সের লম্বাচওড়া জোয়ান রাজা এইপুতুলটা দেখে এত মুগ্ধ হন যে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে দূতপাঠিয়ে প্রস্তাব করলেন এ দেশের একটি ভালো মেয়েরসঙ্গে সে ডা. সোলানডারের বিবাহ দিতে রাজি, ওইরকম আর একটা পুতুলের পরিবর্তে।

টাহিটি পরিত্যাগ করবার পূর্বে কুক সে দ্বীপে কমলালেবু, তরমুজ, লেবু ও আরো অনেকরকম ফলমূলের বীজ বপনকরেন। বনে কয়েকটি মুরগি ও কুকুর ছেড়ে দিয়েছিলেন।যে যে দ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন প্রায় সব স্থানেই সর্বাগ্রে তিনি কিছু ফলের বীজ ছাড়িয়ে দিতেন। এ থেকে পরবর্তীকালে অনেক দ্বীপের উদ্ভিজ্জ সংস্থানের প্রকৃতি বদলে যায়। টাহিটি দ্বীপে দুজন মাল্লা জাহাজ ছেড়ে কোথায়পালিয়ে গেল।

কুক তাদের ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না, দ্বীপেরসর্দারদের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পরে উপকূল থেকে বহুদূরে এক নিভৃত পার্বত্য অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায়।তারা এর মধ্যে সে দেশের দুটি মেয়ে বিয়ে করে দিব্যিসংসার পাতিয়ে বসেচে।

তারা বল্লে—কি হবে জাহাজে চাকরি করে ?বেশ আছি।

মেয়ে দুটি দেখা গেল বেশ গৃহকর্মনিপুণা। রুটিফলেরগাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সেঁকতে পারে, বেশি কথাবার্তাবলে না, গাছের ছাল থেকে কাপড় তৈরি করতে ওনারকেলের ছোবড়া থেকে মাছ ধরবার সুতো পাকাতে তারাএকেবারে ওস্তাদ। সুতরাং মাল্লা দুটি সুখেই আছে, কেবলঅভাব অনুভব করে তামাকের জন্যে। তামাক জিনিসটা এসব দেশে একেবারে অজ্ঞাত। এমন সুখের ঘরকন্না তাদের, কাপ্তেন কুক তাদের ভেঙে দিয়ে তাদের ধরে আনলেন জাহাজে। পালাবার শাস্তি বারো ঘা করে বেত। হায় নিষ্ঠুরসংসার !

একদিন একটা লোক ছুটে এসে জানালে দ্বীপের সর্দারঅত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ—বোধহয় আর বাঁচবে না। ডা. সোলানডার রোগী দেখতে গেলেন। সর্দার টবুরাই খুব অসুস্থ বটে, রোগ যে কি কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল জাহাজের এক নাবিকের কাছে খানিকটা তামাকের পাতা চেয়ে নিয়ে সর্দার সেটা গিলে খেয়ে ফেলেছিল—তারপরই এই অবস্থা। ডা. ব্যাঙ্ক রোগীকে বেশি করে ডাবের জল খাওয়াতে বলে চলেএলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।

সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কুক পশ্চিমমুখে রওনা হয়ে১৫০০ মাইল সমুদ্র পার হয়ে নিউজিল্যান্ডে এসেপৌঁছুলেন। কুক নিউজিল্যান্ড যাবার পূর্বে ইউরোপেরভূগোলবেত্তাগণের নিকটও ও-অঞ্চলের ভূমি সংস্থানসম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না, অনেকে বিশ্বাস করত ইউরোপ বা এশিয়ার মতো দক্ষিণ দিকেও একটা মহাদেশআছে। এই সব ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করবার আগ্রহে কুকঅনুকূল বাতাস পরিত্যাগ করে দূর অজানা মহাসমুদ্রের বুকেপাড়ি দেন।

প্রথমে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের আদিম অধিবাসীখাণ্ডারীদের নরমাংস প্রিয়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যেখানে পিকবর্ন শহর, নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলেওই স্থানে কাপ্তেন কুক জাহাজ নোঙর করেন। কিন্তু কোনোমাওরীজাহাজের কাছে আসতে রাজি হয় না। তারা বলে পাঠালে, শ্বেতকায় মানুষেরা যে নরখাদক নয় তার প্রমাণকি ?

ক্রমে মাওরীদের ভয় দূর হল, জাহাজের নাবিকেরা মাওরীদের গ্রামে গিয়ে দেখলে তারা অপ্রত্যাশিতরূপেপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের বড় বড় নৌকা আছে। দূরসমুদ্রপথে এইসব নৌকায় যাওয়া যায়। মাওরীদের গ্রামঅত্যন্ত সুরক্ষিত এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি এত ভালো যেস্পেনের রাজার প্রাসাদেও তা দুর্লভ।

কুকের বিবরণ পড়লে জানা যায় মাওরীদের তিনি খুবঅশ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। একবার জাহাজের এক নাবিক কি একটা জিনিস চুরি করে এনেছিল মাওরীদের গ্রাম থেকে।কুক অপরাধীর ওপর বারো ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

শুধু অজ্ঞাত অঞ্চলে ভৌগোলিক সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কাপ্তেন কুককে কেউ দোষ দিতে পারত না। কারণপ্রকৃতপক্ষে কুকের প্রথম উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে।

কিন্তু কুকের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কুক মাওরীদেরসামাজিক ভোজের বর্ণনা করেচেন, 'ঘণ্টা পাখি'—বনেরমধ্যে ঠিক যেন রুপোর ঘণ্টা বাজচে মনে হয়, পাখিটা যখনডাকে। একটা পাহাড়ের ছবি এঁকেচেন এবং নিউজিল্যান্ডেরসমুদ্র উপকূলের বালিতে কত ভাগ লোহা কত ভাগ সিলিকন মিশ্রিত আছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেচেন।পৃথিবীর সাহিত্যে কুক একজন শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক, নতুন দেশের অত খুঁটিনাটি বর্ণনা খুব কম বইয়ে পাওয়াযায়। ইংল্যান্ডে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি ৪০০ শতপ্রকারের গাছপালা ও নানারকমের সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহকরেন।

কুকের পূর্বে প্রসিদ্ধ নাবিক আবেল টাসম্যান এই দ্বীপআবিষ্কার করেন, কিন্তু জগতের চোখের সামনে তাকেএমনভাবে তিনি ধরেননি।

কুক সাড়ে ছ'মাস ধরে সমস্ত নিউজিল্যান্ডেরউপকূলভাগে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যেক স্থানেরসমুদ্রজলের গভীরতা, চড়া বা প্রবালবাঁধের অবস্থান ইত্যাদিসহ তাদের চার্ট তৈরি করেন। তবুও তো সে সময় আধুনিক কালের অনেক উন্নততর যন্ত্রপাতির অভাব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল ফরাসি ভৌগোলিক এইসবঅঞ্চল পরিভ্রমণ করে কাপ্তেন কুকের প্রস্তুত চার্ট ও ম্যাপের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের দলপতি পরেবলেছিলেন—কাপ্তেন কুকের চার্ট এত নিখুঁত যে আমাকেঅত্যন্ত বিস্মিত হতে হয়েচে সেকালে এত নিখুঁতভাবে চার্ট তৈরি করা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল।

কুক দেশে ফিরবার সময়ে সোসাইটি দ্বীপের একজনঅধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম ওমাই। বিলেতে হই-হই পড়ে গেল। তার আগে বিলেতের লোকেএমন ধরনের মানুষ দেখেনি। কাউপার তার উদ্দেশ্যে কবিতালিখলেন,

সার জোশুয়া রেনল্ডস তার ছবি আঁকলেন, ডা. জনসন তাকে একদিন নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তারসঙ্গে এক টেবিলে আহার করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরেরদ্বীপপুঞ্জের খুব কম অধিবাসীর অদৃষ্টে এমন সম্মান জুটেছে।

বড় বড় লোকের ড্রইংরুমে, লন্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের বড় বড় পার্টিতে ওমাই নিমন্ত্রিত হয়ে খেতে লাগল। এমন সম্মান ও সুযোগ পেয়েও ওমাই কিন্তু একটুওবদলালো না। শেখার মধ্যে ওমাই খুব ভালো দাবা খেলতেশিখল। সে সময়ের অনেক ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড়কেওমাই খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল।

পুনরায় সমুদ্রভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুক ওমাইকে এবারতার নিজের দেশে পৌঁছে দিলেন। তাকে বেশ ভালো একখানা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল, নাবিক বন্ধুরা তাকেসভ্য মানুষের ব্যবহার্য বাসনপত্র দিলে, কুক তাকে একখানাবাগান করে দিলেন এবং নানারকম ফলমূলের বীজ উপহার দিলেন। লোকটা কিন্তু ঘর-গৃহস্থালির কাজে আদৌ মন না দিয়ে বাড়ির সামনে লোক জড়ো করত ও দিনরাত তাদেরবিশেষত গ্রামের তরুণীদের প্রশংসাদৃষ্টির সামনে মহা আনন্দে বিলেত থেকে আনা একটা হারমোনিয়াম বাজিয়েগান গাইত।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওয়াইদ্বীপবাসীদের হাতে কাপ্তেন কুক নিহত হন।

ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ

গত শতাব্দীতে ফিজি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুজন লোকের আবির্ভাব হয়েছিল যে সারা প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তাদের জুড়ি আর কেউ খুঁজেপাবে না। একজন হচ্ছেন টোঙ্গা দ্বীপের রাজা প্রথম জর্জ টুবু এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পকালস্থায়ী ফিজি রাজ্যের রাজাথাকওম্বু। হাওয়াই দ্বীপের সোমারি জাতিদের মতো ইঁহারাও বুঝেছিলেন যে খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে মিলেমিশে নাচলতে পারলে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।মিশনারিদের বন্ধুত্ব অর্জন করবার জন্যেই এঁরা সুযোগ বুঝেখ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মিশনারিরাও বুঝতে পেরেছিল যেফিজি দ্বীপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সাফল্য নির্ভর করচে এদেরক্ষমতা বিস্তারের ওপর। তাই এঁদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিতকরতে তাঁরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

প্রথমত থাকওম্বু ছিলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাবাউ দ্বীপের বংশানুক্রমিক মণ্ডল। তাঁর স্থানীয় উপাধি ছিল ‘ভু-নি-ভালু’ অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা। মাবাউ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ, ফিজি দ্বীপের বর্তমান প্রধান বন্দর ও রাজধানী সুতা থেকেআঠারো মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ভু-নি-ভালু’উপাধিধারী রাজবংশ বহুকাল ধরে এখানে রাজত্ব করে আসছিল। এরা ছিল নরমাংসভোজী মাবাউ জাতির সর্দারএবং নিকটবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সর্দারের কাছে চিরকাল কর গ্রহণ করে এসেচে। এই মাবাউ দ্বীপে প্রচলিতকথ্যভাষা বর্তমান ফিজি ভাষার মেরুদণ্ড। নরমাংস ভোজনের সুবিধা আজকাল আর না হলেও মাবাউ জাতিতাদের অনেক পুরাতন আচার ব্যবহার বজায় রেখেচে। মাবাউ দ্বীপের রাজধানী মাবাউ শহর, শহরের (কাছে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র) পশ্চিমপ্রান্তে বড় একটা পাহাড়ের ওপরমিশনারিদের বাসস্থান এবং পাহাড়ের তলে, বারা বা সবুজতৃণভূমিতে যেখানে পূর্বে উৎসব উপলক্ষে নরমাংসঝলসানো হত সেখানে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের গির্জা অবস্থিত। মিশনারিদের কড়া শাসনে এখানে বাৎসরিক উৎসবের সময় অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের যে নাচ হয়, তাতে বাজনার সুর পর্যন্ত খ্রিস্টান স্তোত্রগানের সুরেরঅনুকরণে বাঁধা, মেয়েদের পোশাক পরতে হয় লম্বা গাউন যাতে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

মাবাউ দ্বীপটি ছোট, সমস্ত দ্বীপের বর্গফল মাত্র বাইশ একর, তার আবার অর্ধেক জুড়ে আছে পশ্চিম প্রান্তের বড়পাহাড়টা। পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রের যে সংকীর্ণ উপকূল তাতে ছোট বড় নারিকেল গাছের বন, তার তলায়অধিবাসীদের খড়ে-ছাওয়া কুটিরশ্রেণী।

রাজা থাকওম্বুর রাজত্বের ইতিহাসটা একটানাসুখসমৃদ্ধির ইতিহাস নয়।

নোট প্রচলন করাতেই যত গোলমাল বাধল।

সভ্য গভর্নমেন্টের নোট প্রচলনের মূলে যে অর্থবলথাকে রাজা থাকওম্বুর তা ছিল না, ফলে নতুন নতুনঅর্থসংকট দেখা দিলে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা রাজা থাকওম্বুরনোট নিতে চায় না, তাদের দেখাদেখি দ্বীপের আদিমঅদিবাসীরাও নোটের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করলে। একটাবিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

১৮৭৪ সালে রাজা থাকওম্বু অর্থসংকট থেকে উদ্ধারপাবার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করলে এবং উভয়ের মধ্যে একটা রফা হল, যার ফলে থাকওম্বু ব্যক্তিগতসকল প্রকার দাবিদাওয়া ত্যাগ করে মাবু ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ গ্রেট ব্রিটেনের হাতে তুলে দিলেন।

মাবাউ দ্বীপের রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারীর নামরাটু পোপি সেনিলোলি। ইনিই বর্তমান 'ভু-ণি-ভালু' বায়ুদ্ধের দেবতা। বনেদি বংশের মানুষ, এ ছাড়া এর গৌরব করবার কিছু নেই, নিতান্তই গরিব প্রজারা প্রথানুযায়ী যেসব উপঢৌকন নিয়ে আসে তাতেই কায়ক্লেশে চলে। রাটুপোপির চেহারা খুব ভালো। দীর্ঘাকৃতি, মুখশ্রী গর্বব্যঞ্জক, বলিষ্ঠ গঠন। ইংরাজি স্কুলে লেখাপড়া করার দরুন রাটুপোপি চমৎকার ইংরাজি বলতে পারেন। যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য লাভ করবেন, তাঁরাসকলেই রাটু পোপির বর্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখিত হবেন।তাঁর স্ত্রী আন্ডি টোরিকা রাজবংশের উপযুক্ত বধূ বটে।

মাবাউ ছোট দ্বীপ হলেও এখানে দেখবার অনেক জিনিস আছে। প্রাচীন কালের তৈরি পাথর বাঁধানো পোতাশ্রয় এখানকার একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু। পোতাশ্রয়ের সম্মুখেপ্রকাণ্ড বড় পাথরের বাঁধ, বাইরের সমুদ্রের ঊর্মিমালা এইপাথরের বাঁধের গায়ে এসে আছড়ে পড়চে কতকাল ধরে; কিন্তু এখনো আশ্চর্যরূপ অটুট রয়েছে গোটা বাঁধটা। অবশ্যএর একটা ভৌগোলিক কারণ এই যে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ ভিটি লেভুর সম্মুখে বিখ্যাত প্রবালের বাঁধবহিঃসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত থেকে ওই অঞ্চলের সব ছোটবড় দ্বীপের উপকূল ভাগকেই রক্ষা করচে। ইউরোপীয়গণেরআগমনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ওসভ্যতার অবনতির যুগ আরম্ভ হয়েচে। এখন সকলেই সস্তা ধরনের ইউরোপীয় বা আমেরিকান শিল্পকলার অনুকরণকরতেই ব্যস্ত। মাবাউ দ্বীপের পাথরের বাঁধের মতো প্রবালও পাথরের চাঁই দিয়ে পোতাশ্রয় নির্মাণ করবার নিপুণতাএরা বর্তমানকালে হারিয়ে ফেলেচে। এই পাথরের বাঁধের ফাঁকে ফাঁকে এ দেশীয় ডোঙা চলাচলের সরু পথ আছে। বড় একটা গাছের মোটা গুঁড়িতে খোল করে এই সব ডোঙাতৈরি হত, এখনো হয়। একদিকে হেলে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবার জন্যে বিপরীত দিকে বড় একখানা কাঠবাঁধা থাকে ডোঙার পাশে, পাল খাটাবার মাস্তুল, মোড়ঘুরোবার সুবিধার জন্যে হাল, সবই এতে থাকে। ইংরাজিতেএ ধরনের ডোঙাকে বলে outrigger canoe—অনেক সময়দুখানা ডোঙা পাশাপাশি বাঁধা থাকে। বেশি মালপত্র বোঝাইদেবার জন্যে এ সকল জোড়া ডোঙা ব্যবহৃত হত।

এই শ্রেণীর ডোঙা এখন আর বড় একটা তৈরি হয় না, হলেও পূর্বের মতো মজবুত জিনিস আর এখন পাওয়া যায় না। ডোঙা তৈরির শিল্প এখন লোকে ভুলে যাচ্ছে। জোড়াডোঙার ব্যবহার তোপ্রায় উঠেই গিয়েচে। খুব বড় ডোঙাওগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়েচে।

সমুদ্রের যে খাড়ির বাইরে পাথরের বাঁধ অবস্থিত, তারই উপকূলে অনেকগুলি প্রাচীন দিনের মন্দির এখনো দেখাযায়। মাটি ও পাথরের বড় বড় বেদির ওপরে এই সব মন্দিরতৈরি। সেকালে মন্দিরের দেবতার সম্মুখে নরবলি দেওয়ারপ্রথা প্রচলিত ছিল। তারপর সেই নিহত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়েসকলে মিলে মহা আনন্দে ভক্ষণ করত।

একটা মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা, এরই উচ্চবেদীর একপ্রান্তে রাটু পোপি তাঁর দরবারগৃহ নির্মাণ করেচেন।রাজ্য শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তিনি এখানে দ্বীপের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দরবারগৃহ বলতে সাধারণত আমাদের মনে যে ছবি জাগে, এ সে ধরনের কিছুনয়। এ ঘরের দেওয়াল চেরা-বাঁশের, চাল আখের পাতায়ছাওয়া। ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছানো। এখন সেখানে সভাভঙ্গের পরে কাভা নামক পানীয় অভ্যাগতদের মধ্যেবিতরিত হয় এবং মাঝে মাঝে গানবাজনাও হয়।

প্রাচীন দিনের অনেক প্রথা পরিবর্তিত আকারে মাবাউদ্বীপে প্রচলিত আছে, যদিও মিশনারিদের খরদৃষ্টি ও সতর্কতার ফলে ওইসব প্রাচীন রীতিনীতির ভয়ানকত্বসম্পূর্ণরূপেই দূরে রয়েচে। রীতিনীতি বজায় আছে, কিন্তুখ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর থেকে তাদের ওপর সভ্যতার একটি প্রলেপ পড়েছে। খুব লক্ষ করে দেখলে প্রলেপটুকুর ক্ষীণআবরণ ভেদ করে প্রাচীন কালের প্রথার আদিম রূপটি এখনো বার হয়ে আসে। প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাবাউ দ্বীপের মিশনারি সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভারঅধিবেশন হয় এই দরবারগৃহেই। বহুদূর থেকে গ্রাম্য লোকেরা মাবাউ শহরে এই উপলক্ষে জমা হয় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা, ভজনগীত, নৃত্য, ভোজ, বাজিপোড়ানো ইত্যাদি চলতে থাকে। খুব বড় মেলা বসে এবংদেশীয় নানাবিধ শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত হয়। সকলেই মিশনারি ফান্ডে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থদান করে।

ভোজের মধ্যে বেশি কিছু আড়ম্বর নেই। গ্রাম থেকেআসবার সময়ে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমতো কিছু কিছু মিষ্টিআলু, সাবু, রুটিফল ও কাভা প্রস্তুতের জন্যে ইয়ানসোনার মূল সংগ্রহ করে আনে। যাদের অবস্থা কিছু ভালো, তারাএকটা করে শূকর আনে। এই শূকর রন্ধনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণপ্রাচীন প্রথানুযায়ী নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

একটি হৃষ্টপুষ্ট শূকর বেছে নিয়ে তার মাথায় ডাণ্ডা মেরেবধ করা হয়। তারপর তার পেট চিরে পেটের মধ্যে তপ্তপাথরের নুড়ি পুরে পেট আবার সেলাই করে দেওয়া হয়। ঝিনুক আর প্রবালের খোসা দিয়ে তার গায়ের লোম চেঁচেফেলা হয়।

এইবার শূকরটি উনুনে ঝলসাবার যোগ্য বলে বিবেচিতহল। যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসির রাজকীয় রন্ধনশালা ছাড়া এই শূকর অন্য কোথাও রান্না হবার নিয়ম নেই। রাটু রোসিররন্ধনশালার উনুন একটু গোলাকার পাথর বাঁধানো কুণ্ড, তারব্যাস হবে প্রায় আট ফুট, গভীরত্ব সাড়ে তিন ফুট। এইউনুনের তলায় একরাশ সরু সরু গাছের ডাল জড়ো করেআগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঝুড়ি দুই ছোট ছোটপাথরের নুড়ি ওই আগুনের মধ্যে রেখে সেগুলোকে উত্তপ্তকরা হয়। পাথরের নুড়িগুলো ঠিকমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠলেমৃত শূকরটি তার ওপর চাপিয়ে তার চারিপাশে মিষ্ট আলু, টরো মূল, সামুদ্রিক হাঙরের ডানা, বড় কাঁচা ঝিনুক ইত্যাদি স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবসুদ্ধ মিলে টিমে আঁচে সিদ্ধ হতে থাকে।

নিয়ম এই যে, রন্ধনকার্য শেষ হলে যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসি সর্বপ্রথম এই খাদ্য আস্বাদ করবেন। একখানা বড়ছুরি দিয়ে শূকরের মাংস তিনি কিছু কেটে নিয়ে মুখে তুলেদেবেন। সকলে সেই সময়ে জয়ধ্বনি করে উঠবে, মঙ্গলবাদ্যবাজতে থাকবে।

তিনি এইবার সমবেত প্রজাগণকে ভোজে যোগদানকরবার অনুমতি দেবেন।

ইউরোপীয়গণ ফিজি দ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্বেও এইউৎসব ঠিক এইভাবে সম্পন্ন হত, শুধু শূকরের পরিবর্তেতখন জীবন্ত মানুষকে ঠিক ওইভাবে মাথায় ডাণ্ডা মেরে বধ করা হত, ওইভাবেই আগুনে ঝলসানো হত এবং মহামহিম ‘যুদ্ধের দেবতা’ ঠিক ওইভাবেই ছুরি বার করে সর্বপ্রথমসেই নরমাংস আস্বাদ করতেন। তখন অবশ্য মিশনারিদেরসঙ্গে এই উৎসবের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এর নাম ছিল ‘বোকোলা’ অর্থাৎ নরমাংসভক্ষণের উৎসব।

রাজকীয় উনুন থেকে মাংস খাবার ক্ষমতা নেইপ্রজাদের। শূকরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে তবে তার মাংস সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। নারিকেল গাছের শিকড়েতৈরি বড় বড় ঝুড়ি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভোজের পর মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়।

নাচের পোশাক বড় চমৎকার। গাছের ছালে তৈরি ‘তাপা’ বা ‘মামি’ বলে একপ্রকার পরিচ্ছদ এই উপলক্ষে মেয়েরা পরে। ‘মামি’ যেদিন ব্যবহৃত হবে, সেদিনই তৈরিকরতে হয়। তা না হলে এই পরিচ্ছদ পরা চলে না।

মেয়েরা গলায় পরে রাঙা হিবিস ঘাস ও হলদে ফ্রালিপিনী ফুলের মালা, কোমরে জড়ায় কচি সবুজ পত্রযুক্তবন্যলতা, মাথার চুলে গুঁজে রাখে সাদা রঙের পোনো ফুল। সাধারণত ছত্রিশটি নর্তকী দরকার হয় নাচের জন্যে, এরাদুদলে ভাগ হয়ে সামনে পিছন সারি বেঁধে দাঁড়ায় এবং বাজনা শুরু হবার পরে তালে তালে নাচতে আরম্ভ করে।উৎসবের পনেরো ষোলো দিন আগে থেকে নাচের তালিম চলে এবং স্বয়ং রাটু রোসি তালিমের সময় উপস্থিত থেকেযাতে নাচ নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধানকরেন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে অনেকে মাবাউ দ্বীপে গিয়েথাকেন। রাটু রোসি শিক্ষিত লোক ও উদার আতিথেয়তারজন্যে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের বাড়িতে তিনিআগন্তুকদের স্থান দেন ও যথেষ্ট সমাদার করেন। কিন্তু কারো শুধু হাতে রাটু রোসির আতিথ্য গ্রহণ করতে যাওয়া উচিতনয়, কারণ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত হলেও ইনি বর্তমানে দরিদ্র প্রজাদের আনীত উপঢৌকনে কোনোক্রমে দিন গুজরানকরেন। অন্তত কিছু সিগারেট ও তামাক সঙ্গে করে নিয়েগেলেও রাটু রোসিকে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়, কারণফিজিদ্বীপে তাম্রকূট বড়ই দুর্মূল্য।

লা সিবা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই কলার চাষ প্রচুরপরিমাণে হয়। কলার ব্যবসায়ের জন্য সে সব দেশ টিকিয়াআছে এবং দেশের সমস্ত মূলধন ও পরিশ্রমের বারো আনাঅংশ কদলী উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যে নিয়োজিত হইয়াথাকে। জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর নিম্নলিখিতবিবরণটি হইতে আমরা ইহার একটি সুন্দর ছবি পাই—

ঊষার অরুণ রাগ পূর্বাকাশে সবে দেখা দিয়াছে।

আমরা হন্ডুরাস দ্বীপের উপকূল বাহিয়া লা সিবা বন্দরেরদিকে চলিয়াছি।

উপকূল ভাগ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বালুময়। তার পিছনেউচ্চ পর্বতমালা, আকাশের রং তখনো নীল হয় নাই, কিন্তু পর্বতের মাথাগুলো রাঙা হইয়া আসিল।

একটু পরেই সূর্য উঠিল, এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেআকাশ ও সমুদ্রের রং যেন কোনো ইন্দ্রজাল দণ্ডের স্পর্শে বেমালুম বদলাইয়া গেল। আকাশ হইল ঘন নীল, উপকূলেযা এতক্ষণ ছিল কৃষ্ণবর্ণ জমাট অন্ধকার, এইবার তাহা হইলঘন সবুজ অরণ্যানী। সকালের কুয়াশাও কাটিয়া গেল।

উপকূলের বনের রং আরো সবুজ হইল। কেবল মাঝেমাঝে সাদা বনফুলের রাশি যেখানে বনের মাথা আলোকরিয়া রাখিয়াছে, বনের সেই অংশ ছাড়া।

আমাদের চারিপাশে কিন্তু কোনো শব্দ নাই, কাহাকেওনড়িতে চড়িতে দেখা যায় না। এত সকাল যে বোধ হয়শয্যাত্যাগ করিয়া অনেকেই ওঠে নাই।

উপকূলের এত কাছ ঘেঁষিয়া আমরা চলিয়াছি যেনজঙ্গলের গাছপালার পাতা হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়।এমন সময় জাহাজের লোকে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'লাসিবা।'

দূরে দিগন্তের কোলে এক পোঁচ কালো কালির মতো কিএকটা ব্যাপার দেখা যাইতেছিল বটে। উপকূলে জঙ্গলেরফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল; সবুজনারিকেল কুঞ্জের মধ্যে পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুটির। দু-একটা কুটিরের ভিতর হইতে সরু ধোঁয়ার রেখা ঘুরিয়াঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে।

সম্মুখে ক্রমে একটা কাঠ ও লোহার তৈরি জেটি ওজেটিতে বসানো বড় বড় মাল উঠাইবার লৌহযন্ত্র স্পষ্টহইয়া ফুটিতে লাগিল। উপকূলের এই বন্য সৌন্দর্যের পাশেহঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-সভ্যতার প্রকৃষ্ট চিহ্নগুলি যেনবড় বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সুখের বিষয় এই যে তাহারা জঙ্গলকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই, জঙ্গলইতাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছে। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে একসারিসাদা রংয়ের ঘরবাড়ি, বোধ হয় বা গুদাম কিংবা জেটিআপিস। নারিকেল বনের নীচে কালো কয়লার স্তূপ।

ইহাদের পিছনে কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না, উপকূলেরঅপেক্ষাকৃত নিম্ন শৈলরাজির পিছনে খুব উঁচু পাহাড়-পর্বত, আর কি ভয়ানক জঙ্গল সেই সব পর্বতের সানুদেশে। দ্বীপের আভ্যন্তরীণ কোনো দৃশ্য কৌতূহলী বৈদেশিক ভ্রমণকারীর চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রকৃতি যেন সবুজ যবনিকারআড়ালে ও-দিকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উঃ কী ভীষণ গুমোটগরম এই সকালবেলাতেই ! বেলা এখনো আটটা হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তায় চলে কার সাধ্য ?উষ্ণদেশের প্রচুরসূর্যালোক আমাদের পক্ষে একদিকে যেমন অতি লোভনীয়, এই অসহ্য উত্তাপ তেমনি কষ্টদায়ক। পথের ধারে একটা সৈন্যাবাস, কতকগুলি ছন্নছাড়া মূর্তির সৈন্য তার সামনেপ্রভাতিক কুচকাওয়াজের চেষ্টায় আছে। চারিধারেই মাটির বাড়ি। খড়ে বা নারিকেল পাতায় ছাওয়া। ময়লা কাপড় পরা ছেলে মেয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় ধূলায় খেলা করিতেছে.লাল টালির ছাতওয়ালা বাড়িগুলি বোধহয় গভর্নমেন্টের, কারণ এসব অঞ্চলে অনবরত বিদ্রোহের ফলে তাদেরদেওয়ালগুলির গায়ে ঝাঁঝরা হইয়া আছে। যেন নদীর পাড়েপাখির বাসার গর্ত।

এই হইল 'লা সিবা'র সাধারণ অবস্থা। এই রাজনৈতিকঅবস্থায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বেশি উন্নতি হওয়াসম্ভব নয়। কলার চাষ না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াইত।

যে কয়েকটি আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনী এখানেমূলধন ফেলিয়াছে, বর্তমান 'লা-সিবা' তাহাদেরই সৃষ্টি।তাহাদেরই অর্থে ও যত্নে এই জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিকআলো জ্বলিতেছে, কংক্রিটের ঘরবাড়ি, গুদাম ও জেটি তৈরি হইয়াছে। রাস্তার উপর পিচ ঢালা হইয়াছে।তাহাদেরই অর্থে এখানে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, ক্লাবেটেনিস খেলা চলে, এবং বড় বড় তাল জাতীয় গাছের তলায়প্রস্ফুটিত বুগেনভিলিয়া ফুলের আড়ালে কাঠের সুদৃশ্যবাংলোগুলি তাহাদেরই।

‘লা সিবা’র গৌরব করিবার কিছুই নাই। না আছে ইহার গৌরবময় অতীত, না আছে এখানে কোনো প্রাচীন গির্জা, কি রাজপ্রাসাদ। কদলীই এখানকার সকল ঐশ্বর্য ও সকল আধুনিকতার মূলে। সুতরাং এখানকার কদলীক্ষেত্রগুলিদেখিবার ইচ্ছা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

জেটির সঙ্গে ছোট রেললাইন। এই রেললাইন বিভিন্ন কলাবাগানে গিয়াছে।

আমরা ট্রেনে উঠিয়া কলাবাগান দেখিতে চলিলাম।দেখিলাম দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র ক্ষেত্র, সমগ্র উপত্যকা, নদীতীর জুড়িয়া শুধুই কলাবাগান। না দেখিলে ‘লা সিবা’রকলাবাগানের বিশালত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের ধারণা ছিল না কলাবাগান এত বিস্তৃত, এত বিরাট হইতে পারে।

ছোট রেললাইন বাহিয়া আমাদের ট্রেন অগ্রসর হইতে লাগিল। রেললাইনের ধারে নানাজাতীয় কলার বাগান। কোনো বাগানে কলাগাছ দুই তিন হাতের বেশি লম্বা নয়, কোনো বাগান হয়তো জঙ্গল কাটিয়া সম্প্রতি তৈরি করাহইয়াছে, কোনো বাগানে প্রতি গাছে কলার কাঁদি পড়িয়াছে, মাইলের পর মাইল শুধুই এই দৃশ্য। কোনো বাগানে প্রত্যেকগাছেই মোচা ঝুলিতেছে।

কলার কাঁদি গাছে পাকানোর নিয়ম নাই। কাঁদি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সব বাগানে, সেখানে কৃষ্ণকায় স্ত্রী ও পুরুষ মজুরেরা অস্ত্র দিয়া কাঁদি কাটিয়া গাছ হইতে নামাইতেছে এবং অতি-সন্তর্পণের সহিত রেলপথের পার্শ্বস্থ বড় বড় কলার পাতায় ছাওয়া গুদামের মধ্যে রাখিতেছে। মাঝে মাঝেআমাদের ট্রেন পাশের লাইনে রাখা হইতেছিল, বন্দরগামীকলা বোঝাই মালগাড়িকে রাস্তা দিবার জন্যে।

অনেক জায়গায় নূতন কলাবাগানের জমি তৈরি করিবারজন্য জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া পরিষ্কার করা হইতেছে। বহুদূরব্যাপী দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ গাছের গুঁড়ির মধ্যে দু'একটি বৃহৎ বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, সম্ভবত তাহাদের মূল্যবানকাঠের জন্য তাহাদিগকে নির্মূল করা হয় নাই।

দু’একটা কলার বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেল। চার পাঁচ শত একর জুড়িয়া এক একটা কলার বাগান জঙ্গলহইয়া পড়িয়া আছে। এ সব স্থানের মাটি এমন যে কিছুদিনপড়িয়া থাকিলেই আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া যায়। পরিত্যক্তবাগানগুলিতে কলার ঝাড়ের তলায় নীচু আগাছার জঙ্গলএত ঘন যে কাটিয়া পরিষ্কার না করিলে তাহাদের মধ্য দিয়াযাতায়াত অসম্ভব।

কিন্তু কলার বাগান যত বড়ই হউক, ‘লা সিবা’র জঙ্গলকে ইহা তাড়াইতে পারে নাই। জঙ্গল এখানে নিজের প্রভুত্ব এখনো হারায় নাই। রেললাইনের দূরে নিকটে ঘন নিস্তব্ধজঙ্গলের গাছপালা যেন সব সময় মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরিতেছে।

জঙ্গলের এই প্রভুত্ব আরো বাড়িয়াছে এইজন্য যে, এখানে মানুষের বাস খুবই কম। এখনো বর্ষাকাল শুরু হয় নাই, নদীনালা জলহীন। একটা পাহাড়ি নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া জনৈক দেশী কুলির সর্দার বাগান পরিদর্শনেচলিয়াছে। আরো অনেক দূর গেলে তবে দেখা গেল হয়তোজনৈক ইন্ডিয়ান বালক একটি গাধা হাঁকাইয়া কোথায় যাইতেছে। তিন-চার মাইলের মধ্যে এই দুটি মানুষ দেখাগেল, মধ্যে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল।

কলাবাগান যেখানে আছে, সেখানে জঙ্গল দূরে সরিয়াগিয়াছে এই পর্যন্ত, কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই।এদেশে জঙ্গলকে সম্পূর্ণরূপে হঠানো বড় সোজা কথা নহে।

ট্রেন ছোট একটা স্টেশনে দাঁড়াইল।সম্ভবত ইঞ্জিন জললইবে।

স্টেশনের কাছে খানকতক খড়ের ঘর। ঘরের সামনে গুটিকতক কৃষ্ণকায় বালকবালিকা ধূলার উপর বসিয়া খেলাকরিতেছিল। খেলা ফেলিয়া তাহারা গাড়ি দেখিতে দৌড়িয়াআসিল এবং আমাদের দেখিয়া কৌতূহলের সহিত আমাদেরদিকে চাহিয়া রহিল।

কলাবাগানের শ্রমিক ছাড়া এখানে অন্য মানুষের মধ্যেএক ইহাদেরই যা দেখিলাম। এঞ্জিন জল লওয়া শেষ করিয়াআবার চলিল। এবার গাড়ি যেন নীচের দিকে নামিতেছে।পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। রেলপথের দুধারেএখন ভীষণ জঙ্গল। লম্বা লম্বা ডালপালা প্রায় চোখে মুখে আসিয়া ঠেকে। আমরা জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম, জানালায় কাচের গায়ে ডালপালা ঠেকিয়া খড় খড় শব্দকরিতে লাগিল।

জঙ্গল ছাড়াইয়া আবার একটা খুব বড় কলাবাগান। তারপরেই নদী।

নদীর ধারে জেটির পাশে আসিয়া ট্রেন দাঁড়াইলে আমরানামিয়া ছোট একটা বোটে চড়িলাম। জেটির কাছে কলারাখিবার অনেকগুলি গুদাম। জনকয়েক ইন্ডিয়ান ও নিগ্রোকুলি জেটিতে কাজ করিতেছে। আমাদের তো দেখিয়া মনে হইল এখানে কিছুই কাজ করিবার নাই, উহারা শুধু দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছে। এ যেন ঘুমের দেশ। এই ভীষণ জঙ্গলেএখানে মানুষকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে।

নদীর উজানে আমরা চলিয়াছি। আবার সেই নিস্তব্ধতা, আবার সেই জঙ্গল। এবার যেন আরো বেশি। নদীর দুই তীরে এবার আর মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই। শুধুই জঙ্গল। বড়বড় গাছ জলের ধার পর্যন্ত গজাইয়াছে। বড় বড় লতাএ-ডালে ও-ডালে জড়াজড়ি করিয়া বন আরো দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। বনে দু'একটা বাঁদর ছাড়া অন্য জানোয়ারদেখা গেল না।

পরদিন আমরা সমুদ্রের ধারে ফিরিলাম।

চার-পাঁচখানা কলা বোঝাই মালগাড়ি ইতিমধ্যে জেটিরধারে আসিয়া লাগিয়াছে। অনেকগুলি জাহাজও কলার কাঁদির বোঝা তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।একখানা ট্রেন আসিয়া জেটির সাইডিং লাইনে জাহাজেরসঙ্গে সমান্তরালভাবে দাঁড়াইল। নিগ্রো কুলিরা গাড়ির দরজাখুলিতেই দেখা গেল স্তূপীকৃত কলার কাঁদি থাকে থাকেমালগাড়ির ছাদ পর্যন্ত ঠাসা রহিয়াছে। কুলির দল ব্যস্তসমস্তভাবে কলা নামাইতে লাগিল। মাল উঠাইবার কলগুলি ঘড়ঘড় শব্দে জেটির ধার হইতে মাল তুলিয়া জাহাজে ফেলিতে লাগিল। চারিধারে এবার দেখিলাম খুবব্যস্ততা,—খুব হই-চই।

কুলিরা সকলেই নিগ্রো ও ইন্ডিয়ান, দু'একজনতদারককারী কর্মচারী দেখিলাম—তাহারা শিক্ষিত নিগ্রো।ইহারা জেটির মুখে দাঁড়াইয়া নোটবইতে কলার কাঁদির হিসাব রাখিতেছে। মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে কেহ হয়তো একটা কলার কাঁদি নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, কলাপাকিয়াছে কিনা। কাঁদিতে পাকা কলা থাকিতে দিবার নিয়ম নাই। কারণ তাহা হইলে অন্য অন্য কলার ছড়াগুলিও শীঘ্রশীঘ্র পাকিয়া যাইবে। তাই ইহাদের কাজ হইতেছে পাকাকলা বাহির করিয়া সেগুলি কাঁদি হইতে ছিঁড়িয়া বাদদেওয়া।

চল্লিশ হাজার কলার কাঁদি বোঝাই হইয়া গেলে আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত সমুদ্রের অভিমুখেচলিল।

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এন্ডোরা

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যে পার্বত্য অঞ্চল আছে, এন্ডোরারাজ্য সেখানে একটা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। সম্রাট চার্লসদি গ্রেটের সময় থেকেই এন্ডোরা স্বাধীন। যাতায়াতেরপথঘাট ভালো নয় বলে মার্কিন ভ্রমণকারীদের ভিড় ওখানেতেমন নেই। প্রকৃতপক্ষে এন্ডোরার অস্তিত্ব অনেকের কাছেইঅজ্ঞাত।

কাজেই বিংশ শতাব্দী এই দেশে প্রবেশের সুযোগপায়নি। এন্ডোরার অধিবাসীরা এখনো সে হিসেবে মধ্যযুগেআছে। অতি সহজ সাদাসিধে জীবনযাত্রাপ্রণালী এদের, কোনো প্রকার বিলাসিতা এরা জানে না, বিলাসিতা করবারপয়সাও নেই। নির্জনতা যাঁর ভালো লাগে, অনাড়ম্বর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জীবন যাঁরা দেখতে ইচ্ছুক, তাঁরাএন্ডোরায় যেতে পারেন।

হাজার বছর ধরে এন্ডোরাতে একই ধরনেরশাসনপ্রণালী চলে আসচে। একই রীতি এক হাজার বছর যেবজায় আছে, এতেই বোঝা যাবে অধিবাসীরা তাদের দেশও জাতীয় রীতিনীতি কতদূর ভালোবাসেন।

ভূমধ্যসাগরের দিকে পিরেনিজ পর্বতমালার যে প্রান্ত, এন্ডোরা সেখান থেকে হবে ষাট মাইল। উত্তর ও দক্ষিণেএই ক্ষুদ্র রাজ্যটি কুড়ি মাইল, পূর্বে ও দক্ষিণে প্রায় আঠারোমাইল। দেশের সর্বত্রই বন্যময় উপত্যকা। দুদিকে উঁচু পর্বত, মাঝে মাঝে ছোট বড় পার্বত্য নদী ও ঝরনা, মাথার ওপরেসব সময়েই চিরতুষারাবৃত পিরেনিজ পর্বতমালা।

এন্ডোরা যদিও স্বাধীন রাজ্য, তবুও ফ্রান্স ও স্পেনেররাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে চলে। ফ্রান্সকে বার্ষিক নয়শোফ্রাঁ ওস্পেনকে চারশো ষাট ফ্রাঁ নজরানা স্বরূপ দিতে হয়। তবেএই কর দেওয়ার ব্যাপারটা নিতান্তই নামমাত্র ও মামুলিব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এন্ডোরার রাজনৈতিকব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না।

এন্ডোরা রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিতআছে। কেউ বলে সম্রাট চার্লস দি গ্রেটের ছেলে লুই, মুরদের জয় করে এই জঙ্গলের পথে ফ্রান্স ফিরছিলেন, এইবনবেষ্টিত স্তব্ধ উপত্যকায় অনেকগুলো সৈন্য বসবাসকরবার অনুমতি প্রার্থনা করে। লুই দেখলেন ব্যাপারটা বেশ হবে, ফ্রান্স ও মুর রাজ্যের মধ্যে এমন একটি শক্ত মানুষেরদেওয়াল গড়ে রাখা

মন্দ নয়। এন্ডোরার বর্তমানঅধিবাসীগণ সেই প্রাচীনকালের ফরাসী সৈন্যদের বংশধর। অনেকে বলেন মুর দস্যুদল আইনের ভয়ে পালিয়ে এসে ওই অরণ্যময় উপত্যকায় আত্মগোপন করে, তাদেরই দ্বারা এন্ডোরা রাজ্য স্থাপিত হয়। দস্যুরা মুররাজকেও কর দিত, আবার ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ফরাসি সম্রাটকেও কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাত। সেই উপঢৌকনের মূল্য শেষে বার্ষিক নশো ফ্রাঁ নির্ধারিত হয়। মুরিশ ভাষায় 'আলডারা'কথার মানে অরণ্য, এন্ডোরা কথাটার উৎপত্তি সম্ভবত তাথেকেই। কেউ বলেন প্লিনি তাঁর ইতিহাসে এন্ডরিসি বলে একদল জিপসি জাতির উল্লেখ করেচেন, এরা ছিল দুর্ধর্ষপ্রকৃতির যাযাবর জাতি, অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, তারাইকোনো প্রাচীন যুগে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই ঘন অরণ্যময় উপত্যকায় বসবাস করে।

বর্তমানে এন্ডোরা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেনএকজন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রণাসভা। চব্বিশজন সভ্যনিয়ে এই মন্ত্রণাসভা গঠিত, এঁরা কেউ মাইনে পান না। শাসনকার্য চালাবার অনেক খরচ কমে গিয়েচে এতে। বার্ষিকরাজস্বের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বিচার বিভাগের জন্য একজনও বিচারক রাখবার দরকার হয় না। অপরাধীর সংখ্যানিতান্তই সামান্য। যা দু'একটা অভিযোগ আসে, রাজ্যেরবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুসারে তাদের বিচারকরা হয়। লিখিত আইন বলে কিছু এখানে নেই।

ফ্রান্স ও স্পেন থেকে দুজন কর্মচারী এদেশে প্রেরিত হয়, তাদের কাজ উভয় দেশের প্রাপ্য বার্ষিক কর আদায়ের ব্যবস্থাকরে স্ব স্ব দেশে পাঠানো। নরহত্যা সাধারণত ঘটে না, কিন্তুযদি কখনো হয়ে পড়ে তবে শহরের মেয়র এক মজার ব্যাপার অনুষ্ঠান করেন। বহুকাল থেকে এন্ডোরাতে এ প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেচে; আজ তাকে বদলানো যায় না।

শহরের মেয়র ফ্রান্স ও স্পেনের প্রেরিত কর্মচারীদুজনকে ডেকে পাঠান, অন্যান্য গণ্যমান্য লোকও উপস্থিতথাকেন। তারপর মেয়র হত ব্যক্তির মৃতদেহের পাশেদাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করেন—ওঠো হে, মৃত্যু থেকে জেগে উঠে বলো কে তোমাকে মেরেচে এবং তাকে কিশাস্তি দেবো—বলা বাহুল্য মৃতদেহ মেয়রের প্রশ্নের জবাব দেবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

তখন মেয়র সমবেত দর্শকদের মুখের দিকে চেয়েবলেন—লোকটা মরে গিয়েচে, ওর কাছে কথার উত্তরপাওয়া যাবে না।

এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মেয়র অবিশ্যি আধুনিক যুগের পুলিশের হাতেই খুনের তদারকের ভারদেন।

এন্ডোরা পর্বতময় দেশ, আগেই সে কথা বলাহয়েচে—ওইটুকু তো দেশ, যে কোনো পথেই হাঁটা যাক নাকেন, সর্বদা চোখে পড়বে পর্বত। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গেএন্ডোরার তফাত যে এন্ডোরাতে পথিকের দৃষ্টি অত্যন্তসীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, কারণ সামনে পেছনে এবং ওপরের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি পাহাড়ের বিরাটদেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খায়। অনেক সময় সামনে, পিছনেওপাহাড় থাকে, সে সব জায়গায় সত্যিই প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

যাঁরা আধুনিক ধরনের হোটেল খুঁজবেন, এন্ডোরাতেগিয়ে তাদের হতাশ হতে হবে। সেকেলে ধরনের সরাইখানাছাড়া আর কোনো থাকবার স্থান মিলবে না। রেডিও ও টকিখুবই কম ঢুকেচে। এই জন্যেই মার্কিন ভ্রমণকারীর দলওমুখো হয় না কখনো। এমন কি এন্ডোরার পর্বতগুলিরমধ্যে লাবণ্যভরা সৌন্দর্যের অভাব আছে। এখানকার পাহাড় পর্বত যেন যোগী পুরুষ, নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ কিন্তু উদাস নয়। মানুষের অনিষ্ট করবার সুযোগ পেলে ছাড়বার পাত্র নয়, মানুষের মনের কঠিন প্রবৃত্তিগুলি এ ধরনের দৃশ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে, কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

আর কি সে গভীর নির্জনতা ! সেখানে নির্জনতা যেনশব্দময়ী, পর্বতের ওপর থেকে ঝরঝর করে পতনশীল যে ঝরনা তার শব্দের সঙ্গে নির্জনতার শব্দ যেন পাল্লা দিয়েচলতে চায়।

এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের পথ প্রায়ই সংকীর্ণপার্বত্য গিরিবর্ত্মদিয়ে। পুলিশের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু পথে চুরি-ডাকাতির আদৌ ভয় নেই। মোটরগাড়ি এ রকম রাস্তায় অচল, নীচের সমতলভূমিতে অবিশ্যি আধুনিক প্রণালীর পিচঢালা রাস্তা আছে, কিন্তু তার সংখ্যা বেশি নয়।

পাহাড়ের ওপরে মাঝে মাঝে মাটি পাওয়া যায়, তাতেছোট ছোট গমের ক্ষেত। তারও ওপরে কোনো কোনোস্থানে বড় বড় ফার গাছ, কিন্তু বেশির ভাগ পাহাড় অনাবৃত, রুক্ষ, সেখানে গাছপালা জন্মাতে পারে না। উপত্যকারশ্যামল বনানী নানা বর্ণের ফলে সমাচ্ছন্ন, সেখানেনাইটিংগেল ডাকে সব সময়। ছোট ছোট পাহাড়ি নদীর ধারেও মাঠে ফুল খুব ফোটে।

এন্ডোরা যদিও খুব ছোট দেশ, এখানে কয়েকটি ভালোলেখক ও সাহিত্যিক তাঁদের দেশ নিয়ে পিয়ের লোতিরমতো সুন্দর বই লিখেচেন। ইসাবেল স্যান্ডি একজনলেখিকা, এন্ডোরার কৃষক ও শিকারিদের জীবনী নিয়ে ইনিএকখানা ভালো উপন্যাস লিখেচেন। কয়েকটি ইউরোপীয়ভাষায় তাঁর বই মুদ্রিত হয়েচে।

এন্ডোরার লোকে বেশি কথাবার্তা বলতে ভালোবাসেনা। দেশের নির্জনতা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর কঠোরতাতাদের কম কথা বলতে শিখিয়েচে। তা বলে তারাঅসামাজিক নয়। সকল শ্রেণীর লোকেই এখানে অতিথিসৎকার-প্রিয়। সব গ্রামে সাধারণের জন্যে সরাইখানানেই—সেখানে গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া যায়। তারাখুব যত্ন করে এবং অনেক সময় টাকাকড়ি নিতে চায় না।

বার্নার্ড নিটিন তাঁর ‘Round about Andora' নামেবইতে লিখেচেন : এন্ডোরার লোকদের প্রতি বাইরেরলোকে ঠিক সুবিচার করতে পারে না, কারণ বাইরের লোকেতাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় খুব কম। একথা খুব খাঁটি যে প্রথম দর্শনে এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা মনে জাগবে। এদের মুখশ্রী রূঢ়, গলার স্বরকর্কশ, কথ্যভাষা ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশে মিশ্রিত খিচুড়ি, কিন্তুওদের বাড়িতে ওদের সঙ্গে মিশলে কিছুদিন বাস করলেই বোঝা যাবে যে ওরা কত ভদ্র, কত সৎ, কত কর্মনিপুণ।

অধিবাসীদের মধ্যে খুব ধনী নেই, খুব দরিদ্রও নেই।যার বেশি জমি আছে, এদেশে সেই বড়লোক। পশুপালন, কৃষি ও বে-আইনি মদ বিক্রি করা এদেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা। অনেকে সস্তা ইউরোপীয় মালের আমদানিকরে। ভিখারি ও ফিরিওয়ালার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

দেশটা শুধু পাথরের, মাটির পরিমাণ বেশি নেই, সুতরাংজমির দাম চড়া। শস্যক্ষেত্র বলতে অন্য দেশে যা বোঝায়, এখানকার শস্যক্ষেত্র ঠিক সে জিনিস নয়। কয়েকগজ মাত্রজমি পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা এই মাত্র ব্যাপার।

চোরাই মদের ব্যবসার স্থান কৃষির পরেই।

স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশ নিকটেই হওয়াতেবে-আইনি মদ ও কোকেনের ব্যবসা করার সুবিধে বেশি। এদের উপদ্রবে স্পেন ও ফরাসি গবর্নমেন্ট মহা ব্যতিব্যস্ত, নানা রকম নতুন আইন পাশ করে এদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েচে অনেকবার—কিছুতেই কিছু হয়নি।

গোলডেন গ্রামের ওপরে পর্বতের মালভূমিতে স্পেনথেকে অনেকে মেষপাল চরাতে আসে। বহু শতাব্দী ধরেগোলডেনের পশুচারণভূমি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে—তার ঘাসেরজন্যে নয়, কারণ ঘাস বেশি জন্মায় না এখানকার পাথুরেমাটিতে কিন্তু মে মাসের শেষদিকে দক্ষিণ স্পেনে বড় গরমপড়ে, সেখানে তখন ভেড়ার দল রাখলে তাদের নানারকমরোগ হয়, শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং লা খাঞ্চা প্রদেশের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে এসে ঢোকানো হয়এন্ডোরাতে এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গোলডেনেরমালভূমির পশুচারণভূমিতে তারা মোলায়েম শীতের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে হৃষ্টপুষ্ট হয়।

বড় বড় গ্রামে দু-একদল লোক প্রায়ই পাওয়া যায় যারা স্পেনিশ কিংবা ফরাসি ভাষা বোঝে বা বলতে পারে। কিন্তুসাধারণত লোক কাটালান ভাষায় কথাবার্তা বলে। বাইরের লোকের পক্ষে এ ভাষা দুর্বোধ্য, তবে ইশারায় ইঙ্গিতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। এরা খুব ভদ্র ও বিনয়ী, বিদেশীরাএদের কাছে খুব খাতির পায়, অনেক সময় বাড়িতে জায়গাদিয়ে ও খেতে দিয়ে অতিথির কাছে দাম নেয় না।

এন্ডোরা যাওয়ার কোনো ভালো রাস্তা ছিল না এতদিন, কিন্তু সম্প্রতি স্পেন ও ফ্রান্স পরস্পর পাল্লা দিয়ে দু’দিকথেকে দুটো রাস্তা তৈরি করেচে। ভ্যালিয়া নদীর ধার বেয়ে, একটা বিরাট পাহাড়ের তলা দিয়ে এক দুর্গম পার্বত্য পথ ছিল এন্ডোরা যাবার একমাত্র রাস্তা। সে পথে অশ্বতর ছাড়াআর কোনো বাহন নিরাপদ ছিল না। এখন নিউ দুর্গেলেরদিক থেকে স্পেন যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েচে, তাতে মোটর চলবে। ইউরোপের সভ্য দেশসমূহ থেকে এন্ডোরা যাওয়ার ভালো চওড়া মোটরের রাস্তা তৈরি হলে মার্কিনভ্রমণকারীরা কি করে বলা যায় না, কারণ দুনিয়ায় তাদেরঅগম্য স্থান নেই।

ইউগান্ডা

বর্তমান সভ্যতার আলোকে দুর্গম আফ্রিকার বহু রহস্যইআজ উদ্‌ঘাটিত। একদিন যে অনাবিষ্কৃত প্রস্তর ভূখণ্ডগুলিআবিষ্কার করিতে যাইয়া বড় বড় মহারথীগণ প্রাণপাত পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, আজ একজন সাধারণ পর্যটকের কাছেওসেই স্থানগুলি অনায়াসলভ্য ও অত্যন্ত সুগম হইয়াউঠিয়াছে।

প্রাচীন ভূপর্যটকগণ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবন ও দুর্গম মরুকান্তারভেদ করিয়া আফ্রিকার যেসব অংশের পরিচয়পত্র দিয়া গিয়াছেন আজ সেখানে নব নব রেলপথ নির্মিত হইয়া নূতননূতন নামকরণ হইতেছে। ভ্রমণবিলাসী পর্যটকগণ এখন হামেশা সেইসব স্থানে যাতায়াত করিয়া অবাধে মনেরআনন্দ মিটাইতে পারিতেছেন।

তাঙ্গানিকা, ইউগান্ডা ও কেনিয়া এই তিনটি প্রদেশ লইয়া ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা গঠিত। তন্মধ্যে ইউগান্ডার প্রাকৃতিকসৌন্দর্য ও অনন্ত বৈচিত্র্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। বহু দেশঘুরিয়া একই জিনিস বহুবার দেখিতে দেখিতে ভ্রমণকারীর মনে সত্যই এমন এক একঘেয়ে অরুচির ভাব জন্মে। কিন্তুইউগান্ডায় প্রবেশ করা মাত্র সে অবসন্ন ভাব আপনি কাটিয়াযায়। প্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য সেখানে শতধারায় পরিপূর্ণ।কিবা উদ্ভিদজগৎ কিবা জীবজগৎ সকল ক্ষেত্রেই সেখানকারনিত্যনূতন আবিষ্কার আজিও সভ্য দেশবাসীর চক্ষে পরম বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্যামল তৃণশোভা নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ, নানা বর্ণের সুদৃশ্যপুষ্পশোভা, এখানকার পাহাড়-পর্বত, নদনদী, পাখির গান, সবই চমৎকার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময়। ইউগান্ডায় প্রকৃতিরনানা দিকদেশ ও বহুমুখী বিকাশের একত্র সমাবেশ দেখিয়াবিখ্যাত পর্যটক স্ট্যানলি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে “আফ্রিকার মণি” এই নামে ভূষিত করিয়াছেন।

ইউগান্ডায় হ্রদের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। এখানে জলপ্রপাতগুলির অবিরাম বর্ষণশব্দ শ্রবণে হৃদয়ে একগভীর ভাবের সঞ্চার করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম নীলনদীর উৎসমুখ ইউগান্ডার পাদদেশ বাহিয়া স্ফীতধারায় ছুটিয়াচলিয়াছে। সে দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া মাত্র অপার্থিব অনুভূতিতে মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে।

ইউগান্ডার দেশীয় লোকদের সহজ সরল জীবনযাত্রাবড়ই অদ্ভুত। ইংরাজ অধিকার করার পর জাতিবিশেষেরমতিগতি কিছু কিছু পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশলোকেরাই সেই আদিম অসভ্য যুগের রীতিনীতি এখনোপালন করিতেছে। বহু প্রাচীনকালের অসভ্য রাজাদেরশাসনপদ্ধতি এখনো এখানকার আদিম অধিবাসীদের ভিতরপ্রচলিত। অপেক্ষাকৃতসুসভ্য ইউগান্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াযত প্রকারের বর্বর ও অসভ্য জাতি আছে সকলেই এখানেবাস করে। যাহাদের পরিধানে বৃক্ষাদির বল্কল তাহারাসভ্যপর্যায়ভুক্ত; আর যাহারা অর্ধ-উলঙ্গাকৃতি বাএকেবারেই উলঙ্গ তাহাদের হাবভাব ও ব্যবহার হীনতমঅসভ্যতার পরিচায়ক, নীলনদীর পার দিয়া উহাদেরবসবাস। রাও এনজোরিতে আবার একদল আদিম অদিবাসীদেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বামনের বংশ বিশেষ; দেখিতে অতিশয় খর্বাকৃতি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

পূর্বে বলিয়াছি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইউগান্ডার প্রাকৃতিক সংস্থানের পরিচয় যতই পাইতেছেন ততই তাহারঅজ্ঞাত রহস্যের নব নব সন্ধান করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। বহু স্থানের অজ্ঞাত সন্ধান বাহির করিয়া অনেকনূতন তথ্য তাঁহারা দিয়াছেন ও এখনো দিতেছেন। আবারঅনেক জায়গায় এখনো তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; সেখানকার গাঢ় যবনিকা আজিও অপসারিত হয় নাই।

ইউগান্ডায় প্রকৃতি-বৈচিত্র্য কিবা মরু, কিবা বিরাট, কোথাও বিস্ময়বিহ্বল ভয়াবহ মূর্তি নানাভাবেই তাহার দৃশ্যপট লইয়া ধরা দেয়। কোথাও দেখিবে বহুদূর বিস্তৃতশ্যামল উন্মুক্ত ভূখণ্ড প্রখর সূর্যকিরণে দিগ্‌বলয়ের সঙ্গেমিশিয়া গিয়াছে; কোথাও অসূর্যম্পশ্য নিবিড় জঙ্গল, শ্বাপদসঙ্কুল, দিনের বেলাতেও সেখানে আজ পর্যন্ত আলো প্রবেশ করে নাই। আবার এখানকার সুবিপুল পর্বতগাত্র, পাহাড়ের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে; কোনো শিখরদেশ বিরাট মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; সেখান হইতে গৈরিক ধাতু তপ্ত লাভার উষ্ণস্রাব গলিয়াপড়িতেছে। আবার চতুর্দিকের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াকোনো পর্বতগাত্র হইতে জলপ্রপাতের অবিরাম গর্জনধ্বনিশোনা যাইতেছে। সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে নিম্ন অধিত্যকায়জলপ্রপাতের এই মধুর দৃশ্য কি মহিমময়।

ইউগান্ডার উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভিতর প্রধান সম্পদ তুলা।ইহা ছাড়া চিনি, তামাক, লঙ্কা, চীনাবাদাম, কোকো, কপিপ্রভৃতি নানাবিধ জিনিসই এখানে প্রভূত পরিমাণে জন্মে।বিষুবরেখার ভিতর ইউগান্ডার অবস্থিতি। সেজন্য এস্থানেসর্বদাই গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। তবে আফ্রিকারঅন্যান্য অংশের অপেক্ষা এখানকার গ্রীষ্ম একেবারে অসহ্যনয়; তাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বিদেশী পর্যটকগণএখানে অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করিতে পারেন। তবেমাথায় রৌদ্র নিবারণের জন্য সর্বদা টুপি কি ছাতা অবশ্যব্যবহার্য। ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাই এখানে খুব বেশি। তাহারও প্রতিকার আছে। রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া ঠিকভাবে শুইতেপারিলে ম্যালেরিয়ায় আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

পশুপক্ষী শিকারের পক্ষে এ স্থানটি খুবই উপযুক্ত।মৎস্যশিকারিরা প্রত্যহ এখানে মাছ ধরিতে আসেন।এখানকার বিখ্যাত অ্যালবার্ট হ্রদের জলে এবং রিপনজলপ্রপাতের তলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

ইউগান্ডার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজধানীর নামএন্টেবী। ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরে অবস্থিত এন্টেবীরচতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য বড়ই মনোরম। চারিদিকে সবুজ তৃণঘাস। মাঝে মাঝে লাল সুরকির রাস্তা আঁকাবাঁকা চলিয়া গিয়াছে। সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান, নানা বর্ণের কত রকমের ফুল। তারইমাঝে মাঝে ছোট ছোট বাংলো। বাংলো হইতে সুদূরপাহাড়ের শ্রেণীবদ্ধ চূড়াগুলির দৃশ্য অতীব সুন্দর। সেসৌন্দর্যের তুলনা নাই। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতেহয়। আবার এখানকার কত রকম যে পাখি তাহার ইয়ত্তানাই। কলকণ্ঠ পাখিগুলির সুমিষ্ট স্বর শোনামাত্র প্রাণ জুড়ায়।

এন্টেবী ছাড়াইয়া পঁচিশ মাইল পথ মোটরে অতিক্রম করিলে কম্পালায় পৌঁছানো যায়। কম্পালা, ম্যাঙ্গা ইউগান্ডার দেশীয় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এন্টেবীর তুলনায় এই স্থানগুলির লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। কারণশহরের বাজার, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্তই কম্পালায় কেন্দ্রীভূত।কম্পালার অনতিদূরে নেমিরেম্বি পাহাড় দেখা যায়। ১৮৭৭খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুলাই রবিবার সেখানে সর্বপ্রথম খ্রিস্টানমিশনারিরা ধর্মপ্রচার করেন। বহু কষ্ট ও বহু অর্থব্যয় করিয়ানেমিরেম্বি পাহাড়ের চূড়ায় প্রথম গীর্জাটি নির্মাণ করা হয়।কিন্তু গীর্জাটি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই ! ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দেরপ্রবল বাত্যায় গীর্জাটি ভাঙিয়া যায়। পরপর আরো দুটিগীর্জা নির্মাণ করা হয় কিন্তু বজ্রপাত হওয়ার ফলে তাহাওনষ্ট হয়। ১৯১৯ সনে যে গীর্জাটি পুনরায় স্থাপিত হয়, উহাইসর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই নবনির্মিত গীর্জার পাশে মুটেসারবিখ্যাত সমাধিস্তম্ভ প্রোথিত। মুটেসা ইউগান্ডার সমৃদ্ধরাজবংশীয়ের বহু প্রাচীন আদি রাজা ছিলেন।

দেশীয় রাজাকে ইউগান্ডার অধিবাসীরা “কাবাকা” নামেঅভিহিত করিয়া থাকে। কাবাকার রাজভবন ও রাজ্যশাসনসংক্রান্ত প্রধান অফিসগুলি মেঙ্গো পর্বতের উপর অবস্থিত।নলবনের মতো এক জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা এই বাড়িগুলিরচতুর্দিকে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। মেঙ্গো পাহাড়ের নিকটে ‘মেকারের’ নামে যে পাহাড়টি দেখা যায় সেখানে এখনকার জাতীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় এই স্থানটিতেই এখন পরিবর্তন করিয়া আনা হইয়াছে।এতদ্ব্যতীত মুলাগো পাহাড়ে ইউগান্ডার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

ইউগান্ডার প্রধান পার্বত্যপ্রদেশ ও শহরগুলির দৃশ্য বাদদিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ছাড়াইয়া একটু দূরে পল্লীরভিতর প্রবেশ করিলে আরো অনেক ছবি চোখে পড়ে।তাহার মধ্যে “রাজার হ্রদ” নামে এক বহুদূর বিস্তৃত জলাশয় আছে। কম্পালা-এন্টেবী রাস্তার প্রায় তেরো মাইল দূরত্বহইতে “ভিক্টোরিয়া নায়ানজা”র অপূর্ব দৃশ্য অত্যন্ত মনোরমদেখায়। বম্বো আরো ২৪ মাইল দূরে। এখানে তুলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। “কিংস কলেজ” নামক বিখ্যাতবিদ্যামন্দিরটি ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া কিসুবিতেরোমান ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত এক মস্ত কলেজ আছে।পর্যটকগণ অতি অল্প সময়ের ভিতরেই অল্প ভাড়ায় মোটরেকরিয়া ওই স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

“বিয়ান ফলস” নামক সুদৃশ্য জলপ্রপাতটি ইউগান্ডারপ্রধান সৌন্দর্য। এটি স্বচক্ষে না দেখিলে পর্যটকের কাছেইউগান্ডা ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জলপ্রপাতের নিম্নে পর্বতগাত্রে অসম সাহসিক প্রখ্যাত ভূপর্যটক স্পিকের স্মৃতিতর্পণ স্বরূপ এক প্রস্তরফলক খোদিত আছে। ভৌগোলিকের কাছে স্পিকের নাম সত্যই চিরস্মরণীয়। যে সমস্ত ভূপর্যটকগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জাঞ্জিবারের ভিতর দিয়া নীল নদের উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইয়া অসীমসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন স্পিক তাহাদের মধ্যেঅন্যতম। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

রাইডার হ্যাগার্ডের দেশে

রাইডার হ্যাগার্ডের রোমান্সগুলির ঘটনাস্থল ছিল প্রধানতউত্তর ট্রান্সভাল। উত্তর ট্রান্সভাল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেএকটি প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও অসম্ভবঘটনা ঘটতে পারে। এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমনমনোরম, ইহার অতীত ইতিহাসও তেমনই কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর ট্রান্সভালের জলহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।আফ্রিকার নানা অঞ্চল থেকে লোকে আসে এখানে হাওয়া বদলাতে। খুব বড় বড় প্রান্তর, মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান ও কফি ক্ষেত্র। বন-জঙ্গল এদেশে তেমন নেই, কেবলআছে ছোট বড় শৈলমালা ও পাহাড়ি নদী।

অনেক রক্তপাত হয়ে গিয়েছে উত্তর ট্রান্সভালেরঅধিকার নিয়ে। পূর্বে এ দেশ ছিল জেনারেল পাইট জুবার্টেরপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতান্ত্রিক ট্রান্সভাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।জেনারেল জুবার্ট ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসেনেটালের শাসনকর্তা সার

জর্জ কলিকে মাজুবার যুদ্ধে হারিয়ে দেন। প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ এতেই শেষ হয়এবং চার বছর পরে বিজয়ী সেনাপতি পাইট জুবার্টের নামে পিটার্সবুর্গ শহরের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই শহর যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে অনেকআগে আদিম অধিবাসীদের একটা বড় গ্রাম ছিল, গ্রামের চারিপাশে বড় বড় বাওবাব গাছের তলায় ওদের উৎসবেরদিনে নাচ হত, ওরা জায়গাটার নাম দিয়েছিল 'পালাকোয়ান'অর্থাৎ বিশ্রামের স্থান। এই বাওবাব গাছগুলি এখনোপিটার্সবুর্গ শহরের একটা বড় পার্কের মধ্যে দেখা যায়।

আদিম অধিবাসীদের দেওয়া এই নামেরও একটাইতিহাস আছে।

তখন উত্তর পশ্চিম জুলুল্যান্ডের রাজা ছিল চাকা। যদি কখনো জুলুল্যান্ডের বর্বর রাজাদের কোনো ইতিহাস লেখাহয় তবে এই নৃশংস রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তদের নাম তাতেকৃষ্ণতম কালির অক্ষরে লিখিত হবে। সুটো জাতি আবারএই রাজার হাতে সকলের চেয়ে বেশি উৎপীড়িত হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ড্রাকেন্স্বার্গ পর্বতের বিরাট প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তারা পালিয়ে এল এখানকার উর্বর সমতলভূমিতে।

বেশ নিরিবিলি জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ি নদী অদূরে বয়েযাচ্ছে—বেশি বনজঙ্গলও নেই, ভালো চাষবাস হবে, পশুচারণ ভূমিও যথেষ্ট—এই সব দেখে ওরা জায়গাটারনাম দিলে 'পালাকোয়ান্'-এতদিন পরে এখানে এসে ওরা বিশ্রামের অবকাশ পেলে।

কিন্তু হায় ! বেশিদিন নিরুপদ্রবে বিশ্রাম ভোগ করা সুটোজাতির অদৃষ্টে বিধাতা লেখেননি।

১৮৩৫ সালে এল 'ভুর ট্রেকারস'-এর দল। এদেরগায়ের চামড়া সাদা, চোখ নীল, হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, বুদ্ধিসুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম। নতুনতর যুদ্ধের কৌশল তারা জানে —সুটো জাতির এত সাধের বিশ্রামের স্থানে ওরাকোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো।

অবশ্য সুটোরা এত নিরীহ নয় যে ভালো মানুষেরমতো শ্বেতকায় 'ভুর ট্রেকারস'দের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল।যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত হয়েছিল এ নিয়ে।

কিন্তু এই 'ভুর ট্রেকারস'রা অদ্ভুত লোক ছিল সব দিকদিয়ে। দেশের যেসব ছেলে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিদেশেগিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, উপনিবেশ স্থাপন করে, তাদেরকাঠামো থাকে বড় শক্ত ধাতুতে গড়া।

তারা দেশে অন্ন পায়নি বলে বিদেশে এসেছিলকৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে। এসে তারা করলে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।লরেন্স হাউসমানের কথায় “out of the lives you cost away settlements were born.”—সুটোজাতি ক্রমশ হটেযেতে লাগলো। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দলেদলে ডাচ কৃষকেরা এসে একটা বড় জনপদের প্রতিষ্ঠাকরলে। এরা যেমন সাহসী ছিল, তেমনি পরিশ্রমী ছিল।এদিকে আবার সবাই ছিল গোঁড়া খ্রিস্টান। কোনো বিপদকেতারা বিপদ বলে গ্রাহ্য করত না, অসীম ছিল এদের ধৈর্য, তেমনি অসাধারণ ছিল এদের কর্মশক্তি।

অরেঞ্জ নদীর তীরবর্তী সমস্ত অনাবিষ্কৃত ও জনহীন ভূমিদেখতে দেখতে জনপদে পরিণত হল—এর নাম হল অরেঞ্জফ্রি স্টেট।

কিন্তু এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে 'ভুর ট্রেকারস'দেরমূল্য দিতে হয়েছিল বড় বেশি। যত লোক প্রথমে অরেঞ্জ ফ্রিস্টেটে ও উত্তর ট্রান্সভালে বসতি স্থাপন করে, তার সিকি মারা পড়ে ম্যালেরিয়া ও 'স্লিপিং সিকনেস'-এ—আর সিকিপ্রাণ দেয় হিংস্র বন্যজন্তু ও হিংস্রতর জুলুদের আক্রমণে।কিন্তু তারা ক্রমশ এগিয়ে যেতে যেতে অরেঞ্জ নদীর তীরেগিয়ে পৌঁছালো। তখন সমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে মাত্রপঞ্চাশটা কৃষিক্ষেত্র ছিল কিনা সন্দেহ। ক্রমে জমির দামচড়তে লাগলো—গ্রাম হয়ে পড়লো শহর।

এই সময় আর এক উৎপাত আরম্ভ হল।

যে সব ছোটখাটো ফার্ম কিংবা গ্রাম উত্তর ট্রান্সভালেরসীমান্ত দেশে অবস্থিত, সেখানে অসভ্য বাগাতী জাতিমরুভূমির দিকে এসে মহা অত্যাচার শুরু করলে। খুন, জখম, গৃহদাহ, নারীহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট তখন সবে গড়ে উঠেচে। সেখানকারগভর্নমেন্ট এমন শক্তিশালী নয় যে এইসব দূরবর্তী জনপদকেউপযুক্ত সাহায্য করতে পারে। কিছুদিন একা একা যুদ্ধকরবার পরে তারা ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ছেড়ে পালিয়েএসে আশ্রয় নিলে পাইটার্সবুর্গ শহরের আশেপাশে। কারণসমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের মধ্যে এখানেই লোকের বসতিবেশ ঘন, পুলিশ আছে, মিলিশিয়া সৈন্যদল আছে, বাগাতীজাতির সাধ্য নেই যে এদিকে ঘেঁষে।

এইভাবে পাইটার্সবুর্গ শহরের পত্তন শুরু হল। আগেছিল ডাচ কৃষকদের একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তা ক্রমে আকার ও আয়তনে বিরাট হয়ে উঠতে লাগলো। ১৮৬৩ সালে আবারগ্রামও ছিল না, একটি মাত্র ফার্ম ছিল 'স্টার্কলুপ' বলে—ট্রান্সভাল গভর্নমেন্ট এই ফার্ম কিনে নিয়ে এখানে একটি ক্ষুদ্রগ্রাম স্থাপন করেন। গ্রামটির নামও ছিল 'স্টার্কলুপ'।

এখন সেই 'স্টার্কলুপ' গ্রাম হয়েছে বিশাল পাইটার্সবুর্গ শহর।

কত দেশ থেকে কত লোক এসে শহরের হোটেল পরিপূর্ণ করে রাখে। বেশিরভাগ দর্শক বিখ্যাত ক্রুগারন্যাশানাল পার্ক দেখতে যাবার পথেএই শহরে দু'একদিন থেকে বিশ্রাম করে যায়। পাইটার্সবুর্গ থেকে ক্রুগার ন্যাশানাল পার্কে সহজে পৌঁছানো যায় এবং সে পর্যন্তভালো মোটরের রাস্তা আছে।

পাইটার্সবুর্গ শহরে রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য মোট ৪০ মাইল। এখানে বড় একটি এরোড্রাম সম্প্রতি স্থাপিত হয়েচে কেপ কায়রো বিমানপথের সুবিধার জন্যে। শহরের বাইরে প্রান্তর ও বনে বিভিন্ন ঋতুতে নানারকম রঙিন বন্য পুষ্প ফোটে, মরুভূমি শহর থেকে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে, সেখানেসিংহ বিচরণ করে !

পাইটার্সবুর্গ থেকে ট্রান্সভালের মনোরম অঞ্চলগুলিতেযাওয়া অত্যন্ত সহজ। এখানকার রাস্তাগুলি দ্রুতগামীমোটরগাড়ির চলাচলের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে তৈরিকরা হয়েচে। সর্বত্র পেট্রল কিনতে পাওয়া যায় পথের ধারে, গাড়ি সারাই করবার কারখানা যন্ত্রপাতির দোকানও মাঝেমাঝে আছে। এমন সুন্দর মোটরের রাস্তা ইউরোপ ছাড়া অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ—আমেরিকাতেও বেশিনেই, এমন কি মার্কিন যুক্তরাজ্যেও সর্বত্র নেই।

এখান থেকে হাটেনসবুর্গ আটত্রিশ মাইল। হাটেনসবুর্গ পর্বতবেষ্টিত একটি অতি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত।এটিকে গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না—কিন্তু এরপ্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভ্রমণকারীর দল এখানে একবার নাএসে পারে না। ক্রুগার ন্যাশানাল পার্ক থেকে ফিরবারপথে সকলেই হাটেনসবুর্গ হয়ে যায়।

হাটেনসবুর্গের চারিধারের পাহাড়ে অনেক ছোট বড়ঝরনা থাকায় কতকগুলি পার্বত্য নদীস্রোতের সৃষ্টি করেচে। বনচ্ছায়ায় তীরস্থ শিলাখণ্ডে বসে এই সব নদীতে ট্রাউট মাছ ধরা জীবনের একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এইসব পাহাড় ও উপত্যকা, এই বনভূমি অমর হয়ে থাকবে রাইডার হ্যাগার্ডও জন বুকানের লেখার মধ্যে দিয়ে।

কি অপরূপ শোভা বনবাসীর এই ক্ষুদ্র উপত্যকায় ওতার আশেপাশে। জনপদ থেকে দূরে এখানে সত্যিকারট্রপিক্যাল অরণ্য বর্ধিত হয়েচে। অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমেট্রপিক্যাল অরণ্য দেখতে হলে হাটেনসবুর্গ উপত্যকায়আসতে হবে। আগাথা আর একটি মনোরম স্থান, হাটেনসবুর্গ থেকে ২৮ মাইল দূরে।

এই পথে বনের মধ্যে যথেষ্ট শিকার মেলে—প্রধানতহরিণ ও চিতাবাঘ। ক্কচিৎ সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে পরিশ্রমের সঙ্গে সন্ধান করলে অজগর সাপও মেলে।

দু মাইল গিয়েই পথ দু হাজার ফুট নেমে গেল। এখানেপাহাড় কেটে বিখ্যাত গিরিবর্ত্ম মন্দুবা ক্লুফ তৈরি করাহয়েচে। পথে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, প্রাচীনকাল ধরে ইন্দ্রজাল বিদ্যার জন্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ।আগে এরা বৃক্ষদেবতার সামনে নরবলি দিত—এখন অবশ্যঅনেক সভ্য হয়েছে, অনেকে পাইটার্সবুর্গ থেকে স্কুলেকলেজে পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রজাল বিদ্যার চর্চা এখনো এদেরমধ্যে প্রচলিত আছে। অন্যান্য গ্রামের জুলু ও কাফরিঅধিবাসীরা এদের ভয় করে চলে।

তবে ট্রান্সভালের অধিকাংশ অঞ্চলে বন ছিল না, আজকাল গবর্নমেন্টের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে সেখানে বৃক্ষরোপণ করা হচ্চে। এক জাতীয় বাবলা গাছ বেশির ভাগরোপণ করা হয়েচে তার মূল্যবান আঠার জন্যে। এর আঠা উৎকৃষ্ট আরবি গঁদের সমান দামে বাজারে বিক্রি হয়। নিকটেই জগদ্বিখ্যাত র‍্যান্ড স্বর্ণখনি—খনিতে ভূগর্ভে খুঁটিবসাবার জন্যেও প্রচুর পরিমাণে বাবলা গাছের গুঁড়ি চালানযায়।

উচ্চ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নত প্রণালীতে পিচ, পিয়ার, কলা, আম, পেঁপে ও আনারসের চাষ করা হয় ও জাহাজেরঠাণ্ডা কেবিনে পুরে পৃথিবীর সর্বত্র চালান দেওয়া হয়। ফলের ব্যবসা উত্তর ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের একটি অতি লাভজনক ব্যবসা।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার রাইডার হ্যাগার্ড তাঁর যৌবনে ট্রান্সভালের রাজকর্মচারী ছিলেন, এই অঞ্চলের পর্বত ও অরণ্য তাঁর কয়েকখানি রোমান্সের আবেষ্টনী রচনায় সাহায্যকরেচে। ডুইভেল্‌স ক্লুপের অনতিদূরে দুটি শৈলশৃঙ্গের তিনিনাম দিয়েছিলেন 'রানী শেবার যুগল স্তন'—বহুদূর থেকেটুরিস্টদের দল এই শৈলশৃঙ্গ দুটি দেখতে এসে ঘন বনেরছায়ায় তাঁবু পেতে ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করতে করতেশক্তিশালী লেখকের সৃষ্ট 'রাজা সলোমনের রত্নাগার'-এরস্বপ্ন দেখে।

কুইন মেরী

গত ২৬শে মে, সাউদামটন বন্দর থেকে 'কুইন মেরী' জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন 'বড় জাহাজ তৈরি'প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেচে।

আটলান্টিক সাগরে পাঁচটি জাতি খেয়াপারের জাহাজকেকত বড় করতে পারে তাই নিয়ে অনেকদিন থেকেই প্রতিযোগিতা করচে। এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েচেব্যাপার যে সবাই ভাবচে জাহাজ আরো কত বড় করা যেতেপারে। বৃহৎকায় জাহাজ তৈরির একটা কী সীমা নেই ?

এইসব বড় জাহাজ তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয়হয়। কিন্তু তার তুলনায় আয় হয় কেমন ?

আটলান্টিক খেয়া জাহাজের এ প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ করে জার্মানি।

ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে জার্মানি মহাযুদ্ধের পূর্বে যেবাণিজ্য-জাহাজ ছিল তা হারিয়ে ফেললে। ১৯৩০ সালেতারা 'ব্রিমেন' আর 'ইউরোপ' বলে দুখানা বড় জাহাজসমুদ্রে ভাসালো। আটলান্টিকে তখন এত বড় জাহাজ আরছিল না। বাইশ বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেন এক্ষেত্রে সকলের বড়ছিল 'মোরিটানিয়া' জাহাজের দরুন। বাইশ বছরের মধ্যেএর চেয়ে বড় জাহাজ আর তৈরি হয়নি।

তারপর ইটালি কতগুলি বড় জাহাজ তৈরি করলে, তাদের মধ্যে 'রেক্স' আর 'কাস্ট ডি সাভোরিয়া' প্রসিদ্ধ।ফ্রান্স 'নরম্যান্ডি' নামে খুব বড় একখানা জাহাজ তৈরি করে এদের হারিয়ে দিলে। 'নরম্যান্ডি'র সমান বড় জাহাজ তখনপর্যন্ত কেউ আটলান্টিকেনামায়নি।

এর উত্তর দিলে গ্রেট ব্রিটেন 'কুইন মেরী' জাহাজে।কিন্তু এরই মধ্যে শোনা যাচ্চে মার্কিন যুক্তরাজ্যে দুখানাঅতিকায় জাহাজ তৈরি হচ্চে, এরা 'কুইন মেরী'র চেয়েতত বড় হবে, 'মোরিটানিয়া'র চেয়ে 'কুইন মেরী' যত বড়।

এই প্রতিযোগিতার শেষ কোথায় ?এইসব ভাসমানহোটেল তৈরি করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তার সুদপোষাবে কিনা এ সন্দেহ এখন অনেকের মনে উঠেচে।

'নরম্যান্ডি'জাহাজ তৈরি করে ফ্রান্স যে লাভবান হয়নি, একথা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারো অবিদিত নেই।

নরম্যান্ডিজাহাজ তৈরি যারা করেছিল, তাদের দুবারজাহাজখানা মেরামত করতেই অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে যায়।বিলাসের উপকরণ বাদ পড়েনি 'নরম্যান্ডি' জাহাজে।

বেগও ছিল খুব বেশি, সে হিসেবে দেখতে গেলে এরচেয়ে বেগবান জাহাজ জার্মানির 'ব্রিমেন'ও নয়।

কিন্তু প্রধান দোষ এর দাঁড়ালো এই যে, এর বিরাট ইঞ্জিনচলবার সময় জাহাজখানা এত কাঁপে যে বাধ্য হয়ে দুবছরপরে ইঞ্জিন খুলে ফেলে আবার নতুন করে অন্য ইঞ্জিনবসাতে হল। তাতেও দোষ একেবারে গেল না—বছরখানেক পরে ইঞ্জিন আবার খুলতে হয়, আবার বসাতে হয়।গবর্নমেন্ট অর্থসাহায্য না করলে জাহাজ কোম্পানিকে এতেবিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হত।

জার্মান ও ইটালিয়ান গভর্নমেন্টও নিজেদের দেশেরজাহাজ কোম্পানিকে এর জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞ লোকে বলেন, আটলান্টিক খেয়া জাহাজ বেশি বড় করে আর কোনো লাভ নেই। এর একটা সীমা আছে, এবং বর্তমানে সে সীমার কাছাকাছি এসে পৌঁছেচেসবাই। চাহিদার চেয়ে জিনিসের যদি বাজারে সরবরাহবেশি হয়, তবে ব্যবসায়ীকে লোকসান সহ্য করতে তোহবেই। এক্ষেত্রেও ক্রমে সেই দশা হয়ে উঠেচে।

ইঞ্জিনের গতি বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতাই এখন প্রধান।ঘণ্টায় দু'তিন মাইল গতিবৃদ্ধি করার ব্যাপার সোজা নয়, কারণ এইসব বড় বড় জাহাজ এক-একটি বড় বড়হোটেলের সমান। এদের জোরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিশেষত আটলান্টিকের ঢেউ কাটিয়ে—তার আবারপ্রতিযোগিতা! সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েআটলান্টিকের 'ব্লু রিবন' লাভ করা বড় সোজা নয়।

আর দু-তিন ঘণ্টা আগে যাত্রীকে সাউদামটন থেকেনিউইয়র্কে পৌঁছে দেবার জন্যে একরাশ টাকা ব্যয় করেই বাকি হবে ?অর্থনীতির দিক থেকে শুধু নয়, বিজ্ঞানের দিকথেকেও দেখলে এতে আর সুবিধে নেই। কারণ বিমানপথেযখন যে কোনো বর্তমান বেগবান জাহাজের এক-তৃতীয়াংশসময়ে ওই দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, তখন জাহাজে আরঅনর্থক অর্থব্যয় কেন ?

বাইরের লোককে এরূপ স্বীকার করতেই হবে যে, প্রশ্নেরউত্তর দিতে তারাই সকলের চেয়ে বেশি সক্ষম, যাদের অর্থব্যয়ে 'কুইন মেরী' তৈরি হয়েচে। যারা নিজেদের ওশেয়ার হোল্ডারদের টাকা এত বড় বিশাল জাহাজ তৈরিকরতে লাগিয়েচে বা যারা বিশ্বাস করে যে এই জাহাজ চালিয়ে লাভ হবে বা তাদের অর্থব্যয় সার্থক হবে, তারাই জানে কেন এ জাহাজ তৈরি হল। তাদের জিজ্ঞাসা করাওহয়েছিল একথা।

তারা বলে, অন্য জাহাজের কথা আমরা জানিনে, কিন্তু 'কুইন মেরী' সে ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে উৎপন্নজাহাজ নয়। আমরা হুজুগে পড়ে কোনো কাজ করিনে।১৮৪০ সালে আমাদের তৎকালীন মালিক স্যামুয়েল কুনার্ড 'ব্রিটানিয়া' জাহাজ তৈরি করান, তখন এত বড় জাহাজকেউ কখনো চোখেও দেখেনি—তখন তো আর এমন প্রতিযোগিতা ছিল না, কিন্তু তখনো তো আমরা বড় জাহাজতৈরি করতে পয়সা খরচ করেছিলাম।

আমাদের উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক যুগের বৈজ্ঞানিকআবিষ্কার ও জাহাজ নির্মাণের আধুনিক রীতির সুযোগ গ্রহণকরে লন্ডন-নিউইয়র্কগামী যাত্রীদের আরাম ও সুবিধার দিকেলক্ষ রেখে আমরা আমাদের ফার্মের সেই প্রাচীন ধারাঅক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করব।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে জাহাজের আকার ওনির্মাণপ্রণালীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হাইড্রো-মেকানিক্স বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সমুদ্রগামী জাহাজের ইঞ্জিন তৈরির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের লাইনের জাহাজ ছিলসেকালে ধরনের, অথচ জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালিতেআমাদের চেয়ে অনেক ভালো জাহাজ তৈরি হয়েচে গত১৫/১৬ বছরের মধ্যে। সুতরাং আমাদের নীরব ও নিষ্ক্রিয়থাকা আর সম্ভবপর নয়।

মিতব্যয়িতার দিক থেকে দেখতে গেলেও এতেআমাদের সুবিধা আছে। সাউদামটন-নিউইয়র্ক লাইনেআমাদের তিনখানা জাহাজ চলছিল, আমরা সেখানে দুখানা জাহাজে কাজ চালাতে যাই। তিনখানা জাহাজের যাত্রীদুখানা জাহাজে ধরাতে গেলে জাহাজের আয়তন বৃদ্ধিকরতে হবে এবং সেই সঙ্গে তার গতিও বৃদ্ধি করতে হবে।এইসব দিকে চোখ রেখেই 'কুইন মেরী' তৈরি হয়েচে।

দুখানা জাহাজ চালাতে আমাদের খরচ অনেক কমপড়বে, অথচ যাত্রীদেরও সময়ের সাশ্রয় হবে। বড় জাহাজেবেশি জায়গা থাকার দরুন যাত্রীদের আরামেরসুব্যবস্থাগুলিও ভালোভাবে করতে পারা যাবে। অবশ্যএতে যদি আমরা আটলান্টিক খেয়া জাহাজেরপ্রতিযোগিতার 'ব্লু রিবন' লাভ করি, তাতে বিজ্ঞাপনের দিক থেকে খুব সুবিধা হবে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য তা নয়।'ব্লু রিবন' পাওয়ার জন্যে এত পয়সা খরচ করবে, আমাদের ফার্ম এত কাঁচা নয়।

কুনার্ড-হোয়াইট স্টার লাইন কোম্পানির চেয়ারম্যানস্যার পার্সি বেটস তাঁর উপরোক্ত যুক্তির সঙ্গে আর একটা কথা জুড়ে দিয়েচেন। যেটা অনেকটা হেঁয়ালির মতো শোনাবে। তিনি বলেন 'কুইন মেরী'র মতো আর একখানাজাহাজ তাঁরা যখন তৈরি করে জলে ভাসাবেন, তখন দেখাযাবে ব্যবসানীতি ও অর্থব্যয়ের দিক থেকে তাঁদের জাহাজদুখানা সকলের চেয়ে ছোট ও সকলের চেয়ে কম বেগবান।সেই ব্যবসানীতির দ্বারা নির্দিষ্ট যে সীমা তা ছাড়িয়ে গেলেইঅমিতব্যয়িতার বিপদজনক পথে আমাদের পা দিতে হবে।

স্যার পার্সি বেটস তাঁর নিজের উক্তির সম্বন্ধে নিশ্চয়ইকোনো সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু এটাও ভেবে দেখবার বিষয় যে এ পর্যন্ত 'কুইন মেরী'র জুড়ি যে জাহাজখানা তৈরি হবার কথা, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনোউৎসাহ দেখা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাকে ভালো করে বুঝতে হলে আটলান্টিকখেয়া জাহাজগুলি কি কাজ করে এবং গত একশত বৎসরেরমধ্যে সেই কার্য সুসম্পন্ন করবার ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি সাধিতহয়েচে, তা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা কর্তব্য।

বর্তমানে ইংলন্ডের সাউদামটন বন্দর থেকে দুপুরবেলায়ে জাহাজ নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হয়, সোলেবট নামকসমুদ্রের ছোট খাড়ি তাকে খুব আস্তে আস্তে যেতে হয় প্রায়কুড়ি মাইল পর্যন্ত।

নিড্‌ল্‌স্‌-এর বাতিঘর ছাড়িয়ে আইল-অফ-ওয়াইটকেবাঁদিকে রেখে অল্প দূরেই খোলা জায়গা ইংলিশ-চ্যানেল।এই চ্যানেলের পথে চেরবুর্গ পর্যন্ত ৬০ মাইল সে খুব জোরেযেতে পারে। চেরবুর্গ বন্দরে ইউরোপের অন্য দেশেরযাত্রীদের জন্য দু-তিন ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে হয়।

সাউদামটন ছেড়ে যাওয়ার আট ঘণ্টা পরে জাহাজ প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ আটলান্টিকের পথে যাত্রা শুরু করে—চেরবুর্গ থেকে সামব্রোজ চ্যানেল পর্যন্ত প্রায় ৩১৬০মাইল সমুদ্রপথ।

আমব্রোজ চ্যানেল থেকে নিউইয়র্ক ডক্‌ পর্যন্ত জল-পুলিশ ও কোয়ারান্টাইন আইনের গোলযোগের জন্যেআরো ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। সুতরাং আটলান্টিকে পাড়ি দেবার সময়ের সঙ্গে আরো প্রায় তেরো ঘণ্টা যোগ করলে সমস্ত জলযাত্রার প্রকৃত আন্দাজ পাওয়া যাবে।

১৯২৯ সালে 'মোরিটানিয়া' জাহাজ প্রথমবার যখনআটলান্টিকের খেয়া দেয় তখন ২৬ নট প্রতি ঘণ্টায় গিয়ে মোট ৪ দিন ২১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে সাউদামটন থেকেনিউইয়র্কে পৌঁছায়। সেখানে অন্তত ছ'দিন থাকার পরে তবেপ্রত্যাবর্তন শুরু করে। যাত্রী ও মাল নামাতে এবং জাহাজের কলকব্জা পরিষ্কার করতে যায় তিন দিন। আর তিন দিনলাগে ইঞ্জিনের তেল পুরতে, নতুন যাত্রী ওঠাতে। সুতরাং দুখানা জাহাজ এ লাইনে যদি চালানো যায়, তাতে কুলায়না।কারণ ১৫ দিন অন্তর জাহাজখানার নিউইয়র্ক যাওয়াঅসম্ভব।

পূর্বে এই লাইনে চারখানা জাহাজের কমে কাজ চলতনা। ১৮৪০ সালে 'ব্রিটানিয়া' জলে ভাসানো হয়। তখনকারআমলে 'ব্রিটানিয়া' যত বড়ই হোক, এখনকার তুলনায় কিছুইনয়। আর তিনখানা এই আকৃতির জাহাজ ক্লাইড নদীরজাহাজ নির্মাণের কারখানায় কুনার্ড কোম্পানির জন্যে তৈরি হয়। তখনকার জাহাজ চলত প্যাডেল দ্বারা। স্ক্রু' তখনোআবিষ্কার হয়নি।

'ব্রিটানিয়া' এই পথ ১৪ দিন আট ঘণ্টায় অতিক্রম করেএবং তখন এই সময়ই অল্প বলে গণ্য হয়। এর চেয়ে কমসময়ের মধ্যে আর কোনো জাহাজ সাউদামটন থেকে নিউইয়র্ক যেতে পারত না।

বিগত নব্বই বছরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণরীতির এতউন্নতি হয়েচে যে, সে ১৪ দিনের জায়গায় এখন জাহাজ ৪দিনে যায়। এদিকে ইংলিশ চ্যানেল ও চেরবুর্গ, ওদিকেআমব্রোজ চ্যানেল ও নিউইয়র্কের ডকে জাহাজ বাধ্য হয়েযতখানি বিলম্ব করে, সেটুকু বাদ দিয়ে আটলান্টিক সমুদ্রপথে জাহাজ যায় মাত্র ১২০ ঘণ্টা।

হোয়াইট স্টার ও কুনার্ড লাইনের প্রত্যেক জাহাজেরপ্রধান কর্মচারীকে উপদেশ দেওয়া আছে যে ১২০ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র পার হতে হবে। প্রত্যেক জাহাজের কাপ্তেন এইসময়ের মধ্যে পাড়ি দিতে চেষ্টা করেন, তবে ঝড়বৃষ্টি বাঅন্য দৈব দুর্বিপাকের কথা স্বতন্ত্র। সমুদ্রবক্ষে ঘন কুয়াশাহলে জাহাজ অনেক সময় পুরোদমে চালানো যায় না। যে সময় বরফের তাপ উত্তর সমুদ্র থেকে দক্ষিণ দিকে যায় তখনো খুব সাবধানে জাহাজ চালাতে হয়।

হোয়াইট স্টার লাইনের 'ম্যাজেস্টিক', 'ওলিম্পিক' ও 'হোসারিক'—এই তিনখানা জাহাজ ও কুনার্ড কোম্পানির তিনখানি জাহাজ 'একুইটানিয়া', 'মোরিটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া এই পথে বরাবর চলে আসছিল—কুনার্ডকোম্পানি হঠাৎ মতলব করলে যে দুখানা জাহাজে কাজচালাবে। একুইটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া জাহাজ দুখানাওরা কিছুকাল চালিয়ে দেখলে যে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। জাহাজ দুখানা খুব বেশি দ্রুতগামী নয়, নিউইয়র্ক বন্দরে সবসুদ্ধ দুদিন মাত্র জাহাজ বিলম্ব করত,এতে অর্ধেক যাত্রী উঠতে পারত না। উত্তমরূপে পরিষ্কার না করার জন্যে জাহাজের কলকব্জাও খারাপ হতে লাগলো।

‘একুইটানিয়া’ জাহাজের সঙ্গে চালাবার জন্যে তাই ‘কুইন মেরী’ জাহাজের সৃষ্টি। ‘মোরিটানিয়া’ ও ‘বেরেনজারিয়া’ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাদের লোহালক্কড় অন্য জাহাজ তৈরি করতে লাগানো হবে।

একদল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আছে, তারা জাহাজে যতক্ষণথাকে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য সমুদ্রকে ভুলে থাকা—কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ের দুলুনি তারা সহ্য করতে পারে না। এদলবাদ দিয়েও সমুদ্রযাত্রায় সর্বসাধারণের পক্ষে প্রথম ও প্রধানযে অসুবিধা, সে হল এর নিষ্ক্রিয়তা।

যত বড় হোটেলই হোক এবং তাতে যত আরামইথাকুক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যদি হাত-পা কোলে করেহোটেলের মধ্যেই বসে থাকতে হয় তা কারো ভালো লাগে না। ‘কুইন মেরী’ জাহাজের মধ্যে আটকে থাকা মানেশহরের মধ্যে কোনো একটা হোটেলে চুপচাপ বসে থাকা।

তবুও কোম্পানি যথেষ্ট ব্যবস্থা করেচে যাত্রীদেরঅসুবিধা দূর করতে। জাহাজে দুটো গির্জা আছে, একটারোমান ক্যাথলিক আর একটা অ্যাংলিকান। ইহুদিদের জন্যেপৃথক ভজনালয় আছে। দুটো সাঁতার দেবার পুকুর, পুকুরে বেড়াবার জন্যে ডেক, ফুলের বাগান, বড় বড় ব্রিটিশচিত্রকরের আঁকা ছবি ওদের ডাইনিং হলের দেওয়ালে। কিন্তু এসব বাইরের ব্যাপার, আসল জিনিসটা হচ্চে এই যে, ‘কুইন মেরী’ তার নির্দিষ্ট কাজ করে উঠতে পারবে কি পারবেনা।যদি তা সম্ভব হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে ‘কুইন মেরী’রচেয়েও বড় জাহাজ তৈরি হবে কি না ?

কুনার্ড কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা বলেন, তা হওয়া অসম্ভবনয়। আটলান্টিকের পথে যত বড় জাহাজই হোক ভাসানো যেতে পারে। সুয়েজের পথে তা চলে না, কারণ ও পথে জাহাজের আয়তন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সুয়েজ খালেরপ্রস্থের সংকীর্ণতার দ্বারা।

আন্দ্রোথ

মি. ডেনিস পামার কিছুদিন পূর্বে কাগজে সেবিলিসদ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন।সেবিলিস ভারত মহাসমুদ্রে অবস্থিত। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে তিনি আর একটি দ্বীপ খুঁজে বার করেচেন, যাসেবিলিস দ্বীপপুঞ্জের মতো সুন্দর অথচ ভারতের খুব কাছেবলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া ততব্যয়সাধ্য নয়।

মি. পামারের লিখিত বর্ণনা থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম।

“আমি মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে জনৈকদেশী জাহাজের মালিকের আলাপ হয়। লোকটি আমায়লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কথা প্রথম বলে। এর আগে আমিলাক্ষাদ্বীপের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু সেখানকার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

এই লোকটির মুখে শুনলাম লাক্ষাদ্বীপ ভারত মহাসাগরের যে অংশে অবস্থিত, তার নিখুঁত চার্ট এখনো তৈরি হয়নি, বড় বড় জাহাজ তো সে পথ দিয়ে চলেই না, পালতোলা জাহাজ ভিন্ন স্টীমচালিত জাহাজ ক্বচিৎ দেখাযায়। গবর্নমেন্ট কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোনো ইউরোপীয়সেখানে যায়নি। তবুও আমি তার কথায় ততটা বিশ্বাসস্থাপন করতে না পেরে নিজেও একটু অনুসন্ধান করলাম।অনুসন্ধানে জানা গেল আরব সমুদ্রের বাইরের অংশে মালাবার উপকূল থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সবসুদ্ধ চোদ্দটি ছোটবড় দ্বীপ নিয়ে এইদ্বীপপুঞ্জ গঠিত। আন্দ্রোথ দ্বীপ এর মধ্যে বৃহত্তম, দৈর্ঘ্যেতিন মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল।

এর অধিবাসী প্রায়ই মপলা, ধর্মে মুসলমান। তারামালায়ালম ভাষাভাষী।

লাক্ষাদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গুজবও শোনা গেল।একটা গুজব এই যে, একদল বড় বড় ইঁদুর ওই সব দ্বীপেঅত্যন্ত উৎপাত করেচে—সমস্ত খাদ্যশস্য তারা নিঃশেষকরে ফেলেচে। আর একটা গুজব, সেখানকার মেয়েরারাজনৈতিক ও সামাজিক শাসনের ভার নিজেদের হাতেনেওয়ার দরুন সেখানে নারীরাজ্য স্থাপিত হয়েচে। নিজের চোখে জায়গাটা দেখে আসবার অত্যন্ত কৌতূহল হল।

কালিকট বন্দর থেকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের জাহাজছাড়লো। এগুলিকে জাহাজ না বলে বড় নৌকো বল্লে এর ঠিকমতো বর্ণনা করা হবে। এ দেশের মিস্ত্রির হাতে তৈরিহলেও সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পক্ষে এগুলো বেশ উপযোগী।

পূর্ণিমা তিথি সেদিন। পশ্চিমঘাট পর্বতের মাথায় পূর্ণচন্দ্রউঠেছে, আরব সমুদ্রের জলে জ্যোৎস্না পড়ে কোথাওচিকচিক করচে, কোথাও জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায় মিশেঅস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমাদের নৌকাখানা আরব সমুদ্রের বড়বড় ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে ডুবুডুবু অবস্থায় খাড়া পশ্চিমমুখে চললো। হাওয়া পেয়ে পাল ফুলে উঠলো।

সে রাত্রের শোভা অবর্ণনীয়—ঘুম হওয়ার কোনোসম্ভাবনা না থাকায় স্থির করলাম রাতটা ডেকে বসে জেগেইকাটিয়ে দেব ! ঘুমের নানা বাধা, একে তো ডেকের ওপর লোকে লোকারণ্য, পা রাখবার স্থান নাই, তার ওপর তক্তার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ছারপোকার আড্ডা, শুয়ে পড়লে রক্ষানেই, সমস্ত গায়ে ছেঁকে ধরবে।

পরদিন সকাল থেকে বাতাস একদম পড়ে গেল। নৌকো আর চলে না। মপলা মাঝিরা দাঁড় বাইতে আরম্ভ করলে। নৌকোর পালগুলো ছেঁড়া কাপড়ের মতো ঝুলতে লাগলো।তিনদিন তিনরাত্রি একভাবে কাটলো। আরব সমুদ্রের বক্ষপুকুরের জলের মতো নিথর, নিস্পন্দ। সমুদ্রের কোনো দিকে অন্য কোনো জাহাজ বা নৌকো দেখলাম না।

তিনদিন পরে সকাল থেকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একজন মাল্লা মাস্তুলের ওপর উঠে দেখতে লাগলো ডাঙা দেখা যায় কিনা। এরকম দেখা অত্যন্ত দরকার, কারণ এইবিশাল সমুদ্রে লাক্ষাদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ দশফুট উঁচুএকটা শৈবালস্তূপের মতো দূর থেকে প্রতীয়মান হয়—খুবসাবধান না থাকলে অনেক সময় গন্তব্য স্থান ছাড়িয়েকয়েকশো মাইল বিপথে যাওয়ার পর বোঝা যায় যে পথ ভুল হয়েছে। এজন্যে প্রথম যে ডাঙা দেখতে পাবে তাকেকিছু বকশিশ দেওয়ার নিয়ম আছে।

চতুর্থ দিন প্রাতে মাস্তুলের মাথা থেকে একজন মাল্লাচিৎকার করে বলে—ওই জমি দেখা গিয়েছে।

দু ঘণ্টা বাদে আন্দ্রোথ বন্দরে আমরা নোঙর ফেলি।

কয়েক মিনিট মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি চেয়ে রইলাম।

আন্দ্রোথের তীরভূমি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে বেঁকে গিয়েচে। বহুদূর পর্যন্ত বালি, তারপর দীর্ঘ নারিকেল গাছের বন।বন্দরের জল নীল ও স্বচ্ছ। নীচের তৃণাবলী ও প্রবলপুঞ্জ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নারিকেল বনের মধ্যে সারি সারি কুটির। এই সমস্তঘরের মধ্যে থেকে লোকজন আমাদের নৌকো দেখে ছুটেএল। আমায় দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। শুনলাম তিনবছর পূর্বে একজন সাহেব তাদের দ্বীপে নেমেছিল, তিনবছরের মধ্যে আর কোনো ইউরোপীয় এদিকে আসেনি।

আন্দ্রোথের শাসনকর্তা আমাকে অভ্যর্থনা করতে এলেন। তিনি মুসলমান, বহু বৎসর ধরে তারা এই দ্বীপশাসন করছেন। তাঁর আদেশে অধিবাসীরা আমায় একখানানারিকেল পাতায় ছাওয়া কুটিরে নিয়ে গেল। সেখানেমেয়েরা আমার জন্য পাকাকলার কাঁদি, ডাব, মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিলে।

একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একটা মসজিদ ও গোরস্থান।ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সমাধিস্থানে খেলা করে বেড়াচ্চে।সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, দেখে মনে হয়, তাদের কোনো দুঃখনেই। আসল কথা তাদের মনে কোনো উচ্চাশা নেই।উচ্চাশার অপূর্ণতা থেকে মনে আসে যে অশান্তি ওঅস্থিরতা, তাও নেই। সকলেই বেশ অবস্থাবান।তরুণ-তরুণীরা সকলেই দেখতে ভালো—মেয়েদের রং খুবফর্সা, ঠোঁটগুলো লাল টুকটুকে, চলনভঙ্গি সুন্দর। তারা পর্দানশীন নয়, আমার ঘরের সামনের পথ দিয়ে তারাহাসিমুখে সমুদ্রতীরের নারিকেল পুঞ্জের দিকে যাচ্ছেআসচে, দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে ফিরচে, অনেকেরইপরনে রেশমী শাড়ি, সকলেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

অল্পক্ষণ পরে আমি আবিষ্কার করলাম পরিচ্ছদ হিসেবেএখানকার অধিবাসীরা তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীরপরনে দীর্ঘ রঙিন আলখেল্লা বা আচকান, এক শ্রেণী একধরনের মোটা কোট পরে, আর এক শ্রেণীর লোকে প্রায়উলঙ্গ থাকে।

লাক্ষাদ্বীপের অভিজাত সম্প্রদায়কে বলে ‘বেগয়া’। এরাএখানকার জমিদার ও শাসক সম্প্রদায়। বেগয়াদের মেয়ে বাপুরুষ রেশম বস্ত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। এরা প্রধানতমুসলমান। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রধানত হিন্দু। এরা পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের অধীনস্থ প্রজা, এদেরও অবস্থা বেশ ভালোই। তবে স্ত্রী স্বাধীনতা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

সর্বনিম্ন সম্প্রদায়কে বলে ‘মালচেরি’, এরা অত্যন্তদরিদ্র, চাকুরি করে এদের দিন চলে। লাক্ষাদ্বীপের সমাজে এদের স্থান এত নীচু যে ছাতা মাথায় দিয়ে পথে চলবারঅধিকার নেই এদের। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান আছে।

দ্বীপের সর্বত্র খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তা, সকলেই পেটভরেখেতে পায়। কোনো অসুখবিসুখ না থাকায় দেহের গঠনসকলেরই ভালো।

প্রধান শাসনকর্তাকে বলে 'আমীম'।

দেশ শাসনের কাজে সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত একটিমন্ত্রীসভা আমীমকে সাহায্য করে। আমীম ও মন্ত্রীসভারসদস্যগণ একদিন আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেবল্লেন—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন ?

আমি বল্লাম—যতদিন ভালো লাগে।

তাঁরা বল্লেন—আমাদের ইচ্ছে, আপনি আমাদের মধ্যে বরাবর থাকুন। আমীম আপনার বাসের জন্যে ভালো ঘরতৈরি করে দেবেন। আপনার ফুলবাগান করবার জন্যে যতখানি জমি দরকার তা আপনাকে দেওয়া হবে। আপনিযদি বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করেদেওয়ার ভার আমরা নিতে পারি।

আমি বল্লাম—আপাতত আমি বিবাহ করে এখানেঘরসংসার পাততে আসিনি। যদি পরে আবশ্যক বিবেচনাকরি, আমীমকে জানাব। আপনাদের সহৃদয় ব্যবহারেরজন্যে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এঁরা কেউ ইংরাজি জানেন না, স্থানীয় স্কুলমাস্টার দোভাষীর কাজ চালাচ্ছিলেন।

এইবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্চি। এখানকার সমস্ত আন্ড্রোথ দ্বীপের মধ্যে আমিইএকমাত্র ইংরাজিনবীশ (লোক), আমি ভূগোল ও জ্যামিতি পড়েচি।

—আপনি হিন্দু না মুসলমান ?

—আমি হিন্দুবংশে জন্মেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমিমুসলমান। পাঁচ বছর আগে মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেন। এখানকার একটি মেয়েকে বিবাহ করেআমি মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করেছি।

—দেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজনকে কি বলবেন ?

—দেশে ফিরবার ইচ্ছা নেই আমার—এখানে আমি বেশআছি। স্কুলে লেখাপড়া শেখাই, অবসর সময়ে সাঁতার দিই।নৌকা বেয়ে বেড়াই, নয়তো সমুদ্রতীরে চুপ করে শুয়ে থাকি। মনে আমার কোনো অশান্তি নেই, টাকার চেষ্টায়হয়রান হয়ে বেড়াইনে।

এই সময় আমার স্নান করবার জল এসে পৌঁছে গেল।স্নান শেষ করে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। স্কুলমাস্টারআমার কাছে বসে তার জীবনের অনেক গল্প করছিল।নিকটেই নাকি একটি দ্বীপ আছে, সেখানকার লোকেরানিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে থেকে এত অলস হয়ে পড়েছে যেচার পাঁচ দিনের মতো ভাত রেঁধে নিয়ে রেখে শুধু শুয়েথাকে আর গল্প করে। সপ্তাহে একদিন মাছ ধরতে বেরোয়, যা পায় তা সাতদিন ধরে খায়, আর ঘর থেকে নড়ে না।

স্কুলমাস্টার সমুদ্রের নানা ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কথাবলছিল। একরকম মাছের গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা আছে, তাদের কাঁটার ঘায়ে যে ক্ষত হয় তা সারে না, প্রায়ই বিষিয়েউঠে মানুষ মারা যায়। একরকম মাছ এত হিংস্র যে জলেনামলেই তারা হাত পা কেটে নেয়। সোর্ডফিস ও হাঙরের উৎপাত খুব, প্রতি বৎসর অনেক ডুবুরি এদের হাতে মারাপড়ে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল থেকে একদল লোক ঝড়েপোতভগ্ন অবস্থায় এই দ্বীপে এসে ওঠে এবং তারাই নাকিএখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা ছিল হিন্দু। পরেআরব ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্পর্কে যাতায়াত শুরু করে।ক্রমে উভয় জাতির সংমিশ্রণে দ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদেরউৎপত্তি।

স্কুলমাস্টারের গল্প শুনতে শুনতে আমি কখন ঘুমিয়েপড়েছি, উঠে দেখি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। জানালাদিয়ে জ্যোৎস্নালোক ঘরের মধ্যে এসে পড়েচে, একপ্রকারসামুদ্রিক পাখি নারিকেলশাখার আড়ালে বসে তার ঘরেনিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করচে।

সত্যই বটে, এই দ্বীপের পরিপার্শ্বের অবস্থা এমন যে এখানে শরীরকে খাটাতে ইচ্ছা করে না, ইচ্ছে হয় দীর্ঘদিনমান শুধু শুয়ে বসে সমুদ্রতীরবর্তী নারিকেল বনচ্ছায়ায়অলস দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। আমার অবস্থা যদি দু'দিনের মধ্যেই এরকম হয়, তবে যারা আজীবন এখানেকাটায় তাদের অলস হওয়া বিচিত্র কি ?

স্কুলমাস্টারকে মনে মনে দোষ দিতে পারলাম নাআত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এখানে থেকে যাওয়ার জন্যে।

দিন যত যায়, তত মনে হয় এ দ্বীপ ছেড়ে প্রাণেরকর্মকোলাহল জীবনে আর ফিরব না। সেবিলিস দ্বীপে অবস্থানকালে যেমন মনে শান্তিলাভ করেছিলাম, আবার তাই ফিরে পেলাম এতদিন পরে। সমগ্র লাক্ষাদ্বীপে আমিই একমাত্র ইউরোপীয়, সুতরাং আমার পূর্বতন জীবনের কর্মব্যস্ততা স্মরণ করিয়ে দেবার লোক এখানে কেউ ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ তাই অতি নিবিড় হয়ে উঠল।

দ্বীপের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমার সহজেই বন্ধুত্বস্থাপিত হল। আমার সকলপ্রকার সুবিধার অসুবিধার দিকেতারা এত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলো যে আমি অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়তাম। এখানকার ধনী জমিদার সম্প্রদায়েরলোক প্রত্যহ আমার খাদ্য প্রেরণ করতেন, তার জন্যে কখনো কিছু দাম নিতেন না। খাদ্যদ্রব্য সাধারণত কচি ডাব, ঝুনো নারিকেল, মুরগি, ডিম, মাছ, অক্টোপাসের দাঁড়া, ছাগলের দুধ।

আমীমের মন্ত্রণাসভার প্রত্যেক সদস্য আমায় পর্যায়ক্রমেতাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন।

মন্ত্রণাসভার প্রধান সদস্য মুসলমান এবং অত্যন্তভদ্রলোক। তাঁর দশ বারো বছরের একটি জ্যেষ্ঠ ছেলে সবসময় আমার সঙ্গে থাকতে ভালোবাসতো। তার বাবা কালিকট থেকে একখানা সাইকেল আনিয়ে দিয়েছেন, সমগ্রলাক্ষাদ্বীপের মধ্যে এই একমাত্র সাইকেল। যখনই আমিছেলেটির ফটো নিতে চেয়েছি তখনই সে তার সাইকেলখানাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যেপীড়াপীড়ি করেচে।

অক্টোপাস শিকার এখানকার নিম্নবর্ণের লোকের একটিপ্রধান ব্যবসা। এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাঙর ও সোর্ডফিশ তো আছেই, তা বাদে হিংস্র অক্টোপাস দাঁড়া দিয়ে জড়িয়ে শিকারিকে অতল জলে নিয়ে ডুবিয়ে মারে।শিকারির যথেষ্ট কৌশল ও সাহসের আবশ্যক হয় এই হিংস্রকুদর্শন জীব শিকার করতে। অক্টোপাসের দাঁড়া স্থানীয়সম্ভ্রান্ত লোকের একটি উপাদেয় খাদ্য। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে অক্টোপাস একরকম কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থ নিজেরশরীর থেকে বার করে ছড়িয়ে দেয় শিকারির চোখে—তাতেঅনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

সমুদ্রে নানাজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশসামুদ্রিক মৎস্য বিষাক্ত, সতর্ক না হয়ে যা-তা মাছ খেলে প্রাণসংশয় হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে সাধারণত হাটবাজারনেই, মালচেরিরা যখন মাছ ধরে আনে দ্বীপের অধিবাসীরা সমুদ্রের তীরে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে এবংসংসারের জন্যে যতটা তাদের দরকার, সেখান থেকে কিনেবাড়ি নিয়ে যায়।

আমার যাবার সময় উপস্থিত হল। আন্দ্রোথ ছেড়ে যেতেসত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। এখান থেকে গিয়ে সভ্যজগতেরসভ্যজীবনে আমার খাপ খাওয়ানো যেন অসম্ভব হয়েপড়বে।

মধ্য-আফ্রিকার বন্যজন্তু

কাপ্তেন পিটম্যান বহুদিন মধ্য-আফ্রিকার ইউগান্ডাপ্রোটেক্টরোটে বন্য জন্তুর রক্ষক ও পরিদর্শক ছিলেন—এই অদ্ভুত পদ আমাদের দেশে নাই, সরকারি বন-বিভাগেরকর্মচারীরা ওই কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন। কিন্তুঅধিকাংশ সভ্য দেশে বিশেষত যেখানে বনভূমি সুবিস্তীর্ণও বন্য জন্তু সুপ্রচুর (যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি) এবং আধুনিক ধরনের বন্দুক ওরাইফেলের সাহায্যে শিকার চলিয়া থাকে—স্থানীয়গবর্নমেন্টকে বাধ্য হইয়া সে সব স্থানে অবাধ প্রাণীহত্যানিবারণ করিবার জন্য লোক রাখিতে হয়; ইহাকে game warden বলে। কাপ্তেন পিটম্যান বহু বৎসর ধরিয়ামধ্য-আফ্রিকার নানা স্থানে game warden-এর কাজকরিয়াছেন। ওখানকার বন্য জন্তু সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাযেমন ঘনিষ্ঠ তেমন বিচিত্র। তিনি সম্প্রতি তাঁহার এই সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণ অত্যন্তকৌতূহলোদ্দীপক, সেখানে আমরা কাপ্তেন পিটম্যানকে শুধুবনরক্ষক কর্মচারী হিসাবে দেখি না, দেখি যে এই সকলবন্যজন্তুর জীবনযাত্রাপ্রণালী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিবারউপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মন তাঁর আছে। কাপ্তেন পিটম্যানেরবিবরণ শুধু শিকারের গল্প নয়, naturalist-এর লিখিতবৈজ্ঞানিক কাহিনী। যে অসীম তৃণভূমির মধ্যে মুক্তআকাশতলে তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটাইয়াছিলেন, যে অরণ্যপ্রকৃতিকে প্রাণ ভরিয়া তিনি ভালোবাসিয়াছেন, প্রকৃতির বুকে লালিত জন্তুজানোয়ারদিগকে ভালোবাসিয়াছেন—ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য ইহাদিগকে ভালো না বাসিলে সম্ভব হইত না।

কুমিরের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইউগান্ডাতে একটিসুবৃহৎ মহিষকে একবার কুমিরে ধরে। মহিষটি গৃহপালিত, ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের কিনারায় জলজ ঘাস খাইয়াবেড়াইতেছিল, এমন সময় কুমিরটি তাহাকে আক্রমণ করে এবং

গলার শিকলের একপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরে, দেহের কোনো অংশ ধরিতে পারে নাই। উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি হয়, নিকটে একদল পশুপালক ছিল, তাহারাশব্দ শুনিতে পাইয়া আসিয়া মহিষের লেজ টানিয়া ধরিয়াটানিতে থাকে, ওদিকে কুমিরও টানিতে থাকে। কিছুক্ষণ টানাটানির পরে মহিষের দলই জয়লাভ করে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে কুমিরটা ধরিবার কিছু পায় নাই, মহিষের অন্তত নাকটা ধরিতে পারিলেও কুমির হারিয়া যাইত না। নদীতে জলপানের সময় একবার একটাবিরাটকায় গণ্ডারের পা কুমির চাপিয়া ধরিয়াছিল—এবংঅনেকক্ষণ টানাটানির পর কুমির গণ্ডারটাকে নদীর মধ্যেহেঁচড়াইয়া লইয়া গিয়া ডুবাইয়া মারে।

কুমিরের সম্বন্ধে পিটম্যান একটা অদ্ভুত মন্তব্যকরিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন কুমিরকে যতভয় করা যায় আসলে তাহাদিগকে অতটা ভয় করিবার কারণ নাই। একথা সত্য যে আফ্রিকায় প্রতি বৎসরে অন্যসব জন্তুতে যত মানুষ মারে, একটা কুমির মারে তাদের সবগুলো জড়াইয়া যত হয় তার চেয়েও বেশি—কিন্তুভাবিয়া দেখিতে হইবে যে আফ্রিকার জলের ধারের গ্রামগুলি জনসঙ্কুল এবং আফ্রিকার জলাশয় মাত্রেই কুমিরের অজস্র ভিড়। সে অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে কুমির যে অতিশয় উগ্র ও হিংস্র প্রকৃতির এমন কথা বলাযায় না।

কিছুকাল পূর্বে গরিলা সম্বন্ধেও সাধারণের ধারণা ভ্রমপূর্ণ ছিল। দুশেলু প্রভৃতি কয়েকজন ভ্রমণকারী ইহাদের বিষয়েযে সকল অতিরঞ্জিত বিবরণ লেখেন, তাহা পড়িয়া ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে গরিলা রাক্ষসের মতো হিংস্র প্রকৃতির, মানুষের গন্ধ পাইলে বুক বাজাইয়া জয়ঢাকের মতো আওয়াজ করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, এক কামড়ে রাইফেলকে আখের পাঁপ বানাইয়া ছাড়িয়া দেয় ইত্যাদি।কিন্তু রাওয়েনরি পর্বতের উচ্চপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন ভ্রমণকারী ও শিকারীদের যাতায়াতের পরে গরিলা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে; দুশেলুবর্ণিত গরিলার সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য অনেক। ইহারা মানুষের আওয়াজ পাইলে ছুটিয়া আসা দূরের কথা, নিবিড়তর বনেরমধ্যে পালাইবার চেষ্টা করে। আকৃতিতে ইহারা দুশেলুরগরিলা অপেক্ষা ছোট। যে নিবিড় বাঁশের বনে গরিলা বাস করে, সেখানে গিয়া অনেক খোঁচাখুঁচি করিয়াও ইহাদের বাহির করা দায়, এইজন্য কিভু পর্বতের দুর্গম অধিত্যকায় উঠিয়াও অনেকেরই গরিলা না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, গরিলারসংখ্যা দিনদিন কমিয়া আসিতেছে—এবং এখন হইতেরক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা অবাধ শিকার বন্ধ নাকরিলে আর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে গরিলাকুল নির্মূল হইয়াযাইবে। এইচ.জি.ওয়েলস কিছুদিন পূর্বে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনেইহা লইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন।

আজকাল বন্য জন্তু শিকার করা অপেক্ষা ক্যামেরারসাহায্যে তাদের ফটো লওয়ার প্রচলন বেশি হইয়াছে। এইকার্যে সাহস ও কৌশল উভয়েরই প্রয়োজন, নতুবাসাফল্যের আশা কম। পিটম্যানও এরূপ বহু ফটোগ্রাফতুলিয়াছেন—তিনি প্রাণীশিকারের পক্ষপাতী নহেন, স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্তুদের ফটোগ্রাফ লওয়ার আমোদ তাঁর কাছে অনেক বেশি।

বন্য সাদা বেজির ধূর্ততা সম্বন্ধে পিটম্যান একটি চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু মুরগি পুষিতেন, মুরগিরঘরের চারিদিক তারের বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেওপ্রায়ই প্রতিরাত্রে কিসে দু'চারটি মুরগির ঘাড় মটকাইয়ারাখিয়া যাইত। অনেক সর্তকতা অবলম্বন করা হইল কিন্তু উৎপাত বরং ক্রমেই বাড়িয়া চলে, কমিবার নামও নাই।অবশেষে পিটম্যান মুরগির খাঁচার পাশে গর্ত খুঁড়িয়া রাত্রে নিজে পাহারা দিতে লাগিলেন। একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছেমাত্র, হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তারের বেড়ারগা ঘেঁষিয়া বেড়ার ওপাশে কি যেন একটা জানোয়ার।উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় যেন একটা বড় বনবিড়ালের মতোদেখাইতেছে—খুব দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট বনবিড়াল।

পরবর্তী ঘটনা পিটম্যানের নিজের কথায় বলি।

"আমি অবাক হয়ে জানোয়ারটার দিকে চেয়ে রইলাম।ব্যাপার কি ?জানোয়ারটা একটা অদ্ভুত কাজ করছিল। সেটাধীরে ধীরে নাচের ভঙ্গিতে লোমগুলো খাড়া করে কখনো লাফিয়ে, কখনো খুঁড়িয়ে তারের সামনে পায়চারি করেবেড়াচ্চে।

কখনো সেটা লাফাচ্চে, কখনো লেজটা জমিতে আছড়াচ্চে, কখনো বা হঠাৎ পিছু হটে যাচ্চে, কখনো বাতারের বেড়া ঘেঁষে এগিয়ে আসছে, এতটুকু থামচে না দমনিচ্চে না—থিয়েটারি নাচের ভঙ্গিতে একবার এদিক একবারওদিক ছুটচে—নানা ভঙ্গি করচে, কিন্তু সবই সেই মুরগির তারের ঘরের তারের বেড়ার সামনেটাতে।

সব জিনিসটা ঘটাচ্চে কিন্তু নিঃশব্দে, এতটুকু শব্দ নেইকোনো দিকে।

একটু পরে এই চাঁদের আলোয় ভূতের নৃত্যটা মুরগিদের চোখে পড়ে গেল। বারে, কি ওটা !দু'চারটি মূর্খ মুরগিনিজেদের খোপ থেকে বার হয়ে লম্বা গলা বাড়িয়েবিস্ময়ের সঙ্গে তারের বেড়ার দিকে এগিয়ে চললো। তবু ভালো দেখা যায় না—ওটা নাচে কি ওখানে ! বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু'একটা মুরগি গলা বার করে দেখতে গেল। আরএকটু হলে জানোয়ারটা মুরগিগুলোর ঘাড় মটকাতো কিন্তুআমি সেই সময় গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গুলি লাগালো না—জানোয়ারটা পালিয়ে গেল।

তারপর মুরগির খাঁচার সামনে ফাঁদ পাতা হল। দু রাতপরে সেটা নাচতে নাচতে এসে ধরা পড়ে গেল। অদ্ভুতকাণ্ড ! জানোয়ারটা আর কিছু নয়, একটা কৃষকায় বুনোবেজি। কে জানত তার পেটে পেটে এত ফন্দি-ফিকির ও বদমাইশি !"

নদী-ভালুক।

বহুকাল ধরিয়া আফ্রিকার শিকারি ও ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে মধ্য আফ্রিকার গভীর বনে এমন সব বিচিত্র রহস্যময় জন্তু আছে, যা মানুষের চোখেসাধারণত খুব কম পড়ে; বিজ্ঞানেও তাদের শ্রেণীবিভাগকরা হয় নাই। নদী-ভালুকও তাদের অন্যতম। পিটম্যান কিন্তুকয়েকবার এই রহস্যময় জানোয়ারের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এবং তাঁর মত এই যে, নদী-ভালুক একশ্রেণীর হায়েনা ছাড়াআর কিছুই নয়।

উদ্যান-রচনায় শিল্পীর হাত

আমাদের দেশে অনেকেরই হয়তো জানা নাই যে ইউরোপ বা আমেরিকায় গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান রচনা করিবার জন্যবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইতে হয়। আমাদের এখানকার মতোযদৃচ্ছা দু'দশটা গোলাপের চারা কি এরিক পাম, হয়তোএকদিকে একটু পালংশাকের ক্ষেত, দুটো পেঁপেগাছপুঁতিলেই বাগান হয় না—উদ্যান রচনায় সত্যকার শিল্পীর প্রয়োজন আছে। Garden designing ওসব দেশে একটাবড় শিল্প যাহা কষ্ট করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, যাহাতেপ্রতিভার প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্যজ্ঞান এবং কৌশলেরওপ্রয়োজন আছ। বিশেষ করিয়া কৌশলের প্রয়োজন এইজন্যযে, অনেক সময় গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান অল্প একটু জমির উপর করিতে হয়। বড়লোকের পল্লীভবনের চারিপাশে তিন-চারিশতবিঘা জুড়িয়া প্রকাণ্ড পার্ক থাকিতে পারে, কিন্তু শহরের উপকণ্ঠেমধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাসস্থানে দশ বারো কাঠা বা তারও কমজমিতে মনোমতো উদ্যান করিতে গেলে হাত দরাজ হইলে চলে না। ওইটুকু জমির উপর গুছাইয়া সবই করিতেহইবে—লতাবিতানও চাই, ভ্রমণের পথও চাই, হয়তোখেলিবার লনও চাই। দু'চারটা বড় বড় ছায়াতরুও বসাইতে হইবে, একটু শাকসবজির ক্ষেতও না হইলে গৃহস্থেরঅসুবিধা। অথচ সব মিলাইয়া এমন করিতে হইবে যাহাতেবাগানখানি সুদৃশ্য হয়, মানুষের মনকে আনন্দ দিতে পারে, কর্মশ্রান্ত দেহকে বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল জমির দর ক্রমেই বাড়িতেছে, শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে বাড়ি তৈয়ারি করিতে গেলে বেশি জমি প্রায়ই পাওয়া যায় না, এইজন্য ভিক্টোরিয়া যুগের উদ্যান রচনার রীতি ক্রমশ পরিত্যক্ত হইতেছে। তখনকারকালে প্রকৃতির হাতে অনেকখানি কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইত, এখন মানুষের অবসর কম, জীবনও অধিকতর অস্থির ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে—এখন প্রকৃতির অপেক্ষায় দশবিশ বৎসর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। জনৈক বিশেষজ্ঞবলেন—"Attuned to this state of things,we demand quicker effect and more varied interest, eventhings—often through force of circumstances,—compressed into a smaller area." অতএব যেসব গাছশীঘ্র বাড়ে, শীঘ্র ফলফুল দেয়, অল্প খরচে বেশি আনন্দ যোগাইতে পারে, সেই সব গাছপালার জ্ঞান থাকা বর্তমানযুগের উদ্যানশিল্পীর একান্ত আবশ্যক।

এ একটা দিক মাত্র। আর একটা বড় কথা এই যে, উদ্যান-শিল্পের ক্রমশ রুচি পরিবর্তন হইতেছে। আগের যুগে ভালো করিয়া মরসুমী ফুল সাজাইতে পারিলে ও নানাজ্যামিতিক আকারের ক্ষেত করিতে পারিলে যথেষ্টসৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্তু আজকালউদ্যানশিল্প স্থাপত্য-শিল্পের কাছ ঘেঁষিয়া চলিতে চাহিতেছে।ইহার থামগুলি ইটালিয়ান ধরনের জাফরির ফাঁকে ওমেজেতে বিছানো টালির আকার চতুষ্কোণ—লতামণ্ডপটিরসমগ্রতার সহিত কি সুন্দর সামঞ্জস্য ! মণ্ডপের দূরপ্রান্তেপাথরের ধ্যানরতা একটি বালিকা-মূর্তি। উহার উল্টাদিকেপাদপীঠের উপর বিখ্যাত ভাস্কর Ruby Levic-এর একটিব্রোঞ্জমূর্তি বসানো আছে। থামের গায়েও জাফরির ফাঁকেপুষ্পিত লতা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছে। ছাদ অনাবৃত,জ্যোৎস্নারাত্রে বা পরিপূর্ণ দিনের আলোয় পায়ের তলারশ্বেত পাথরের টালির উপর আলোছায়ার খেলা বিচিত্র, কী

সুন্দর। উপরে, নীচে ও পাশে বড় বড় সরলরেখার সম্পাতে দৃশ্যের সমগ্রতা একটি মহিমময় রূপ ধারণ করিয়াছে—অথচপথের দুপাশে অনাবশ্যক ও বাড়তি গাছপালা বসাইয়া জবড়জঙ্গ করা হয় নাই।

লতাবিতান রচনার এই রীতি একেবারে নূতন নহে। ব্রেজিল ও মেক্সিকোর অনেক পুরাতন স্পেনীয় বাসভবনে এ পদ্ধতির লতাগৃহ আছে। তবে এই আধুনিক লতাবিতানটির ছাদ অনাবৃত, কিন্তু স্পেনীশ পদ্ধতির মণ্ডপগুলি সব ছাদআঁটাএই যা পার্থক্য।

বাগানে যা-তা খেলো ধরনের মূর্তি কুরুচির পরিচায়কবলিয়া আজকাল গণ্য হয়। পূর্বে এদিকে তত দৃষ্টি দেওয়া হইত না। মূর্তি হইলেই হইল, যারই হাতে গড়া হৌক বা যেধরনের হৌক। আজকাল নামজাদা শিল্পীর হাতের জিনিসছাড়া বাজে মাল ব্যবহৃত হয় না। তাও যেখানে সেখানে যা-তা বসাইলে চলিবে না, যেখানে যে মূর্তিটি বসাইলেভালো দেখায়, পরিপার্শ্বিকের দৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদি অবস্থায় না কুলোয় তবেবরং বিখ্যাত মূর্তিগুলির নকল কেনাও ভালো, তবু আনাড়িশিল্পীর হাতের খেলো মান প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল, গৃহের নিকটস্থ উদ্যানেরসম্বন্ধে সেগুলি খাটে। কিন্তু পার্ক শ্রেণী উদ্যানেররচনাপ্রণালী অন্যরূপ। সেখানে জমির অভাব নাই, তিন-চারিশত বিঘা হইতে হাজার দেড় হাজার বিঘা জমির পার্কও আছে। এগুলি ধনীলোকের বাসভবন-সংলগ্ন, অর্থেরও সে সব ক্ষেত্রে কোনো অপ্রতুলতা নেই। পার্করচনায় প্রধানত পটভূমির সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়। বিশাল ছায়াতরু, নিম্নে ফুলফলের বোঝা, বনভূমি, ঝিল, উচ্চাবচ তৃণক্ষেত্র, সুদৃশ্য প্রাচীন পদ্ধতির সাঁকো, মুক্ত মাঠ, পক্ষীগৃহ, লিলি-পন্ড সবসুদ্ধ মিলাইয়া একটি সুন্দর landscape-এর সৃষ্টি করিতে হইবে। কিভাবে কোন্ গাছ বসাইতে হইবে, গাছের মধ্যে আবার ফাঁক থাকা চাই, সান্ধ্যদিগন্তের রক্তিমাভা ঢাকা না পড়ে, দূরে পাহাড় থাকিলেতাহার সুনীল সীমারেখা গাছের ডালের আড়াল না করে, কোথাও চাই মৃগচারণভূমি, লাইব্রেরি ঘরের বড় ফরাসি bay-window দিয়া যাহাতে অনেকখানি মুক্ত দৃশ্য নজরে আসে। এইসব বুঝিয়া সুঝিয়া, সকল দিকে হুঁশিয়ার হইয়া তবে কাজে নামিতে হইবে। শিল্প-জ্ঞানও চাই, কৌশলীহওয়াও চাই এ ক্ষেত্রে।

ঝিলের উপর পাথরের খিলান সাঁকো। ইহা সেকালের ধরনে তৈরি। ঝিলের দুধারে নানা জলজ পুষ্পের গাছ, গাছপালার ফাঁকে দূরে বাসভবন দেখা যাইতেছে। ঝিলের ঢালুর উপর আইরিশ ফুলের ঝোপ, একসারি বড় বড় ছায়াতরু। বড় বড় উদ্যানে জলাশয় থাকাই চাই। জলের ধারে বড় প্রস্তরমূর্তি উচ্চ পাদপীঠের উপর বসানো থাকে, জলে তাদের ছায়া পড়া চাই, লিলি ও জলজপুষ্পের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সৌন্দর্যের দিক হইতে এদেরমূল্য অনেক। জলাশয় বাদ দিয়া পার্ক রচনা নিতান্তইঅসম্ভব।

ভবিষ্যতে ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত উদ্যানের রচনাভঙ্গি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত পর্বত

ব্রিটিশ গায়েনার ঘন অরণ্যের মধ্যে রোরাইমা পর্বতঅবস্থিত। যদিও এই সকল অরণ্যসঙ্কুল স্থানের অনেক অংশবিভিন্ন ভ্রমণকারীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, রোরাইমাপর্বত সম্বন্ধে বাইরের লোকের জ্ঞান এখনো অল্পই। এখানেঅসভ্য ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ব্রেজিলেরঅন্য অন্য স্থানের বনবাসী ইন্ডিয়ান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এজন্য নৃতত্ত্ব বিদ্যার দিক হইতেও এ দেশ ভ্রমণের মূল্য কমনয়।

সম্প্রতিAmerican Museum of Natural History-রতরফ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রোরাইমা পর্বত ও মালভূমিতে প্রেরিত হন সেখানকার জন্তু ও উদ্ভিদপর্যবেক্ষণ করিতে। বিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ মি. টি. ডি. কার্টার ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রোরাইমা মালভূমির সর্বোচ্চস্থান রোরাইমা পর্বত—আগাগোড়া বেলেপাথরের, খাড়াইঅসাধারণ, যেমন ভীষণ দর্শন তেমনি দুরারোহ। এখানকারজীবজানোয়ার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় নাই বলিয়াই অনেক দিন হইতেজীবতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এই প্রদেশরহস্যময় ছিল। কার্টার সাহেবের দল ফিরিয়া আসিবার পরেযে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেশের অধিবাসীও জন্তুজানোয়ারদের বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানাগিয়াছে।

ব্রিটিশ গায়েনা, ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিল এই তিনদেশের সীমানা যেখানে মিশিয়াছে, রোরাইমা ঠিক সেখানেঅবস্থিত। ভূতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এ পর্বত অতি প্রাচীন, প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্বে বোরাইমা পর্বতের জন্ম হয়, কিন্তু তখন

ইহা পর্বত ছিল না এখনকার মতো। আদিমযুগের বিশাল, অগভীর হ্রদের তলদেশে ভবিষ্যতেররোরাইমা পর্বত ছিল সামান্য শুধু একটি মাটি ও কাদারঢিবির মতো।

ক্রমে বহুকাল চলিয়া গেল। ভূপৃষ্ঠের নানাবিধ পরিবর্তনঘটিল। সেকালের বড় বড় হ্রদ শুকাইয়া গেল। বহুবিস্তৃতপলিমাটির সঙ্গে বালি মিশিয়া রৌদ্রের তাপে সবটা জমাট বাঁধিয়া শক্ত সর পড়িয়া পাথরের আকার ধারণ করিল।পরবর্তী কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে গলিত প্রস্তরের স্রোতউহার উপর পড়িয়া কঠিন স্তরের সৃষ্টি করিল—বর্তমানে বুঝিবার কোনোই উপায় নাই যে কোথা হইতে বা কিভাবে এই লাভাস্রোত আসিয়াছিল।

কালক্রমে নানা প্রাকৃতিক উৎপাতে এই শক্ত স্তরেরচারিদিক খসিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝখানেখানিকটা অংশ নৈবেদ্যের মধ্যে আলোচালের চূড়ার মতোঅবশিষ্ট রহিল—ইহাই বর্তমানকালের রোরাইমা পর্বত।

বহুকাল হইতে রোরাইমা পর্বতের শিখরদেশে উঠিবার চেষ্টা চলিতেছে, এদেশের উদ্ভিদ ও জন্তু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলে অনেকেই বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে—তথাপি কেহই বিশেষ কিছুজানিতে পারেনাই এতকাল পর্যন্ত। সর্বোচ্চ শিখরে কেহ কেহ ইতিপূর্বেআরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং তাহারা সকলেই দু-এক ঘণ্টা উপরে কটাইয়া তখননামিয়া পড়ে।

এইজন্য ইহাদের বিবরণ পাঠে কোনো বৈজ্ঞানিককৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না।

রোরাইমা অঞ্চলের প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে যতটুকুইহার পূর্বেজানা গিয়াছে তাহাতে এই কৌতূহল বাড়িয়াছে বই কমে নাই। অনুসন্ধিৎসু পর্যটকেরা সামান্য কিছু নমুনা সঙ্গে করিয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের জিনিস।কার্টার সাহেব ও তাঁর দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরো বেশিনমুনা সংগ্রহ করা এবং রোরাইমার প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহেরএকটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা।

ইঁহাদের পূর্বে যাঁরা রোরাইমার পর্বতে আরোহণ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে Sir Robert H. Schomburgk-এর নাম বিখ্যাত। ইনি ১৮৩৫-৩৯ সালে এ অঞ্চলে আসিয়া কার্যশুরু করেন। কিছুকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া সমস্ত জায়গাটার সীমানা নির্ধারিত করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে Everard F. Im Thurn জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিবার সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরে উঠিতেসমর্থ হন নাই।

মি. কার্টার ও তাঁহার দল দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। আমাজন নদী বাহিয়া মানাওস পর্যন্ত ও তথা হইতে ব্রাঞ্চো ও বোয়া ভিস্টা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সুরুমু নদীতেপড়েন। স্টিমার ইহার বেশি অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাংএকটা বড় নৌকাতে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া দলটি সুরুমু ওকাটঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছায়। এখান হইতে নদীপথঅতীব দুর্গম, নদী ক্রমশ উপরের দিকে উঠিয়াছে, ইন্ডিয়ানমাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া গুণ টানিতে টানিতে ভীষণস্রোত ঠেলিয়া নৌকা উপরে উঠাইতে শুরু করিল।

লিসাও পৌঁছিয়া ইহারা বিলম্ব করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রেজিল গবর্নমেন্ট আর একটি দল এ-অঞ্চলের ইন্ডিয়ান জাতিসমূহের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে দিলেন, Gen. Candido Marian da Silva Rondon-এরঅধীনে। ইঁহাকে এখানকার ইন্ডিয়ানরা অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ইঁহার আসিবার নাম শুনিয়া বহুস্থান হইতে তাহারালিমাওতে জড় হইতেছিল, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সব ধরনের ইন্ডিয়ান। অনেক চেষ্টা করিয়াও মি. কার্টার কুলি জোগাড়করিতে পারিলেন না, General Rondon-কে না দেখিয়ানড়িতে রাজী নয়।

কয়েকদিন বৃথা চেষ্টা করিবার পর ইঁহাদের দলের অন্যতম বৈজ্ঞানিক মি. টেট অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে দুই দিনের পথ গিয়া General Rondon-এর তাঁবুতে উপস্থিতহইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে উভয় দলের উদ্দেশ্য প্রায়যখন একই, তখন দল দুটি মিলিয়া একত্রে রওনা হইলেসকল দিকেই সুবিধা ঘটিবে।

General Rondon সানন্দে সম্মতি দিলেন, Sao Marcos হইতে এই দুই দল এক হইয়া রওনা হইল। সঙ্গে প্রায় তিন শত ইন্ডিয়ান স্ত্রী-পুরুষ, অনেক ইন্ডিয়ান স্ত্রীলোকপিঠের দিকের থলিতে ছোট ছেলে ঝুলাইয়া চলিতেছিল।

এতগুলি লোক লইয়া রাস্তা চলা সহজ নহে, তার উপরযখন এত দুর্গম, কাজেই পনেরো দিনের স্থলে এক মাস সময় লাগিয়া গেল।

General Rondon-এর ইচ্ছানুসারে দলটি কিছুদূরউঠিয়া তাঁবু ফেলিল। কিছুকাল পূর্বে জনৈক জার্মান পণ্ডিত নূতন শ্রেণীর উদ্ভিদের সন্ধানে আসিয়া তাঁবু ফেলিয়াছেন, তাঁহার নামে স্থানের নামকরণ হইল Phillip camp (৫২০০ফুট)। এখানে কয়েক শ্রেণীর অদৃষ্টপূর্ব পক্ষী ও উদ্ভিদেরসন্ধান পাওয়া গেল, যাহা রোরাইমা পর্বত ভিন্ন অন্য কোথাও মেলে না। ইন্ডিয়ানরা বাঁশের চোঙের সাহায্যে তীর ছুঁড়িয়া অনেক পক্ষী সংগ্রহ করিল।

এখান হইতে শিখরে আরোহণ করার উদ্যোগ চলিল।পথ অতীব দুর্গম ও বিপজ্জনক, সারা পথটি ধরিয়া বাঁদিকেগভীর খাদ—অনেক সময় আরোহণ পথটির একেবারে ধারে—কখনো বা ২৫ ফুট ৩০ ফুট দূরে। দাবানলের প্রকোপএখানেই সর্বাপেক্ষা বেশি, বৃহৎ বনস্পতিদের একটিও অক্ষত অবস্থায় নাই। নিম্নে জলপ্রপাতগুলির ধারা কুয়াশায় অদৃশ্য হইয়াছে, গাছপালাও চোখে পড়ে না।

শিখরে উঠিতে পুরা একদিন লাগিল। টেবিলের মতোসমতলভূমিতে তাঁবু ফেলা হইল। চারিধারের সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব, নিস্তব্ধতাও তেমনি অসাধারণ। মি. কার্টার লিখিয়াছেন, 'আমার মনে হইল প্রকৃতির এই গুপ্তলীলাভূমিতে আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, এখানকারঅদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল, নিজেকে তুচ্ছ কীটানুকীট বলিয়া বুঝিলাম।'

এখান হইতে কুকেলাম পর্বত পর্যন্ত একটা প্রস্তর সেতুরমতো আছে, তার দু'ধারের সমতলভূমি উপর হইতে সমুদ্রের মতো দেখায়। সমগ্র অঞ্চলটাই অদৃষ্টপূর্ব শ্রেণীর পাখি ও উদ্ভিদের আবাসস্থান। যদিও Lost World-এউল্লিখিত অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারদিগেরসহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল। তবু ইঁহারা যে সকলজন্তু ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা রোরাইমাঅঞ্চলের বাহিরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পাহাড়ি ফাটলে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত ব্যাং থাকে, যাহার গায়ে হাত দেওয়াওবিপজ্জনক, সে ব্যাং ইঁহারা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।সিন্দুরবর্ণ নক্ষত্রাকৃতি এক ধরনের অতি সুন্দর ফুল পাহাড়েরসর্বত্র ফুটিয়াছিল। আইসক্রিম খাওয়ার চামচের মতোঝাড়বিশিষ্ট নূতন ধরনের ফার্ন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শ্রেণীরমক্ষিকাভুক গাছ, একপ্রকার বড় বড় বৃশ্চিক, মাকড়সা, গুবরেপোকা প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীব ও উদ্ভিদ জগতেরবিশেষত্ব। কয়েকদিন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া এগুলির নমুনাইঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এক ধরনের পাখি রোরাইমার পর্বতশিখরে পাওয়া যায়, যার ডাক ঠিক ঘণ্টাধ্বনির মতো—কামার দোকানে নেহাই-এর উপর হাতুড়ির ঘা মারিলেই যেমন শব্দ হয় ঠিকতেমনি ঠং ঠং—ক্লিং ক্লাং। সন্ধ্যাকালে ছাড়া এ পাখির ডাকঅন্য সময়ে বড় একটা শোনা যায় না, নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যেতখন এ অদ্ভুত রব এমন রহস্যময় মনে হয়।

রাত্রে তাঁবুতে আলো জ্বলিলে কোথা হইতে বড় বড় অদ্ভুতদর্শন পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আলোর উপরেঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু দিনে ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

প্রথমে আধ শুকনো ঘাসের জমি বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ অঞ্চলের পানীয় জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন, ঘাসেরজমি ছাড়াইয়া জলাভূমি ও চূড়াকৃত ছোটখাটো অসংখ্যপাহাড়। তালগাছের সারির মধ্যে পাহাড়ি নদী ঝির ঝিরকরিয়া বহিতেছে, কখনো বা ইন্ডিয়ান গ্রামের তালপাতায়ছাওয়া কুটির। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল, জমি স্যাঁতসেতে, দীর্ঘ দীর্ঘ সাভানা ঘাসে গাছের গুঁড়ি পর্যন্ত অনেকটা ঢাকা।

অরণ্যভূমি উত্তীর্ণ হইয়াই Serra Pacarima পর্বতশ্রেণী; ব্রেজিল ও ভেনেজুয়েলা রাজ্যদ্বয়ের সীমানা নির্দেশকরিতেছে। উত্তর দিক ঢালু অত্যন্ত দুর্গম, ইহার শিখরে উঠিতে সারাদিন কাটিয়া গেল। এখান হইতে চতুর্দিকেরপ্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর, দক্ষিণে বহুদূর নীল কুকেলাস পর্বতমালা, নিম্নে সবুজ তৃণাবৃত পাহাড়ি ঢালুর পাদদেশে মিয়াং নদী, মাঝে মাঝে ঘন বন ও ধূসর রং-এর বড় বড় প্রস্তরখণ্ড। সান্ধ্য কুয়াশাচ্ছন্ন রোরাইমা পর্বতচূড়া চল্লিশমাইল দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চারদিনে পাহাড়ের অপর দিকে নামিয়া আমরা নৌকায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম।রোরাইমা পর্বত কী ভীষণদর্শন ও অদ্ভুত মনে হইতেছিল।পাশাপাশি একটি সুবৃহৎ কুয়াশাবৃত চূড়া, একটি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফুট ও অপরটি ৮৬০০ ফুট উচ্চ, দুটিরই মাথা সমতল, ঠিক যেন দুখানি বিরাটকায় পাথরের টেবিল।নির্জন অরণ্যে কোন্ দৈত্যগণ তাহার উপরে লেখাপড়াকরে ! নানাস্থানে চকচকে রূপার সুতা ঝুলিতেছে, সেগুলি পাহাড়ি ঝরনা, তাহাদের মধ্যে একটি মিয়াং নদীরউৎপত্তিস্থল মিয়াং জলপ্রপাত।

বৈকালে দলটি রোরাইমার পাদদেশে পৌঁছিল।

পাদদেশের তাঁবু হইতে তিন হাজার ফুট খাড়াই উঠিলেতবে খানিকটা ছাদের মতো সমতল স্থান পাওয়া যায়, সেখান হইতে উপরে উঠিবার পথ আরো দুর্গম, এই অংশটুকু নিউইয়র্কের সর্বোচ্চ অট্টালিকা ওলওয়ার্থ বিল্ডিং-এরওদ্বিগুণ উচ্চ। খাড়াই এমন ভয়ানক উচ্চ যে দেখিলে মাথাঘুরিয়া যায়। এই রোরাইমা পর্বত ও এই অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত বনভূমিকে অবলম্বন করিয়া ঔপন্যাসিক কোনান ডয়েলতাঁহার Lost World উপন্যাস লিখিয়াছেন। কারণ দক্ষিণআমেরিকার মধ্যে যদি কোথাও সেকালের অধুনালুপ্তঅতিকায় জন্তুদের আজও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়, তবে সেএখানেই। যাহা কিছু অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা, নির্বিবাদেতাহা এ অঞ্চলের ঘাড়ে চাপানো যাইতে পারে।

একটা ব্যাপারে ইঁহাদের বড়ই নিরাশ হইতে হইল। Im Thurn যে বিশাল অরণ্যের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, সেবন দাবানলে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রোরাইমার অধিত্যকার সে অপূর্ব আরণ্যশোভার কিছুই আর অবশিষ্টনাই। বছর দুই পূর্বে একবার এ অঞ্চলে ভয়ানক অনাবৃষ্টিহয়। বনের গাছপালা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়, সেই সময় দাবানল আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বনানীকে ধ্বংস করিয়া ফেলে—এখন যে দিকে চোখ পড়ে, সে দিকেই দগ্ধ গাছেরগুঁড়ি দাঁড়াইয়া আছে।

দাবানলের উৎপাত নানাভাবে হইয়া থাকে। ইন্ডিয়ানরা পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আগুন জ্বালাইয়া বন পোড়ায়, অনেক সময় বনে আগুন দিয়া সাপ মারে। এক গ্রাম হইতেঅন্য গ্রামে যাইবার ঘাসের ঝোপে আগুন দিয়া নিজেদের আগমন বার্তা জানাইয়া দেয়। এই সব আগুন হইতেইসাধারণত বনব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনুকূলবায়ু বহিলে তো কথাই নাই।

তাঁবুতে নানা জাতীয় ইন্ডিয়ান থাকায় তাহাদের আচারব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাসের তুলনামূলক চর্চা করার যথেষ্ট সুবিধাইহাদের ঘটিয়াছিল। রোরাইমা পর্বতের আশেপাশে আর্কুনা ইন্ডিয়ানদের বাস—ইহারা দেখিতে বেঁটে হইলেও খুব বুদ্ধিমান ও কৌতুকপ্রিয়। ইহারা নানারকম বন্য পশুপক্ষীর ডাকের নকল করিতে সুপটু—শুধু পশুপক্ষীর ডাক নয়, ইহারা যে কোনো শব্দ একবার শুনিলে তাহার নকল করিতে পারে। টাইপরাইটারের টিকটিক শব্দ তাঁবুতেবারকয়েক শুনিয়াই নকল করিয়া ফেলিল।

ইহারা ধনুর্বাণ ছুঁড়িতে বিলক্ষণ পটু। বাঁশের লম্বা চোঙের মধ্যে ফুঁ দিয়া ইহারা একরকম তীর ছোঁড়ে (blowpipe darts)—সেগুলি প্রায়ই তালের কাঠে তৈরিএবং লম্বায় বারো ইঞ্চির বেশি নয়—কিন্তু আগায় বিষমাখানো থাকে বলিয়া একবার গায়ে বিঁধিয়া গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাঁশের চোঙগুলি আটফুটের বেশিও লম্বাহইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন নাই। জঙ্গলে উৎপন্নদ্রব্যাদির বদলে ইহারা কাপড় লয়। রং-এর মধ্যে লালরংটাই ইহাদের খুব প্রিয়, কোমরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়াইয়া রাখা এদেশের পুরুষদের একটা শৌখিনতা।খাটাইয়া লইবার পরে ইহাদের বেতন মুদ্রায় দিতে হয় না, মুদ্রার পরিবর্তে সুতা, সুঁচ, আয়না, বড়শী, লবণ প্রভৃতিদিলে চলে।

রোরাইমা পর্বতের শিখরদেশ বারোমাস কুয়াশাবৃতথাকে, শীতও বেশি, এজন্য সেখানে বেশিদিন তাঁবু খাটাইয়াবাস করা মোটেই আরামের নয়। মি. কার্টার যতদিন ছিলেন, নির্মল মেঘশূন্য আকাশ একদিনও পান নাই। দিনের মধ্যেঅধিকাংশ সময়েই মেঘে ও কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা অস্পষ্ট—ক্যামেরার সাহায্যে ফটো লওয়া একপ্রকার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিখরদেশে প্রায়ই বড় গাছপালা নাই, বেলে পাথরের স্তরের ধারে ধারে একপ্রকার ছোট ছোটলাল রং-এর চারাগাছ ও দু-দশটা শীর্ণকায় বৃক্ষ সেখানকারএকমাত্র উদ্ভিদ। এই অনুর্বর পাথরের রাজ্যে যদিও জীবজন্তুর আহার্য অতীব দুষ্প্রাপ্য, তবু মি. কার্টার সেখানহইতে ১২০ প্রকার প্রাণী ও ৯০ প্রকার ফার্ন ও গাছপালা ওঅনেক নতুন ধরনের শেওলা ও ছাতা জাতীয় উদ্ভিদেরনমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

প্রস্তরময় শিখরের নানা স্থানে রৌদ্র-বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নানা অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়াছে—সাপ, ছাতা, ড্রাগন—আবছায়া কুয়াশায় কি রহস্যময়ই যে দেখায় ! এইঅজ্ঞাতপূর্ব জীবজন্তু সমাকুল কুয়াশাবৃত বিশালদর্শন পর্বতমনে ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে—মনে হয় রোরাইমা শুধুনির্জীব প্রস্তরস্তূপ নয়, সে জীবন্ত, তার ব্যক্তিত্ব আছে, সে সব দেখিতেছে, সব বুঝিতেছে—সাধে কি বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতকে পিতা রোরাইমার ক্রুদ্ধ তর্জন কল্পনা করিয়া ভয়েকাঁপে ?

উত্তর কানাডায় রেডিয়াম খনি আবিষ্কার

রেডিয়াম বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবানখনিজদ্রব্য। উত্তর কানাডায় হঠাৎ রেডিয়াম খনি আবিষ্কৃতহওয়ায় সভ্য জগতে কিরূপ হই-চই পড়ে গিয়েচে আমরাতার বিশেষ কোনো খবর রাখি না। কি অদ্ভুত ওঅপ্রত্যাশিত ভাবে এই খনি আবিষ্কৃত হল সে কাহিনীঅত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর কানাডার তুষারাবৃত পার্বত্যভূমি ও বিরাটসমতলক্ষেত্র নানা ধাতুর ভাণ্ডার। Kootenay, Klondike, Porcupine প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত খনির কথা ছেড়েদিলেও ছোট বড় নানা ধরনের খনিতে এই দেশ পরিপূর্ণ।উত্তর কানাডার খনিজ সম্পদ সত্যই অতুলনীয়। এর সবটা এখনো অনাবিষ্কৃত—হাডসন ও শিস নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে এমন সব স্থান আছে যেখানে আজও পর্যন্ত কোনো সভ্য মানুষ যায়নি। সে সব জায়গায় আরো কত মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার আছে, কে তার খবর রাখে।

রৌপ্য ওদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় একশতফুট উঁচু তামার পাহাড় চীনদেশের প্রাচীরের মতো দেশেরমাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে—যদিও দৈর্ঘ্যে অত বড় নয়, মাত্র ৪০ মাইল—খনির মালিকের পক্ষে তাই বা কম কি ?সোনা, লোহাও প্রচুর পাওয়া যায়।

কিন্তু বর্তমানে উত্তর কানাডার তুষারমরুতে যে সকলএরোপ্লেন অনবরত যাতায়াত আরম্ভ করেছে সভ্যজগৎথেকে ১৪০০ মাইল দূরে—তাঁদের উদ্দেশ্য সোনা বা রুপো খোঁজা নয়, এদের চেয়েও লক্ষ গুণ দামী জিনিসের সন্ধানেএরা বার হয়েছে—সেই মূল্যবান জিনিসটি রেডিয়াম।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য রেডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রেডিয়াম ছাড়া ক্যানসারের আজকাল আরকোনো চিকিৎসা নেই—পৃথিবীর বাজারে এইজন্য রেডিয়ামখুব চড়া দামে খরিদ বিক্রি হয়—আরো বিশেষ করে এর দাম এই জন্য বেশি যে সারা পৃথিবীর বাজারে রেডিয়ামপাওয়া যায় মাত্র পৌনে এক সের। এক আমেরিকাতেইক্যানসার চিকিৎসার জন্য যতগুলি হাসপাতাল আছে, তাতে এর তিনগুণ পরিমাণের রেডিয়াম দরকার—কিন্তু পাওয়া যায় কোথায় ?পৃথিবীর রেডিয়াম ভাণ্ডারের যখন এমনঅবস্থা সেই সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে উত্তরকানাডায় রেডিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েচে—পৃথিবীসুদ্ধ একটা শোরগোল পড়ে গেল।

গিলবার্ট কাইন নামে একজন লোক ২৫ বৎসর পূর্বে এইঅঞ্চলে রৌপ্যখনি খুঁজে বেড়াত, এ দিকের প্রত্যেকপাহাড়-পর্বত তার সুপরিচিত। আরো কতকগুলি ব্যাপার গিলবার্ট কাইনের সুপরিচিত ছিল।

সংক্ষেপে সে ব্যাপারগুলি এই—

উত্তর কানাডাতে যখন সর্বপ্রথম সভ্যমানুষ আসতেআরম্ভ করে, সেই সময় এখানকার বৃদ্ধ রেড ইন্ডিয়ানদেরমুখে তারা প্রবাদ শোনে যে বহুদূর উত্তরে চিরতুষারভূমিরমধ্যে কোথায় একটি নদী আছে, যার তীরে তামা পাওয়াযায়। তাদের কাছে বিশুদ্ধ তামায় গড়া কুড়াল ও অন্যান্যঅস্ত্রশস্ত্র ছিল। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল হার্ন নামে হাডসন বে কোম্পানির একজন কর্মচারী জনৈক বৃদ্ধ রেড ইন্ডিয়ানপথপ্রদর্শককে নিয়ে এই অজ্ঞাত তামার খনির সন্ধানে বাহিরহন।

বহু বিপদ উত্তীর্ণ হবার পরে হার্ন এই নদী বার করেন ওতার নাম রাখেন copper mine; সেই নামেই এখনো সেনদী পরিচিত। উত্তর মেরু প্রদেশে তিনিই প্রথমে পদার্পণকরেন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে—কিন্তু তামার খনির কাজতিনি আরম্ভ করতে পারেন নি—নানা কারণে গবর্নমেন্টেরসঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে, কিছুদিন সেখানে থাকবার পরেতিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার একশো ত্রিশ বছর পরে কানাডা গবর্নমেন্টেরতরফ থেকে একজন কর্মচারী এই অঞ্চল জরীপ করতে প্রেরিত হন—তিনি রিপোর্ট করেন যে মেরু প্রদেশেরপ্রান্তসীমাবতী বিশাল হ্রদটির (Great Bear Lake) চারধারে যত পাহাড় আছে, সবগুলিতেই কোবাল্ট ও তামারচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাতে গবর্নমেন্ট বিশেষ কোনোকর্ণপাত করেন না। মাত্র বছর দশেক আগে চার্লি স্লোয়াননামে আর একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি একাই Great Bear Lake-এর তীরে ধাতুর সন্ধানে গিয়েছিল এবং সে ফিরেএসে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি ঘুরে বেড়াত আর বলত, কিছুটাকা হলেই সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর খনির সন্ধানসবাইকে দিতে পারে ও খনির কাজ আরম্ভ করে দিতেওপারে—কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

এসব অতীত কাহিনীর মধ্যে পড়লো। ইতিমধ্যেআকাশপথে চলাচল সহজ হয়ে গেল। এরোপ্লেনেরঅদ্ভুতউন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং এর আগে উত্তর কানাডার অজ্ঞাত বিশাল তুষারাবৃত অঞ্চলে যাওয়ার যে কষ্ট ছিল—তাও দূরহয়ে গেল। ১৯২৯ সালে গিলবার্ট কাইন এরোপ্লেনে রওনা হয়ে Great Bear Lake-এ পৌঁছান ও Hunter Bay-রধারে তাঁবু খাটিয়ে

কিছুদিন থাকেন। দিন পনেরো পরে চার্লিস্লোয়ান এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাঁরা দুজনে হ্রদেরচারধারে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক তামার খনির সন্ধান পান।কিন্তু তামার সন্ধান পেলে কি হবে, তাঁরা ভেবে দেখলেন এতামা সভ্য জগতের বাজারে গিয়ে পৌঁছানোর কোনোবন্দোবস্ত হবার উপায় নেই—এত খরচ পড়ে যাবে যেতাতে লাভ বিশেষ কিছু থাকবে না। Hunter Bay তামারখনির নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন এডমন্টন ১৪০০ মাইল দূরে, একটন তামা রেলে তুলতে ৪০০ ডলার খরচপড়ে—সব দিক বিবেচনা করে গিলবার্ট কাইন দেখলেন যে Great Bear Lake-এর ধারে তামার যত পাহাড়ই থাকুকনা কেন—ব্যবসা হিসেবে তা একেবারে অচল। ঠিক সেইসময়ে একটা ব্যাপার ঘটল। অদ্ভুত ব্যাপার—মানুষের ভাগ্যেতা সচরাচর ঘটে না।

তখন আগস্ট মাসের শেষ—মেরু প্রদেশের শীত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসচে—দিন ক্রমশ ছোট হয়ে পড়চে। বাতাস অসহ্য হয়ে উঠচে ধীরে ধীরে। শীতকাল আসবার বেশিদেরি নেই বুঝে গিলবার্ট কাইন তাঁবু তুলে ফেলে এরোপ্লেনেসভ্য জগতের দিকে রওনা হলেন।

এরোপ্লেন থেকে সে বছরের মতো শেষবার Great Bear Lake দেখবার জন্য নীচের দিকে চেয়ে গিলবার্টকাইন অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নীচে হ্রদের উভয় তীরেরপর্বতশ্রেণী বিস্তৃত—কিন্তু ওপর থেকে তাদের চেহারাদেখাচ্ছে অদ্ভুত—পর্বতমালার রং নানা ধরনের, এ যেনরঙের হোলিখেলা—সোনালী, হলদে, সবুজ, ফিকেসোনালী—চারধারে রং-এর ছড়াছড়ি। প্রকৃতি লক্ষ বছর ধরে রঙিন হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে যে তার ভাণ্ডারে এইসব মূল্যবান জিনিস সঞ্চিত হয়ে আছে, যে পারো নিয়ে নাও—কিন্তু এতকাল যে বিজ্ঞাপন কারুর নজরে পড়েনি,আজ পড়ল গিলবার্টের নজরে। গিলবার্ট অভিজ্ঞ খনিজতত্ত্ববিদ্, তাঁর বুঝতে দেরি হল না যে এসব রঙেরঅর্থ এই যে শৈলমালা বিবিধ ধাতুর আকর, ধাতুর রেণু সকল বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে oxidised হয়ে ওইসব রঙের সৃষ্টি করেচে !

কিন্তু সে বছর আর সময় ছিল না। পরের বছর মার্চ মাসে গিলবার্ট কাইন আবার ফিরে এলেন এবং পায়ে হেঁটেহ্রদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আকরের সন্ধান করতে লাগলেন।তাঁর সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন—তুষারাবৃত শুভ্র ভূমিতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে ঝকঝককরছিল, অনবরত সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর সাথী অন্ধ (Snow blind) হয়ে গেলেন, তবুও তাঁরা অনুসন্ধানকরা থেকে বিরত না হয়ে অনবরত চলতে লাগলেন। Echo Bay-র তীরে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে তারা দেখলেন নইঞ্চি চওড়া সবুজ ও কালো রঙের একটা ধাতুর পাড় বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে—এ পাথর থেকে ও পাথরে ওঠানামাকরে যেতে যেতে পাড়টা শেষে হ্রদের জলের তলায় ঢুকেঅদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। গিলবার্ট নিজের চোখকে বিশ্বাসকরতে পারলেন না, সেটা যে পিচব্লেন্ড তা বুঝেও তাঁরপুরোপুরি বিশ্বাস করতে সাহস হল না। পিচব্লেন্ড থেকেজগতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু রেডিয়াম পাওয়াযায়—শুধু মূল্যবান নয়, সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্যও বটে।

গিলবার্টের আবিষ্কৃত খনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তমরেডিয়াম ভাণ্ডার। ন ইঞ্চি চওড়া দুটো পিচব্লেন্ডের পাড়থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম পাওয়া যাচ্চে যার প্রতিগ্রামের দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার থেকে পঁচাশি হাজারডলার। কানাডা গবর্নমেন্টের খনি বিভাগের কর্মচারী হিউস্পেন্স পরীক্ষা করে দেখেচেন যে Great Bear Lake-এর খনির একটন পিচব্লেন্ড থেকে দেড়শত মিলিগ্রাম রেডিয়ামপাওয়া যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত রেডিয়াম ছিলবেলজিয়ামের একচেটে—বেলজিয়াম কঙ্গো ছাড়া আর কোথাও এতদিন রেডিয়াম পাওয়া যেত না, তাইরেডিয়ামের দামও ছিল অত্যন্ত বেশি, উত্তর কানাডায় এইআবিষ্কারের ফলে বোধ হয় রেডিয়ামের দাম কমবে।

শুধু তাই নয়, কানাডা গবর্নমেন্ট এখানে এ অঞ্চলে রেলপথ খুলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন—নিয়মিতভাবে এরোপ্লেন চালাবার জন্যে কোম্পানি গঠিত হচ্চে, কালে এই দুর্গম ভূভাগে মানুষের যাতায়াত সহজ হয়ে উঠবেআশা করা যায়।

হলদে-ডানা-টুনা-মাছ শিকার

কালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে মোটরবোটে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টার পথ দূরে সমুদ্রের মধ্যে টুনা মাছ ঘুরে বেড়ায়। এদেরভ্রমণপথ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত—অনেক সময় টাহিটি, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে টুনা দেখা যায়—টুনা মাছধরা শুধু শৌখিন আমোদনয়, বিশেষ একটি লাভজনকব্যবসাও বটে।

আমেরিকান, পোর্তুগীজ, ইটালিয়ান, জাপানী সবজাতির ধনী জেলেরা কালিফোর্নিয়ার উপকূলে বড় বড় দামীমোটরবোট রেখেছে টুনা মাছ ধরার জন্যে। এইসব মোটরবোটের তোড়জোড় ও আসবাবপত্র যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য এবং শুধু টুনা মাছ

শিকারের উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরি—তিমি মাছ শিকারের জন্য যেমন তিমি ধরা জাহাজ (Whaler), টুনা ধরার জন্য তেমনি এসব বোট (Tuna clipper)।

টুনা শিকারের বিপদ পদে পদে। টুনা খুব বড় ওজোরালো মাছ—বোটের ডেক থেকে অনেক সময়শিকারিকে টেনে নিয়ে জলে ফেলে দেয়—আর একবার ওঅঞ্চলের সমুদ্রে পড়ে গেলে প্রাণ বাঁচানোদায়—মানুষখেকো হাঙ্গর, নিষ্ঠুর করাত মাছ, খুনী তিমিপ্রভৃতিতে উষ্ণ মণ্ডলের মহাসাগর পরিপূর্ণ থাকে—কতবার কত কত হতভাগ্য শিকারি জলে পড়ে রাঙা রঙের ফেনারমধ্যে অতলতলে ডুবে গিয়েছে আর ওঠেনি।

টুনা মাছ যাযাবর জাতীয় এবং বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্রপথেভ্রমণ করে। টুনা মাছের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার এক জাতিইংলন্ডের উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়—এর আরো দুইশ্রেণী আছে—'নীল ডানা' ও Skip jack—এই দুই শ্রেণীর মাছ খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। হলদে-ডানা টুনা অত্যন্ত জোরালো মাছ, ওজনেও প্রায় ৫০০ পাউন্ডের উপর। বঁড়শিতে বিঁধলেও এদের টেনে বোটে তোলা খুবসহজসাধ্য মোটেই নয়—অনেক সময় মোটর-বোটসুদ্ধউল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

টুনা মাছের টোপের জন্যে এক একটা বোটের চৌবাচ্চারমধ্যে দশ বারো হাজার শার্ডিন মাছ জীয়ানো থাকে।উপকূলথেকে দূরে বোট নিয়ে গিয়ে এই সব শার্ডিন চারপাশেরজলে ছড়ানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে টুনা মাছ প্রকাণ্ড হাঁ করেশার্ডিনগুলোকে খেতে আসে। অল্পক্ষণের জন্য একটা বিপুলহলদে রঙের প্রাণীদেহ দৃষ্টিগোচর হয়, নতুন রুপোর টাকারমতো চকচকে উজ্জ্বল তার পেটটা, তার বিপুল হাঁ দেখেমনে হয় বুঝি ত্রিভুবন গ্রাস করে ফেলতে চায়—এই হলবিখ্যাত হলদে-ডানা টুনা। বঁড়শিতে ধরা পড়লে নানাকলাকৌশলে একটু একটু করে তাকে বোটের ওপর ওঠাতে হয়—অনেক সময় মাছের মর্জি ও খেয়াল মতো৫০/৬০মাইল পর্যন্ত তার পেছনে পেছনে বোট নিয়ে ঘুরতে হয়, তবুও তাকে কায়দার মধ্যে ফেলা যায় না। এমনি একগুঁয়েদুর্ধর্ষ প্রকৃতির মাছ টুনা।

টুনা মাছের সঙ্গে সঙ্গে আসে মানুষ-খেকো হাঙ্গর ওমার্লিন জাতীয় করাত-মাছ। করাত মাছের আক্রমণ-পদ্ধতি অভিনব ধরনের, শিকারের সামনে এসে এরা জল থেকেলাফ মেরে শূন্যে ওঠে, তারপর শিকারের ওপর আছড়েপড়ে, পেছন থেকে তীক্ষ্ণধার করাত তার পিঠে বিঁধিয়ে দেয়। হাঙ্গর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, তাদের সামনে একবারপড়লে আর রক্ষা নাই, ক্ষুধার জ্বালায় তারা হিংস্র উন্মত্তহয়ে বেড়ায়। সামনে যা পড়ে তাকেই আক্রমণ করে। টুনাশিকারি জেলে এই মৃত্যুসঙ্কুল সমুদ্রের মাত্র কয়েক ফুটওপরে লোহার জালটিতে পা রেখে মাছের সন্ধানে জলেরদিকে তীর্থের কাকের মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—একটুবোটের দুলুনিতে যদি পা পিছলে যায়—তাহলে নিম্নেনিশ্চিত মৃত্যু।

শুধু বোটের দুলুনির জন্য নয়, অনেক সময় টুনা মাছের গায়ে কলের বর্শা ছুঁড়তে সামান্য দেরি হলে কিংবা ঠিকজায়গায় না বেঁধাতে পারলে, মাছের বিপুল লাফানি-ঝাঁপানিতে জেলেকে বোট থেকে জলে পড়তে হয়—৫০০/৬০০ পাউন্ড ওজনের সুবৃহৎ সামুদ্রিক মাছকে বোটে তোলাসহজ ব্যাপার নয়। এ সকল কার্যে যারা অভ্যস্ত নয়—তারাআধঘণ্টা লোহার জালতির পাটাতনে বর্শা হাতে দাঁড়িয়েথাকবার পরে কিংবা দু'তিনটা মাছ গেঁথে তুলবার পরেএকেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে, তারপর আর সোজাহয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবে না, পা কাঁপতে থাকবে, এ অবস্থায় তার জলে পড়ে যাবার আশঙ্কা খুব বেশি। কিন্তুএকজন পাকা টুনা-শিকারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে দাঁড়িয়েমাছ মারবে, হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাড়া থাকবেপাটাতনের ওপর, ক্লান্তি অনুভব করলেও তাকে আমল দেবেনা।

কি করে ভারের সমতা ঠিক রাখতে হবে, কোন্ অবস্থায়কিভাবে মাছের গায়ের কোন্ অংশে বর্শা বেঁধাতেহবে—এইটাই টুনা শিকারের আসল কথা। অভিজ্ঞ শিকারিরচোখ মাছটার একবার চমক দেখেই সব বুঝে নেবে—আনাড়ি লোক যেখানে ব্যস্তভাবে বর্শা ছুঁড়ে নিজেকে ও বোটটাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে—অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেখানেবর্শা ফেলবেও না যত বড় মাছই হোক না কেন। এইবিচারের ক্ষমতা একদিনে গড়ে উঠে না। ধীরে ধীরেবহুদিনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে জন্মায়।

ব্যাপার যদিও খুব সহজ নয়, তবু অনেক আনাড়ি লোকেটুনা মাছ ধরতে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার ডলারউপার্জন করা টুনা মাছ শিকারির পক্ষে খুব কঠিননয়—অর্থের লোভে চীন ও জাপানের উপকূল থেকে অনেকসময় গরিব জেলেরা ছোট ছোট নৌকায় টুনা ধরতেআসে—এসে কত সময় প্রাণ হারায়। তবুও আসতে ছাড়েনা।

অনেক সময় টুনাকে বঁড়শিতে গেঁথে তুলবার আগেইহিংস্র হাঙ্গরে তার পিঠের কি পেটের খানিকটা অংশ তীক্ষ্ণ দাঁতে কেটে নেয়—রক্তে সমুদ্রের জল লাল হয়ে যায়—মাছটা যন্ত্রণায় ঝটাপটি করতে থাকে—জেলে হুমড়ি খেয়ে জলে পড়ে

যেতে যেতে অতি কষ্টে বেঁচে যায়, ছোটনৌকা উল্টে যাবার উপক্রম করে—সে এক সঙ্কটজনকমুহূর্ত। ওদিকে হাঙ্গরের ঝাঁক ওৎ পেতে আছে মানুষটাএকবার জলে পড়লে হয়। ঠিক সময় মাছটাকে বর্শায় নাবিঁধলে পরমুহূর্তেই সেটা আবার জলে গিয়ে পড়ে। এইঅবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে তুলবার চেষ্টাকরতে হয়—নৌকার লোকে তখন বড় বড় বাঁশের লগি জলে আছড়াতে থাকে ও চিৎকার করতে থাকে—অনেকসময় এতে হাঙ্গরের দল ভয় পেয়ে জলমগ্ন ব্যক্তির কাছে আসতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা চামড়ার ছোট ডোঙা জলে ফেলে দেওয়া হয় তার ওপর চড়ে বসে লোকটাজল থেকে উঠে আসে।

অনেক সময় হাঙ্গরের মুখ থেকে টেনে বার করেটুনা-শিকারিকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিবাস্টিয়ান গুলার্ড খুবনামজাদা জেলে ও অভিজ্ঞ শিকারি, যে একবার টানসামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়—সেই জাহাজেরকাপ্তেন তখনই হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে গুলার্ডের দুই হাত ধরে তাকে টেনে তুলতে যান—তখন একটা ক্ষুধার্ত হাঙ্গর গুলার্ডের একখানা পা ধরেচে—হাঙ্গরটার সঙ্গেরীতিমতো ধস্তাধস্তি করে তবে গুলার্ডকে টেনে তোলা হয়।

জোয়োকিম মেডিনা একজন বিখ্যাত টুনা-শিকারি। সেএকবার বোটের জালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় হঠাৎ জলে পড়ে ও পায়ে ভারী বুট থাকায় তখনি জলে ডুবে যায়। জলে হাঙ্গরের দল গিজগিজ করছিল; সবাই ভাবলে মেডিনাকে আর পাওয়া যাবে না—কিন্তু একটু পরেই সেজলের ওপর ভেসে উঠল—কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার খুবকমই ঘটে।

কালিফোর্নিয়ার উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রে এক ধরনেরবিশালাকার সামুদ্রিক জন্তু প্রায় দেখা যায়—তাদের নাম leopard shark বা বাঘা হাঙ্গর। এদের দৈর্ঘ্য অনেক সময়১০০ ফুটের বেশিও হয়ে থাকে। এরা খুব হিংস্র নয়, টুনামাছের ঝাঁকের কাছে জলের ওপরভেসে এদের প্রায়ই রোদপোয়াতে দেখা যায়—এরা একটু অলস প্রকৃতির কিংবাশরীরের বিশালতার জন্যে বোধ হয় তেমন নড়তে চড়তেপারে না। কিন্তু তবুও এদের উপস্থিতি অন্যদিক থেকেবোটের লোকজনকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে—এদের বিরাটপুচ্ছ আন্দোলনে নৌকার হাল কিংবা স্ক্রু ভেঙে যেতেপারে। Leopard shark-কে তাড়িয়ে দেওয়াও সহজসাধ্যব্যাপার নয়—একবার এমা নামক মোটরবোটের কাপ্তেন একটা Leopard shark-কে কোনো কৌশলেই তাড়িয়ে না দিতে পেরে তার ভাসমান পিঠটার ওপর লাফিয়ে পড়েলাঠি, কিল, ঘুষি অজস্র বর্ষণ করেও তাকে তাড়াতেপারেননি। হাঙ্গরটা তাঁকে গ্রাহ্যও করেনি—সে সম্পূর্ণনির্বিকার ভাবেই তেমনি রোদ পোয়াতে লাগল—একটুওনড়ল না।

এদের শত্রু হচ্ছে সর্দা জাতীয় অতি হিংস্র হাঙ্গর। সর্দাআকারে বেশি বড় নয়, কিন্তু জলের মধ্যে তীরবেগে ছুটে leopard shark-কে পেছনে দাঁত বসিয়ে বসিয়ে রক্তপাতে তাকে দুর্বল করে ফেলে, সামনের দিকে কিছুতেই যায় না—leopard shark-এর মুখের হাঁ অতি ভয়ানক জিনিস, তার সামনে এরা টিকতে ভরসা করে না, তাই কাপুরুষের মতো বার বার পেছন থেকে আহত করে, leopard shark ভারী শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে তেমন পারে না—অজস্ররক্তপাতে দুর্বল হয়ে শেষে ক্ষুধার্ত সর্দার ঝাঁকের ক্ষুণ্ণিবৃত্তিকরে।

টুনা শিকার অতীব লাভজনক ব্যবসা। দু'তিন মাস মাছধরে জেলেরা প্রায় এ থেকে গড়ে ত্রিশ চল্লিশ হাজার ডলারআয় করে। ১৯২৯ সালে লুসিটানিয়া মোটরবোটের কাপ্তেনদেড় মাসের মধ্যে তেরোশ টন টুনা মাছ ধরেছিলেন। যারদাম অন্ততপক্ষে এক লক্ষ বিশ হাজার ডলার। সাধে কিলোকে টুনা শিকারে যায় এত বিপদ সত্ত্বেও।

ইনকাডানের অরণ্যে প্রাচীন যুগের নগরের ধ্বংসাবশেষ

গত শতাব্দীর প্রথমেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমেরিকা মহাদেশে ঘটে নাই। যাঁহারাআমেরিকার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে দুই একটা ভগ্ন মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, পাথরের হাতুড়ি বা বর্শার টুকরা ছাড়া অন্য কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই—সুতরাং তাঁহারা বিশাল আমেরিকামহাদেশের প্রাক্-কলম্বীয় যুগের সভ্যতাকে সংক্ষেপে 'প্রস্তর যুগের সভ্যতা' বলিয়া কর্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন এবং অধিকতর গৌরবের সহিত ইহা প্রচার করিতে দ্বিধাবোধকরেন নাই যে, জগতের যত কিছু সভ্যতা, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান এ সবেরই উৎপত্তি-স্থান প্রাচীন মহাদ্বীপ অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা।

ইহার পরবর্তী যুগে একদল ঐতিহাসিক আবির্ভূত হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন, আমেরিকার ইন্ডিয়ানসভ্যতাকে এমনভাবে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলিবেনা।সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের সুসভ্য প্রাচীনজাতিদের সঙ্গে নিজেদের একটা সম্পর্ক খাড়া করিবার জন্যব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কেহ বলিলেন, প্রাচীন ফিনিশীয়অথবা মিশরীয় জাতিদের সঙ্গে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদেরযোগ আছে, কেহ বলিলেন, ইহারা অধুনালুপ্ত আটলান্টিসজাতির সহিত সম্পর্কিত ইত্যাদি। এই দলের মতবাদবর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনোভুল নাই যে ইন্ডিয়ান সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রাচীনতাইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তাহা অকুতোভয়ে স্বীকারও করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি আমেরিকায়পদার্পণ করিবার পূর্বে তথায় যে একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিলতাহা তখনকার লোকে ভাবিতেওপারিত না।

সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে ইতিহাসের আলোচনারীতিরআমূল পরিবর্তন হইয়াছে। উন্নততর অনুসন্ধান রীতির ফলেগত শতাব্দীর এই উভয় মতবাদই বর্তমানে পরিত্যক্ত তোহইয়াছেই, বরং এমন সময় আসিয়াছে যখন আমেরিকামহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাজোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

এই অনুসন্ধান বিষয়ে যে কয়েকটি সুবিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অগ্রণী—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম। ইঁহারা চল্লিশ বৎসরেরওউপর হইল দেশের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেনএবং ইঁহাদের আগ্রহে, আদর্শে ও অর্থানুকূল্যে আরোকয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—বিখ্যাত Peabody Museum তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা দুই-চারিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নাই—এখনপ্রতি বৎসরে নানা বিভিন্ন দেশীয় সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্রেজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের গবর্নমেন্টএই অনুসন্ধান কার্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন—উপযুক্তনেতার অধীনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দল প্রেরিত হয়। নিবিড় বনভূমি রীতিমতো জরিপ করানো হয়। যাতায়াতেরসুবিধার জন্য জাহাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়, বড় বড়খবরের কাগজগুলি এ সঙ্কল্প সম্বন্ধে এতটুকু খবর পাইবারজন্য উৎসুক হইয়া থাকে—জনমত গঠনে সাহায্য করে।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে আমেরিকামহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীতহইয়াছে সন্দেহ নাই। সেই সকল মালমশলার বিশেষজ্ঞপণ্ডিতগণ ইতিহাসের সৌধ নির্মাণকার্যে সম্প্রতি হস্তক্ষেপকরিয়াছেন।

এই সভ্যতার মূলে ছিল কৃষি। কৃষিকার্যের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ইবা, মায়া ও অসট্রেক সভ্যতা গড়িয়াউঠিয়াছিল। ভুট্টা ও মকাই (maize, zea mays) তখনকারযুগে আমেরিকার সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য ছিল এবং যেখানেযেখানে এই জাতীয় যবের চাষের সুবিধা ছিল, সেই স্থানেই এক এক বিশেষ ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সবেরউৎপত্তি কোথায় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদআছে—কেহ বলেন পেরু, কেহ বলেন মেক্সিকো দেশেরমালভূমিতে—উৎপত্তিস্থান যেখানেই হউক যে জাতীয় বন্যঘাস ইহার আদিপুরুষ তাহা এখনো দক্ষিণ আমেরিকারবহুস্থানে নিবিড়ভাবে জন্মে। আন্ডিজ পর্বতের অধিত্যকা ওমেক্সিকোর বাসভূমি এই ঘাসে পরিপূর্ণ।

তাঁহাদের মত এই যে টলটেক, অসট্রেক বা মায়াসভ্যতার জন্মস্থান আমেরিকার বাহিরে কোথাও নয়, এইদেশেই এমনকি বোধহয় মেক্সিকোর এই মালভূমিরআশেপাশে যেখানে এই যবের চাষের সুবিধা অত্যন্ত বেশি। শিকার ছাড়িয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ যেখানেকৃষিজীবী হইল, প্রাচীন আমেরিকান সভ্যতার সূত্রপাত হইলসেখানে। মানুষে ঘর বাঁধিল, বনে জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকার্জনের পথছাড়িয়া দিল। সকল সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার মূলে যে অমূল্য জিনিসটি বর্তমান, অর্থাৎ অবকাশ-মানুষের ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ জীবনে এইখানে বোধহয় সেই নিরুপদ্রব অবকাশসর্বপ্রথম দেখা দিল। এই অবকাশের ফলে মানুষ নিজেকেচিনিতে শিখিল, জগৎকে নূতন চোখে দেখিতে শিখিল।

কৃষিকর্মের মধ্যে আদিম মানুষে যে বিস্ময় ও রহস্যেরসন্ধান পাইল, এতকাল পরে আজ আমরা তাহা ধারণাওকরিতে পারিব না। কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া নানা উৎসবঅনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিল—নানা দেবতার সন্ধান পাওয়াগেল—কেহ সুবৃষ্টি দেন, কেহ শস্যক্ষেত্রকে ফলবান করেন; এইভাবে নানা নব ধর্মের সৃষ্টি হইল। দেবতাকে মন্দিরেস্থাপিত করিয়া পূজা করিবার প্রয়োজন হইল—কারণতাহাকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে তবেই তো প্রতি বৎসরেরসুফলের আশা করা যাইতে পারে !

কুইকুইলকো পিরামিড ইন্ডিয়ান স্থাপত্য শিল্পেরপ্রাচীনতম নিদর্শন, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত। মেক্সিকোশহর হইতে বারো মাইল দক্ষিণে সান ফার্নান্ডো নামক ক্ষুদ্রএকটি গ্রামের উপকণ্ঠে এই পিরামিডের ধ্বংসস্তূপ অবস্থিত।মেক্সিকো গবর্নমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষডা. ম্যানুয়েল গেমিও এই স্তূপটি আবিষ্কার করেন।

এই পিরামিডের উচ্চতা ছিল এক সময়—৫২ ফিট ওব্যাস প্রায় ৪১২ ফিট। পিরামিড অব্যবহৃতভাবে কিছুকালপড়িয়া থাকিবার পরে নিকটবর্তী একটা আগ্নেয়-উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মধ্যে অর্ধপ্রোথিত হইয়া যায়—(জমি হইতে২৫ ফিট পর্যন্ত)—বর্তমানে ইহার চূড়াটি এই জমাট লাভার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে। সুতরাং পিরামিডের বয়স নির্ণয় করিতে হইলে এখন আর অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না—ইহা যে লাভাস্রোতের অপেক্ষাপ্রাচীন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তো বটেই। ভূতত্ত্ববিদ্যাএখানে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে।

কুইকুইলকো পিরামিড এইজন্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিবিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা এই পিরামিডের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কী বলে তাহা অনুসন্ধানকরিবার জন্য ১৯২৩ সালে ডা. বায়রন কামিংস-এর অধীনেএকটি দল এখানে প্রেরিত হয়—এই দলের সঙ্গে ছিলেনযুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডা. ডার্টন।

এই দলটি অনেকদিন এখানে থাকিয়া অনুসন্ধানকরিয়াছিলেন। ওই বৎসরের আগস্ট মাসে ডা. বায়রনকামিংস এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন—প্রবন্ধটিতে তিনিডা. ডার্টনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, কুইকুইলকো পিরামিডের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এই লাভাস্রোতের বয়স সম্ভবত তিন-চার হাজার বৎসর। সুতরাং পিরামিডেরবয়স ন্যূনকল্পেও তিন-চার হাজার বৎসর।

ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।পিরামিডটির উত্তর দিকে কিছুদূরে সান আঞ্জেক নামক আরএকটি ক্ষুদ্রগ্রামে একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাধিস্থান সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সমাধিস্থানটিও উপরোক্তলাভাস্রোতে চাপা পড়িয়াছিল। মাটির তলায় পাথরের নুড়ি ও জমাট লাভার নীচে আমেরিকার সুপ্রাচীন অধিবাসীদেরএই সকল কঙ্কাল বহুযুগ পরে আবার দিনের আলোয় প্রকাশপাইয়াছে। হয়তো যাহাদের এই কঙ্কাল, তাহারাইকুইকুইলকোর পিরামিড গড়িয়াছিল, কোনো বিস্মৃত দেবতারউদ্দেশে এইখানে তাহারা অর্ঘ্য নিবেদন করিত। তাহাদের সমাধির মধ্যে মাটির বাসন পাথরের ছুরি ও নানা আকৃতিরছোট ছোট মৃন্ময় মূর্তি পাওয়া গিয়াছে—হয়তো ভূত ওঅপদেবতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সকলদেবদেবীর পুজো তৎকালে প্রচলিত ছিল।

মেক্সিকোর মালভূমিতেই যে এই আদিম আমেরিকানসভ্যতার জন্ম এ বিষয়ে বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ নাই। এইখানে কৃষিকার্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমেচারিদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে এক ধরনের নতুন ওষধি পাওয়া গিয়াছে যাহার দানা খাইয়া মানুষ জীবনধারণকরিতে পারে। কৃষিকর্ম এইভাবেই বিস্তারলাভ করিল—কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া মায়ার সভ্যতা গড়িয়া উঠিল।

সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের একটা হিসাব রাখার প্রয়োজন অনুভূত হইল। কৃষিজীবী সভ্যতার পক্ষেইহা তো না হইলেই চলিবার নয়। কখন কোন্ ঋতু আসে, কোন্ ঋতু যায়, কখন বীজ ছড়াইতে হইবে, ফসল কাটিতেহইবে—চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির একটা মোটামুটি হিসাব—এসব তো চাই। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেনপিরামিড গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইহাই। এগুলিজগতের প্রাচীনতম মানমন্দির। আজ এতকাল পরেঠিকমতো বুঝিতে পারিবার কথা নহে, আদিম মানব কিরূপেইহার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিত—কালগতিরহিসাব রাখিত, শস্যবপনের সময় হইয়াছে কিনা জানিত।

খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পূর্বে মায়া জাতির একশাখা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়া দক্ষিণ গুয়াতেমালার ঘনঅরণ্যে বসতি স্থাপন করে। এখানে বড় বড় শহর গড়িয়াউঠিল। নতুন ধরনের পিরামিড স্থাপিত হইল আরদেবমন্দিরের তো কথাই নাই। গুয়াতেমালার এই অঞ্চলেদেবমন্দিরের যে সকল ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাসংখ্যায় দুই-দশটা নয়—দুইশত পাঁচশত।

এই সকল দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে অদ্ভুত গঠনের স্তম্ভগঠিত হইত ১৮০০ দিন অন্তর। এগুলিকে পাথরের পঞ্জিকা বলা যাইতে পারে। অধুনালুপ্ত মায়া চিত্রলেখের সাহায্যে ইহাদের গায়ে তৎকালীন প্রধান ঘটনাবলি লিপিবদ্ধহইয়াছিল। সে হিসাবে এই স্তম্ভগুলি একাধারে পঞ্জিকা ওজাতীয় ইতিহাস।

এই সময়ে মায়া সভ্যতার উন্নতির সূত্রপাত হয়। বড় বড়রাজপ্রাসাদে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য উভয়বিধ শিল্পের সৌকর্য প্রদর্শিত হইতে লাগিল—নানা প্রকারের বনলতা, ওষধি ও প্রস্তরের সাহায্যে বহুবিধ রং প্রস্তুত করিয়া শিল্পীরা তদ্দ্বারামন্দিরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল—পালকের কাজ, কাঠ খোদাই, মৃৎপাত্র গঠন, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পেরও সমধিক উন্নতি সাধিত হইল। সকল দিক বিবেচনা করিয়াদেখিলে মায়া জাতিকে যে পণ্ডিতেরা ‘the Greeks of the New World' বলিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি মনে হয় না।

মায়া সভ্যতার এই গৌরবময় যুগের ইতিহাস ছড়ানোআছে—মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস প্রভৃতি নানা পিরামিড ও স্তম্ভের ধ্বংসস্তূপের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রলেখে, ছবিতে, দেবদেবীর মূর্তিতে। এ সম্বন্ধে আজকাল যথেষ্ট অনুসন্ধান চলিতেছে, মেক্সিকো শহরের মিউজিয়ামে এযুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

এই যুগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই বিপদ আসিয়া জুটিল—কৃষিজীবী সভ্যতা কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারেনা, এমন একদিন আসিবে যখন ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্য জোগাইতে দেশ আর সক্ষম হইবে না—বৎসরে বৎসরে জমিরউৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল, আবাদি জমির পরিমাণ ঠিকই রহিল—অথচ লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলঅনেক। বাড়তি লোকে নূতন দেশে নূতন জায়গা জমিরসন্ধানে বাহির হইল, নতুবা স্বদেশে আর চলে না। খ্রিস্টীয়তৃতীয় শতকে মায়া জাতির এক শাখা ইউকাতান উপদ্বীপে উপনিবেশ করিল।

ইউকাতান এখনো যাহা, তখনো তাহাই ছিল। ঘনঅরণ্যে সমস্ত দেশটা ভরা, মাঝে মাঝে ছোট বড় নদী, নদীর উভয় তীরে ও মোহনায় অরণ্য আরো গভীর—ম্যানগ্রোভেরবনে মোহনা দুর্গম, অনেক স্থলে স্রোত এত প্রখর যে নৌচালনানিরাপদ নয়। মশা-মাছি-কীটপতঙ্গ ভরা, জলে স্থলে নানা আকারের মৃত্যুদূত বিষাক্ত সর্প, কুমির, বিষাক্ত মাছ। দেশেরসাহসী বীরেরা নব অভিযানে বাহির হইয়া এই সকলজিনিস পাঠাইয়া শহর স্থাপন করিল। দেবায়তন উঠাইল, কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তম শতকেরশেষভাগে মেক্সিকোর প্রাচীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াএখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী মায়া সভ্যতার আর এক গৌরবময় যুগ। ইহা স্থায়ী হয় তিন-চারিশ বৎসর—প্রায়চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এ যুগের স্থাপত্যরীতিখ্রিস্টান সাম্রাজ্যের রাজধানী চিচেন-ইৎসা নগরের বিরাটধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি ইউকাতানের অরণ্য-ভূভাগেআবিষ্কৃত হইয়াছে—কত প্রাসাদ, দেবায়তন ঘন জঙ্গলেদড়ির মতো মোটা লায়ানা লতার আবেষ্টনীর মধ্যেআত্মগোপন করিয়া ছিল আজ পাঁচ-ছয় শত বৎসর—কতমানমন্দির, কত গ্রন্থাগার, আশ্রম, বিচারগৃহ, প্রমোদশালা—বিস্মৃত জাতির এইসব ইতিহাস, এই সবনিদর্শন আজকাল দার্শনিক ভ্রমণকারীর মনে কত অদ্ভুতচিন্তাই না জাগায়।

নবীন সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতকের শেষভাগে ধ্বংসের পথেঅগ্রসর হইতে থাকে। ওই সময় রাজ্যমধ্যে গৃহবিবাদ শুরুহয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়, যুদ্ধ ও রক্তপাতেদেশ ক্রমশ এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে একশত বৎসর পরেস্পেনীয় আক্রমণকারীগণ যখন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল, বাধা দেওয়ার শক্তি আর তখন তাহার ছিল না।

১৯১৬ সালে Central American Expedition অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানীওয়াশাক্তুনের (Vaxactun) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই শহরের সর্বপ্রাচীন মায়াস্তম্ভ ও লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভের তারিখ মোটামুটি ৬৮ খ্রিস্টাব্দ। এই স্তম্ভ ও লেখের সবটাই শৈবাল ও তৃণে আচ্ছাদিত ছিল। ইঁহারা সেসব পরিষ্কার করিয়া বহুকষ্টে লেখের পাঠোদ্ধার করেন।

'ওয়াশাক্তুন' শব্দের অর্থ অষ্টম প্রহর। উপরোক্তমায়াস্তম্ভের গাত্রে মায়া পঞ্জিকার '৮' তারিখ উৎকীর্ণ আছে।ইহা সম্ভবত শতাব্দী-জ্ঞাপক অঙ্ক। এখানকার প্রায় সমস্তস্তম্ভের গায়ে যে পক্ষযুক্ত অজগর সর্পের মূর্তি উৎকীর্ণদেখিতে পাওয়া যায়—নবীন সাম্রাজ্যের রাজধানীচিচেন-ইৎসার কয়েকটি মন্দিরেও সেই সর্পের প্রস্তরমূর্তিআছে—সম্ভবত ইহা কোনো মায়া দেবমূর্তি হইবে। স্তম্ভেউৎকীর্ণ তারিখ দেখিয়া মনে হয়, ওয়াশাক্তুন মায়া রাজ্যের প্রাচীনতম নগর। বর্তমানে কার্নেগি ইনস্টিটিউট এখানেখননকার্য চালাইতেছেন—এখনো কার্য বেশিদূর অগ্রসর হয়নাই, আশা করা যায় আর কয়েক বৎসর পরে কার্নেগিইনস্টিটিউটের উদ্যম সফলতা লাভ করিলে এই রহস্যময়, সুপ্রাচীন সভ্যতার বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

ক্রিস্টোফার রেন

তিনশত বৎসর পূর্বে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাতক্রিস্টোফার রেন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। রেনস্থাপত্যশিল্পে একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন; এমন এক সময় ছিল যখন ইংল্যান্ডে ধনীদিগের অধিকাংশপল্লীভবন এই ধারায় নির্মিত হইত। ইংল্যান্ডের পল্লীঅঞ্চলেরবহু সুবিখ্যাত প্রাচীন বাসভবন, গির্জা, সেতু এখনো রেনেরপ্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান আছে।

আগুন লাগিয়া লন্ডন শহর পুড়িয়া যাওয়ার পরে আবারনতুন শহর গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন বেশিরভাগ বাড়িই নির্মিত হইল এই পদ্ধতি অনুসারে। ইংল্যান্ডের সে একগৌরবময় নবযুগ—ক্রিস্টোফার রেন স্থপতি, স্যামুয়েলপেপিস ডায়েরি-লেখক, আইজাক নিউটন টাঁকশালেরঅধ্যক্ষ ও আইজাক ওয়ালটন মৎস্যশিকারি।

ইংল্যান্ডের লোকে রেনকে ভালোবাসে। রেন-পদ্ধতিরবাড়িকে ভালোবাসে। তাহাদের মনে হয়ইংল্যান্ডের এইগৌরবময় অতীত যুগের আত্মা রেন-পদ্ধতিতে নির্মিত যে-কোনো ঘরবাড়ির চুন-সুরকি-ইটের বন্ধনে আজও সজীবআছে—তাহাদের মতে এই ধারা তাহদের জাতীয় মনের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। সবুজ পল্লীপ্রান্তরের এক পাশে কিংবাবড়লোকের সুবৃহৎ উদ্যানে গাছপালার আড়ালেরেন-পদ্ধতির বাড়ি বা গির্জা দেখিলে তাহাদের মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড আজও জীবিত আছে, আজও জাগ্রত আছে। বিলাতে রেন-সোসাইটি আছে, তাহারা রেনের প্রবর্তিত স্থাপত্যধারাকে অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্জীবিতরাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, বই, পুস্তিকা, সাময়িকপত্র, ছবি ইত্যাদি বাহির করে—আর্নেস্ট নিউটন, ডবার, লুটেনসপ্রভৃতি বর্তমান যুগের অনেক বিখ্যাত স্থপতি এই সোসাইটির সদস্য ও কর্মকর্তা।

ক্রিস্টোফার রেন সুপণ্ডিত ছিলেন, গণিতশাস্ত্রে সুনিপুণছিলেন, স্বপ্নপ্রবণ শিল্পী ছিলেন—তিনি ইউরোপের সর্বত্রইপরিভ্রমণ করিয়াছিলেন—কিন্তু ইংল্যান্ডকে ভুলিয়া যান নাই, ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ইংরেজ। তিনি নিজে ছিলেন দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, উত্তরকালে যদিও বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁহারবন্ধুত্ব হইয়াছিল, তিনি যথেষ্ট ধনও উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিতযোগ তিনি কখনো হারান নাই।

এইজন্যই তিনি ছিলেন ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর স্থপতি। একদিকে যেমন সেন্ট পলের বিরাট গির্জা, গ্রীনউইচহাসপাতাল, দেশের সর্বত্র ছড়ানো অন্তত পঞ্চাশটি বড় বড়গির্জা তাঁহার কীর্তি, অন্যদিকে কত দূর পল্লীপ্রান্তরে গ্রাম্যডাক্তারের ও গ্রাম্য জমিদারের বাসভবন, গ্রাম্য গির্জাপ্রভৃতিও তাঁহার মনের স্থিতিস্থাপকত্ব ও সহানুভূতিরপরিচায়ক। যেখানে বেশি জমি নাই, বাড়ির কর্তার হাতেবেশি অর্থ নাই, তিনি সেখানে নাক উঁচুতে উঠাইয়াঅবজ্ঞাভরে প্রস্থান করিতেন না—বরং সেই অপ্রচুর উপকরণও অসাচ্ছল্যের মধ্যেও কী উপায়ে শ্রী ও সৌন্দর্যের সৃষ্টিকরা যাইতে পারে, সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্তথাকিতেন। ক্রিস্টোফার রেনের এই সহৃদয়তার বহু পরিচয়আছে ইংল্যান্ডের পল্লীপ্রান্তে। দেশবাসী এই জন্যই তাঁহাকে ভালোবাসিত।

কিন্তু বর্তমানে এক ধরনের বৈদেশিক স্থাপত্যনীতিআসিয়া ইংল্যান্ডের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে—ফ্রান্স ও জার্মানিতে তাহার উদ্ভব, কিন্তু এখন ধীরেধীরে ইউরোপেরসর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইতালিতে ভিনোলা, ইংল্যান্ডেবার্লিংটন ও ক্যাম্বেল এই ধারার প্রবর্তক। স্থাপত্যশিল্পে এইনীতি একেবারে অতি আধুনিক, আমাদের দেশেও ইহাআমরা দেখিতে পাইব, আলিপুর অঞ্চলের দু-চারিটি নতুনবাড়ি এই ধারায় নির্মিত। সরলরেখার সুসমঞ্জস সমাবেশএই পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব, ইহার জানালাগুলি একজোড়াদীর্ঘ সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে স্থাপিত—বাতায়ন-রেখা ছাদের কার্নিসের সঙ্গে সমান্তরাল। কার্নিস গৃহভিত্তি হইতেঅনেক উঁচু এবং ছাদ সমতল। ফ্রান্সে কর বসিয়ে এই ধরনেরবাড়িতে সর্বপ্রথম ইস্পাতের কাঠামো ও কংক্রিটের গাঁথুনিব্যবহার করা হয়। সেই হইতে ইট ও চুন-সুরকির উপাদানসেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে।

অনেকের মত, এই পদ্ধতি টিকিবে না। শীতপ্রধান দেশেরপক্ষে এ ধরনের বাড়ির প্রধান অসুবিধা এই যে, সমতলছাদে শীতের দিনে তুষার জমিবে, নীচু জানালা দিয়া আগস্টমাসের সূর্যালোক ঘরে ঢুকিবে না—সুতরাং ফ্যাশনের বেলাযাহাই হউক না কেন, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দিক দিয়া দেখিতেগেলে এই পদ্ধতির অনেক দোষ।

আর্নেস্ট নিউটন প্রমুখ দুই-একজন সুবিখ্যাত স্থপতিউপরোক্ত উভয় পদ্ধতির দোষগুলি বর্জন করিয়া মাত্র সুবিধা ও সৌন্দর্যের অংশগুলি একত্রিত করিয়া একটি অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এখনো সর্বত্র ছড়াইয়াপড়ে নাই।

কলোরাডো নদীপথে সাড়ে সাত শত মাইল

কলোরাডো নদীর নাম বিশ্ববিখ্যাত। যুক্তরাজ্যেরউয়োমিং প্রদেশে Wind-river পর্বত এই নদীর উৎপত্তিস্থল। উটা ও আরিজোনা প্রদেশের জনহীন শুষ্ক মালভূমি ও মরুর মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেক দূর যাইবার পরে ইহাখাড়া

দক্ষিণে গিয়া Old Mexico প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে, পরে আবার কিছু বাঁকিয়া কালিফোর্নিয়া উপসাগরে গিয়াপড়িয়াছে। এক হাজার মাইল ধরিয়া এই নদী উচ্চ পাষাণময় তীরভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে উচ্চভূমি হইতে নিম্নে পড়িতেছে। নৌকায় যাতায়াত করা এই নদীতেএতই বিপজ্জনক যে গত ষোলো বৎসরের মধ্যে যতগুলি দলনদী পর্যটনে বাহির হইয়াছিল—তন্মধ্যে একটি দলের প্রচেষ্টাসাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন মি. ক্লাইভ এডি—ইনিএবং ইঁহার দলের সকলেই তরুণবয়স্ক, কলেজের ছাত্র। কী করিয়া একদল অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্র এই বিপদসঙ্কুল দুরূহনদীটি উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, সেবিবরণ অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

গ্রিন রিভার হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি দলটি রওনা হয়। সেখানকার লোক ইহাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হয় নাই। জুন মাসের শেষে বন্যা আসিয়া নদীর জল বাড়াইবেবটে, কিন্তু বিপদ এই সময়েই সর্বাপেক্ষা বেশি। জলের অল্পনীচেই ক্ষুরধার শিলাখণ্ড ইতস্তত বিরাজমান, স্রোতের কুটা পড়িলে দু'খানা হইয়া যায়—যদি ডিঙির সঙ্গে ওইসবনিমজ্জিত শিলাস্তূপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—নৌকা তোখান খান হইয়া যাইবেই, সেই খরস্রোতে পড়িলে একটিপ্রাণীও টিকিবে না। পথের এ সমস্ত বিপদ কাহারো অজানাছিল না, তবু এই তরুণদল একটুও দমিল না।

কলোরাডো নদী যুক্তরাজ্যের যে অংশ দিয়া বহিয়াচলিয়াছে তাহার সবটাই অনুর্বর তৃণগুল্মহীন মালভূমি ও বালুময় মরু। এই নদীর দুই তীর একেবারে জনশুন্য, লোকবসতিহীন, নদী বাহিয়া দুশো-পাঁচশো মাইল চলিয়া যাও, কোথাও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না, আগুনেরধোঁয়া দেখিবে না, গৃহপালিত কোন জীবজন্তু দেখিবে না।এই নির্জনতা সকলে সহ্য করিতে পারে না। ১৮৬১খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্মচারীলেফটেন্যান্ট অইডস্ লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয়আমাদের পর আর কোন সভ্যদেশের মানুষ এই বিজনপ্রদেশে পর্যটন করিতে আসিবে না। এই অঞ্চলকেমনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতি কোনোচেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই, প্রকৃতির ইচ্ছা বোধ হয় এই যে, কলোরাডো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে মনুষ্য-কীট কোনোদিন বাসা না বাঁধে।"

গ্রিন রিভার ও গ্র্যান্ড রিভার এই দুই নদী যেখানে গিয়ামিশিল সেখান হইতেই কলোরাডো নদী প্রকৃতপক্ষে আরম্ভহইয়াছে। এই অংশে একটিমাত্র রেলপথ নদীর উপরে সেতুবাঁধিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে—সভ্য মানুষেরকীর্তির এই একটিমাত্র চিহ্ন বাদে এখান হইতে সাড়েসাতশো মাইলের মধ্যে আর কোনো সেতু, ঘরবাড়ি, বাঁধ, কলকারখানা, গ্রাম বা শহর কোথাও কিছু নাই। খাদ্যদ্রব্যসঙ্গে না থাকিলে এই জনহীন মরুপ্রদেশে খাদ্যাভাবেমৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই।

মি. এডি ও তাঁহার দলটির উপরোক্ত দুটি নদীর সঙ্গমস্থানে পৌঁছাইতে লাগিল মাত্র তিন দিন; এই অংশে তত বিপদ নাই, স্রোতও তেমন প্রখর নয়, কাজেই পথেরএই ভাগ উত্তীর্ণ হইতে কম সময় লাগিবারই কথা; তাহারপরই কলোরাডো নদীর শুরু এবং নদীর সে অংশ আবারদু'ধারের প্রস্তরময় তীর বাহিয়া গিয়াছে একটানা একচল্লিশমাইল। ইহার নাম Cataract Canyon।ভূবিদ্যার ভাষায়এই ধরনের উচ্চ পাষাণময় নদীর পাড়কে Canyon বলে, বাংলায় ইহার কোনো প্রতিশব্দ নাই, সম্ভবত সংস্কৃতেও নাই, কারণ ভারতবর্ষে কোনো নদীরই ভৌগোলিক অবস্থানএমন নাই।

এই Canyon পার হইতে দলটির লাগিয়া গেল সাত-আট দিন। গ্রিন রিভার হইতে তখন প্রায় দুইশত মাইলের বেশিও আসা হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘপথের মধ্যে কোথাও জনমানবের চিহ্নও মেলে নাই। Cataract Canyon যেখানে শেষ হইয়াছে, একজন বৃদ্ধ সেখানে একা তাঁবুখাটাইয়া অনেকদিন হইতে বাস করিতেছে ও সোনার খনিখুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দুইশত মাইলের পরে এই একমাত্রমানুষের মুখ দেখা গেল—এই প্রথম এবং এইশেষ—পরবর্তী দেড়শো মাইলের মধ্যে আর মনুষ্যবসতিনাই।

বছর ত্রিশ আগে কলোরাডো নদীতে সোনার সন্ধানপাওয়া গিয়াছিল। তখন যুক্তরাজ্যের সকল প্রদেশ হইতেদলে দলে লোক সোনার লোভে আসিয়া জুটিতে লাগিল, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সোনা এত কম পরিমাণেপাওয়া যায় যে তাহাতে মজুরি পোষায় না। বছর পাঁচেকপরে যে যার নিজের দেশে হতাশ মনে ফিরিয়াগেল—কেবল এই একজন ছাড়া।

এই লোকটি আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই নির্জন প্রদেশেএকা জীবন কাটাইতেছে। নদীর ধারেই তার কাঠের কুঁড়েঘর—আশপাশে বালুচরে সে দিনরাত সোনার সন্ধানে মাটিখুঁড়িয়া বেড়ায়। এই জনমানবহীন বিজন স্থানে কিসেরলোভে সে

এতকাল বাস করিতেছে সে-ই জানে। অথচ সেযে বিশেষ কোনো ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা মনে হয়না।পঁচিশ বছর ধরিয়া মানুষে কি করিয়া এই বনবাস স্বেচ্ছায় সহ্য করিতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝাশক্ত।

বলা বাহুল্য লোকটি বৃদ্ধ হইলেও এখনো খুব কর্মক্ষম ওউদ্যমশীল। ষাট বছর আগে সে Long Island-এর একটিক্ষুদ্র নগরের রাজপথে তাহার বয়সের অন্যবালক-বালিকাদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলিয়াবেড়াইত—কতকাল সে জন্মভূমি দেখে নাই, নিজেরআত্মীয়স্বজন দেখে নাই—কিন্তু সেজন্য তার মনে এতটুকুদুঃখ নাই।

মি. এডি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ জায়গা যদিছেড়ে যাও, তবে আবার কোথায় যাবে ?লোকটি বলিল—এখান থেকে যদি কখনো যাই, তবে মেক্সিকোতেযাবার ইচ্ছে আছে। মেক্সিকোতে সোনার অভাব নেই, কিন্তুসবাই কি আর পায় ?

এখান হইতে সাড়ে চারশো মাইল একেবারে জনশূন্য। কলোরাডো নদীর এই অংশ সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। দুই তীরেরপাথরের পাড় প্রায় এক মাইল উঁচু, এমন ভয়ানক তারখাড়াই যে, নদীতে নৌকা ডুবিয়া গেলে যদি কেহ সাঁতারদিয়া তীরেও ওঠে, তবুও সেই দুরারোহ পাথরের পাড়ে উঠিবার সাধ্য কাহারো হইবে না—অতএব খাদ্যাভাবে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখানে সূর্যের উত্তাপ এত প্রখর যে দুপুরবেলানদীতে জলের ওপর থাকাও দায়। মাঝে মাঝে এই অংশে লোকবসতির ধ্বংসাবশেষ আছে—যারা ত্রিশ বছর আগেসোনার খনির সন্ধানে আসিয়াছিল, তাদেরই ছোট ছোট কাঠের ঘর, এক-আধটা মরিচা পড়া এঞ্জিন, কোদাল, কুড়ুলইত্যাদি। পাষাণময় খাড়া পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া বন্য পাহাড়িভেড়ার দল নীচের নৌকা ও মানুষগুলিকে দেখিতেছিল, এ দৃশ্য তারা কখনো দেখে নাই—মানুষ তাদের কাছে অজ্ঞাতও অপরিচিত জীব।

কলোরাডো নদীপথে ভ্রমণ করিতে গেলে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অসতর্ক পথিক যে-কোনো মুহূর্তে বিপদেপড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। খরস্রোত, চোরাবালির চর, নিমজ্জিত শিলাখণ্ড এসব তো আছেই—তাছাড়া অনেকসময় তেরোশো ফিট উঁচু পাষাণতীর হইতে বড় বড়পাথরের চাঁই খসিয়া পড়ে—অনেক জায়গায় এ ধরনের পাথর পড়িয়া নদীর মাঝখানে স্তূপাকার হইয়া আছে—তারদু'পাশে এমন খরস্রোত ও দুরন্ত আবর্ত যে, মাঝি নিতান্তসুনিপুণ না হইলে নৌকা সামলানো একরূপ অসম্ভব। অনেক দূর হইতে ঘূর্ণাবর্তের টানে নৌকা গিয়া পাথরের স্তূপে ধাক্কাখাইয়া উল্টাইয়া যায়—যত বড় সন্তরণপটুই হউক না কেন, এরকম টানের ও ঘূর্ণাবর্তের মুখে কোনো মানুষই টিকিতেপারে না। তবে নিপুণ ও অভিজ্ঞ মাঝি অনেক দূর হইতেইজলের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া সম্মুখের বিপদ বুঝিতে পারে ও পূর্ব হইতেই সতর্ক হয়।

Cataract Canyon-এ একবার হঠাৎ নদীর জল বাড়িয়াদলটি বিপন্ন হইয়াছিল। সারাদিন দাঁড় টানার কঠোরপরিশ্রমের পর সকলে সন্ধ্যার পরে নৌকা বাঁধিয়া আহারাদিশেষ করিয়া লইল এবং নদীর বালুময় তীরে কম্বল বিছাইয়াযে যেখানে পারিল বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রে একজন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল—তাহার পায়ে জললাগাতে ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়াছে—নদীর দিকে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, নদীর জল বাড়িয়া তাহার বিছানা পর্যন্ত আসিয়াছেএবং হু-হু করিয়া বাড়িতেছে। সে চিৎকার করিয়া সকলকেজাগাইয়া তুলিল—রাত্রের রান্নার কড়াই, চাটু ইত্যাদি ইতিমধ্যে জলে ভাসিতেছে, জলের তোড়ে নৌকাগুলি সজোরে ডাঙায় আছাড় খাইতেছে, আর একটু বিলম্ব হইলেই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিত। সে-রাত্রের মধ্যে নদীরজল বাড়িয়া গেল ১৮ ফিট—সে বছরে অত বড় বন্যা আরহয় নাই।

আর একটা অসুবিধা এই যে, কলোরাডো নদীতে ভ্রমণকরিতে গেলে সবটাই নৌকার উপর চড়িয়া যাওয়া চলেনা।মাঝে মাঝে নৌকা ও জিনিসপত্র ঘাড়ে করিয়া পথ হাঁটিতে হয়, কারণ অনেক স্থলে নদীর জল উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ এত নিম্নে গিয়া পড়িতেছে যে সে-সব স্থানে কোনো মাঝিই নৌকা বাঁচাইতে পারে না। মরুদেশের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ভারী নৌকা ও আসবাবপত্র বহিয়া পথ হাঁটা যে কতআরামের, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। এই পথএকটু-আধটু নয়, অনেক সময় দশ মাইল বারো মাইল পর্যন্তনা হাঁটিলে নিরাপদ অংশে পৌঁছানো যায় না। মি. এডি'রদল এ অসুবিধাও অকাতরে সহ্য করিয়াছিল।

সাড়ে সাতশো মাইল দীর্ঘ পথের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়টিস্থানে ভালো পানীয় জল পাওয়া যায়। কলোরাডোর জলঅত্যন্ত ঘোলা, পানের অনুপযুক্ত—দু'একটি শাখানদীর জল ভালো, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষারমিশ্রিত ও বিস্বাদ।গ্যালোওয়ে খালের মুখে পরিষ্কার জলের একটা উনুই আছে—এখানকার জল সুপেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে।

Little Colorado নদ যেখানে আসিয়া কলোরাডো নদীতে মিশিয়াছে, তাহার একটু পরেই Upper Granite Gorge নামে একটি অতীব বিপদসঙ্কুল অংশ অবস্থিত। এখানে দু'ধারে গ্রানাইট পাথরের উঁচু পাড়ের মধ্যে নদীর মুখ সংকীর্ণ হইয়া আশি ফিটে দাঁড়াইয়াছে—নদী এখানে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া উন্মত্ত রোলে কঠিন পাষাণতীরে আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে—স্রোত যেমন প্রখর, আবর্ততেমনি ভয়ঙ্কর—ইহার উপর আবার এইস্থানেই নদী একমাইলের মধ্যে ২৫ ফিট নামিয়া গিয়া গভীর বিপদের সৃষ্টিকরিয়াছে।

Upper Granite Gorge পার হইয়া অল্প দূরেজগদ্বিখ্যাত Grand Canyon—ইহার রুদ্র সৌন্দর্যেরতুলনা নাই—পৃথিবীর সকল দেশ হইতে পর্যটকেরা পথেরকষ্ট তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতির এই অদৃষ্ট রূপ দেখিতে আসে।

পদব্রজেইংল্যান্ডের পল্লীপথে

জন ম্যাক উইলিয়ামস একজন তরুণ আমেরিকান—তিনিঅভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও ভবঘুরের জীবন আস্বাদ করবারআনন্দে সম্প্রতি ইংল্যান্ডের পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এঁরহাতে অর্থ ছিল না। পথে কাজকর্ম করে অর্থসংগ্রহ করতেন।এই তরুণ ভবঘুরে ভ্রমণকারীর লেখার মধ্যে আমরাইংল্যান্ডের পল্লীজীবনের একটা চমৎকার ছবি পাই।

—রাত দুপুর। ব্লুম্‌স্‌বেরির পথঘাট জনশূন্য, আমি আমার বাসা থেকে বার হয়ে হাইড পার্ক কর্নারে একটা কফিরদোকানে একদল লোকের সঙ্গে মিশে কফি খেলাম।

কফি-পানের সময় দলের সকলকেই একবার ভালো করেদেখে নিলাম। আমার পাশে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক, বোধহয় সে সৈন্যদলে কাজ করত, তারই সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুরু হল।

সে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ইংরেজ নও বোধ হয়—না?

আমি বললাম—না। কেন ?

—তুমি আস্তে আস্তে কথা বলছ, তাই থেকে মনে হচ্ছে। তুমি আইরিশ না স্কচ ?

—আমি আমেরিকান।

—আমেরিকান ! ডলারের দেশ থেকে আসছ ?

—আসছি বটে, কিন্তু আমি নিজে প্রায় নিঃসম্বল। আমি পায়ে হেঁটে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডের সর্বত্র বেড়াবস্থির করেছি। পথে কাজ খুঁজে নেব অর্থ উপার্জন করবারজন্যে।

—কাজ কোথায় পাবে ?ইংল্যান্ডের লোকই কত বসে আছে কাজের অভাবে !

—দেখাই যাক, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। শোনো, আজসারারাত লন্ডন শহরটা হেঁটে বেড়িয়ে দেখব। এসো নাআমার সঙ্গে।

—সে বেশ হবে—আমার কোনো আপত্তি নেই।

কফি-পান শেষ করে দু'জনে হাঁটতে শুরু করি। টেমসের ধারে এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রায় জনশূন্য, দু-একজন পুলিশম্যান কেবল এখানে-ওখানে ঘুরছে, একস্থানে একটা স্ত্রীলোকপথের ধারে ঘুমুচ্ছে ! লন্ডনের নৈশজীবন বড় বিচিত্র, কতঅসহায় গৃহহারা হতভাগ্য লোক যে রাত্রে পার্কের বেঞ্চিতে, পথের ধারে এভাবে শীতের রাত্রিযাপন করে !

ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের কাছে একজন লোক খোঁড়াতেখোঁড়াতে কাছে এল। একটু ইতস্তত করে বললে—একটা সিগারেট আছে কি ?

আমি বাক্স থেকে একটা সিগারেট বার করে তাকে দিলাম।

লোকটা বললে—বড্ড বাতের বেদনায় ভুগছি। আজ রাত্রে একটা বিছানা ভাড়ার দাম দিতে পারো ?

—কত ভাড়া লাগবে ?

—আট পেনি।

আমি পয়সা বার করবার পূর্বেই আমার বন্ধু একটা শিলিং তার হাতে দিয়ে বললে—কিন্তু সাবধান, এই পয়সায়মদ খেও না যেন।

ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ থেকে আমরা চন্দ্রালোকিতটেমসের দিকে চেয়ে রইলাম—মাঝে মাঝে বজরা কিমালবোঝাই নৌকা নদীবক্ষকে একটু চঞ্চল করে দিচ্ছে, লন্ডন শহর নিস্তব্ধ, রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় কম।

ল্যাম্বেথের দিকে নদীর ধারের বেঞ্চিগুলোতে অনেক লোক ঘুমুচ্ছে। এসব বেঞ্চে রাত্রে শুয়ে থাকা আইনবিরুদ্ধ, শায়িত লোকদের উঠিয়ে দিয়ে গেল একজন পুলিশম্যান। এইসব গৃহহারা হতভাগ্যদের টেমস নদীর ধারের বেঞ্চিছাড়া অন্য শয়নের স্থান নেই—কারণ এরা শোয়ারজায়গার ভাড়া দিতে পারে না। পুলিশ পিছন ফিরতেইঅনেকেই আবার শুয়ে পড়ল। উপায় কী বেচারিদের?

বড় অন্ধকার, একটা বেঞ্চে একটি শায়িত মনুষ্যদেহেরউপর আর একটু হলে আমরা বসে পড়েছিলাম আর কি !পরে দেখি একটি বৃদ্ধা সেখানে শুয়ে—গায়ে ছেঁড়া একটাআলোয়ান, ভাঙা তোবড়ানো হ্যাটের তলায় তারউস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধা একটু নড়ল, তারপরধীরে ধীরে যেন কষ্টের সঙ্গে পাশ ফিরলে। ভয়ে ভয়ে চোখ চেয়ে আমাদের দিকেচাইলে, যেন ভূত দেখছে।

আমি বললাম—ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। চলতোমায় এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে তুমিভালো বিছানায় শুতে পারবে।

কথা শেষ করেই আমি তার হাতে একটা ফ্লোরিনদিলাম—দু শিলিং। রৌপ্যমুদ্রা হাতে পড়তেই তার ঘুমেরঘোর যেন কেটে গেল। সে বললে—ভগবান তোমাদেরভালো করুন। এতে আমার দু'দিন চলে যাবে।

গ্রীষ্মকালের প্রভাত হবার দেরি নেই বেশি। যদিও এখনরাত মাত্র সাড়ে তিনটে—এরই মধ্যে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজদিয়ে তরিতরকারিবোঝাই গাড়ি যেতে শুরু করেছে।

আমরা কভেন্ট গার্ডেনে এলাম—লন্ডনের মধ্যে সকলেরচেয়ে বড় শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাজার এই কভেন্টগার্ডেন। কুলিরা মালবোঝাই গাড়ি থেকে ব্যস্তসমস্তভাবেমাল নামাচ্ছে, টাটকা গোলাপের গন্ধ ভুর ভুর করছেভোরের হাওয়ায়। শাক-সবজি কত ধরনের—চমৎকারসুপক্ব স্টবেরি, হট-হাউসে তৈরি বড় বড় টমেটো, মটরশুটি, খড়ের আঁটিবাঁধা কচি অ্যাসপ্যারোগাস শাক, পেঁয়াজ, কচি গোলাপি রঙয়ের রুবার্ব, নানারকম জলজশাক।

তরকারি ও টাটকা ফল দেখে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হল—একটা দোকান থেকে আমরা কিছু কমলালেবু ওআপেল কিনলাম।

ফুলের বোঝা যেখানে নামাচ্ছে, সেখানে চমৎকারচমৎকার গোলাপ, প্যানসি, লাল কার্নেশন, হলদে আইরিস, সাদা হাইড্রানজিয়া—নানা ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধে কভেন্টগার্ডেনের সে প্রান্ত আমোদিত করেছে।

একটা ছোট আইরিসের তোড়া কিনে আমি ব্রেকফাস্টেরজন্যে বাসায় ফিরে এলাম।

লন্ডনের হইচই, গোলমাল ভালো লাগছিল না।ইংল্যান্ডের শান্ত পল্লীপ্রান্তের জীবনধারার মোহ আমাকেটানছে। শুধু তাই নয়, হাতে আমার আর মোটে কুড়িটিশিলিং অবশিষ্ট আছে—কাজ খুঁজে না নিলে আর চলবেনা।লন্ডনের যা ভয়ানক খরচ, তাতে কুড়ি শিলিং-এ অর্ধসপ্তাহও চলবে না।

কাজেই দু'একদিনের মধ্যেই লন্ডন ছেড়ে পথে বেরিয়েপড়লাম। সকলে পথে আমার দিকে চায়—আমার মতোপোশাক পরে না কোনো ইংরেজ।

লন্ডন আর ছাড়াতে পারিনে—চলেছে তো চলেছে, এরআর শেষ নেই। লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডের অর্ধেক রাস্তাপর্যন্ত শহর সঙ্গেই চলেছে—সেই ভিড়, সেই আলোর সারি, ফুটপাথ, ট্রাম, ঘরবাড়ি। লন্ডন শহর থেকে কুড়ি মাইলদূরবর্তী হাইওয়াইকুম্ব না অতিক্রম করা পর্যন্ত উন্মুক্তপল্লী-অঞ্চল চোখে পড়ে না।

কিন্তু যখন চোখে পড়ল, তখন মনে হল ইংল্যান্ডের এইপল্লীপ্রান্ত প্রথম গ্রীষ্মের দিনে কী মনোমুগ্ধকর ! ফুল, ফলেআলো করে আছে মাঠ, মাঠের বেড়া, লোকের বাড়িরবাগান—মাঠে ফুটেছে বাটারকাপ ও কুইন অ্যানের লেস (একরকম সাদা সাদা বন্যপুষ্প), লোকের বেড়াতে ফুটেছেলতানে গোলাপ।

অক্সফোর্ড থেকে রওনা হলাম স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে।স্ট্র্যাটফোর্ড পৌঁছবার কিছু পূর্বেই আকাশ মেঘে ঘোরালোকরে এল, বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিলে—আমার সঙ্গে একটাহালকা রেনকোট ছিল—খুলে সেটা গায়ে দিলাম। গোধূলিরকিছু পূর্বে অ্যাভন নদীর উপরিস্থিত ক্লপটন ব্রিজ পার হয়েআমি অমর কবির পদচিহ্নপূত স্ট্র্যাটফোর্ডে প্রবেশ করলাম।

গ্রীষ্মকাল, জুন মাস। আমেরিকান ট্যুরিস্টদের ভিড়এস্থানে অত্যন্ত বেশি। স্ট্র্যাটফোর্ডের শান্ত, গম্ভীর আবহাওয়া মাটি করেছে এই চটুলচিত্ত, আমোদপ্রিয় ট্যুরিস্টদের দল।

ভিড়ের ভয়ে আমি খুব সকালে উঠে হেনলি স্ট্রিটের যেবাড়িতে শেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধিআছে, সেই বাড়ির বাগানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।এলিজাবেথের রাজত্বকালের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্মিতবাড়ি, সেকেলে জানালা, বাড়ির সামনের বাগানে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পাখি ডাকছে—পণ্ডিতদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—আমার পক্ষে এই বাড়িই যথেষ্ট।

এখান থেকে গ্রাম্যপথ দিয়ে আমি অ্যান হ্যাথাওয়ের পিতৃগৃহ দেখতে গেলাম নিকটবর্তী শটারি গ্রামে। নির্মলমেঘহীন আকাশ, সুনীল—লন্ডনের ধোঁয়া ও কুয়াশার পরেচোখ ও মন তৃপ্ত হল এখানে এসে।

একটা বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গির্জা। গির্জাটা এমননির্জন স্থানে বনের মধ্যে অবস্থিত—স্কটের 'আইভ্যানহো'তেবর্ণিত ফ্রায়ার ট্রাকের গির্জার কথা মনে পড়ে। একটু দূরে বন ছাড়িয়েই অ্যানের সুন্দর খড়ে ছাওয়া ঘর, এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত যে, মনে হয় অ্যান বুঝি এখনোএখানেই বাস করে—আমি তার সঙ্গেই দেখা করতেচলেছি।

অ্যানের পৈতৃক ফার্ম এখনো আছে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখনো সে ফার্মে চাষবাস চলে—বর্তমান মালিকএক মাইল দূরে অন্য একটি গ্রামে থাকেন। আমার পকেটে মাত্র আট শিলিং সম্বল, হ্যাথাওয়ে ফার্মে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখাই যাক না, সেখানে কোনো কাজ পাওয়া যায় কিনা।

অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। ইংরেজ কৃষকদের যেমন বাড়ি হয় তেমনি ধরনের বাড়ি, আইভিলতায় মণ্ডিত পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি ঢুকতেই একটা তিত্তিরপাখি খাঁচার মধ্যে থেকে কর্কশ স্বরে চিৎকার করেউঠল—একটু দূরে গ্রীষ্মকালের মৌসুমি ফুলের ক্ষেতেরসামনে একটা রূপগর্বিত ময়ূর এদিকে-ওদিকে পায়চারিকরছে।

তিত্তিরের কর্কশ রব শুনে একটি মেয়ে ঘর থেকে বার হয়ে ব্যাপার কী দেখতে এল। তার পিছনে পিছনে এলএকজন মোটামতো লোক।

আমি তাকে বললাম—এখানে কোনো কাজ খালি আছে কি ?

—আমি তো জানিনে, আমার বেলিফকে বরং বলো।ওই তার বাড়ি—আচ্ছা, আমি তোমাকে এইমাত্র অ্যান হ্যাথাওয়ের বাড়িতে দেখলাম না ?

—দেখতে পারো, সেখানে ছিলাম খানিক আগে।

—আমি আর আমার স্ত্রী মোটরে করে এই মাত্র ওই পথদিয়েই আসছিলাম। দু'জনেই তোমাকে দেখেছি ওখানে।তুমি লাঞ্চ খেয়েছ ?

—না।

আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে—এসো, লাঞ্চখাবার সময় হল, আগে লাঞ্চ খেয়ে নাও, তারপর তুমিগিয়ে আমার বেলিফের সঙ্গে দেখা করো।

ফার্মের মালিকের স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা—ওদের ছেলেরবয়স আমার চেয়ে কিছু বেশি, মা ও ছেলে আমাকে সাদরঅভ্যর্থনা করলে। একটি অল্পবয়সি ঝি অনেকগুলি সুস্বাদুস্যান্ডউইচ দিয়ে গেল ও এক বোতল বিয়ার। খাওয়া শেষহলে কৃষকের

ছেলে তার সিগারেটের বাক্স আমার দিকেএগিয়ে দিলে। পয়সার অভাবে আজ দুদিন সিগারেটখাইনি—প্রাণভরে ধূমপান করা গেল।

বেলিফের বাড়িতে গিয়ে দরজায় ঘা দিতেই একজন যুবক বার হয়ে এল—সে-ই বেলিফ। আমার আগমনেরউদ্দেশ্য শুনে বললে—তুমি গরু দুইতে জানো ?

বেপরোয়াভাবে বললাম—খুব জানি।

অথচ জীবনে একবার মাত্র একটা কৃষকের বাড়িতে দেশেওই কাজটা করেছিলাম।

বেলিফ বললে—গোয়াল পরিষ্কার রাখা ও দুধ দোয়ারজন্যে একটা লোক আমাদের দরকার। আমার মনে হচ্ছেতোমার দ্বারাই কাজ চলবে। মাইনে হপ্তায় ত্রিশশিলিং—তার মধ্যে হপ্তায় সতেরো শিলিং-এর মধ্যে আমিআমাদের এক প্রজার বাড়িতে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্তকরে দিতে পারব।

গরুর রাখালি করা কাজটা যদিও আমার মনঃপূতনয়—কিন্তুএদিকেও হাত খালি। নেওয়া যাক কাজটা। হপ্তায় খাওয়া বাদে ১৩ শিলিং বাঁচবে—এক মাস এখানে কাজকরলেই আবার রাস্তায় দু'সপ্তাহ চালিয়ে নেবার মতোঅর্থসঞ্চয় করতে পারব এখন।

বড় রাস্তা পার হয়ে গরিব লোকের ছোট ছোট কুঁড়েঘর।তারই একটির সামনে আমরা এসে দাঁড়ালাম। বাড়িরবাইরেটা শ্রীহীন, জানালায় কাচ বসানো নেই। একটি স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে দিলে। বেলিফের প্রশ্ন শুনেবললে, থাকার জায়গা সে দিতে পারে না—আমি কি তারছেলের সঙ্গে একঘরে শুতে পারব ?তার ছেলেও ওইফার্মেই কাজ করে।

আমি বললাম—তাতে আমার কষ্ট হবে না। তুমি কিনেবে ?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্তত করে বললে—আমার ছেলে যাদেয়—তাই তুমি দিয়ো, সতেরো শিলিং।

বেলিফ পথে আসতে আসতে আমায় বললে—তুমিকোনকাপড় পরে কাজ করবে ?অন্য কোনো পোশাক আছেতোমার ?

এখানেই গোলমাল বাধল। আমার আর কোনো পোশাকনেই, অথচ গরু-সেবার কাজে থাকলে এ কাপড়চোপড়ময়লা হয়ে যাবে। কুড়ি শিলিং-এর কম আর একপ্রস্থ পোশাক হবে না। কুড়ি শিলিং জমাতে জমাতে গ্রীষ্মকালকেটে যাবে। সুতরাং কাজ পেয়েও ছাড়তে হল—আবারআমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নানা গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এসব গ্রামে সবাইগরিব।

ক্রমে আমি ওরস্স্টার শহরে পৌঁছলাম। শহরের পাশেই শেভান নদী ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ। একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, আমি থাকবার ঘর খুঁজছি কিনা। তার ভগ্নীর বাড়িতেএকটা ঘর ভাড়া দেবে।

তারপর সে বললে—আমায় কিছু সাহায্য করো না ?সাত মাস আমার চাকুরি নেই, ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। ওই দেখো আমার স্ত্রী—কাছেই একটা ছোট ঘরেরদরজায় একটি স্ত্রীলোক বসেছিল—তার কোলে একটি শিশুএবং তার চারিধারে মলিন পোশাক পরনে ছেলেমেয়ের দলখেলা করে বেড়াচ্ছে।

—তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তুআমার পকেট খালি। চল বরং তোমাকে বিয়ার খাওয়াই।

একটা মদের দোকানে গিয়ে তাকে বিয়ার খাওয়ালাম। তারপর সে আমাকে তার ভগ্নীর বাড়ি-ঘর দেখাতে নিয়েচলল। ইংল্যান্ডের পাড়াগাঁয়ে সব বাড়িতেই সামনের দিকে একটু ফুলের বাগান থাকে, এমনকি অতি গরিব লোকেরবাড়িতেও। বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটিপরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা মেয়ে এসে দোরে দাঁড়াল।সে তার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে—ও, তুমি ?খুব সময়ে এসে পড়েছ। আমরা সবে চা খেতেযাচ্ছি—চায়ের সময় আজ একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত ভালোই আছে। সঙ্গে এটি কে ?

—উনি একটা ঘর ভাড়া চান। তোমার তো একটা ঘর আছে, না ?

—থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে—

তারপর মেয়েটি আমার দিকে ফিরে বললে—এসেঘরের মধ্যে বসো। উঃ, তুমি যে লম্বা !

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসেছি, মেয়েটি হাত দুটোউপরের দিকে তুলে আশ্চর্য হবার সুরে বললে—উঃ, লম্বা বটে ! তোমাকে শুতে দেওয়ার মতো খাট আমার বাড়িতে কোথায় ?

আমি বললাম—চলো দেখি কিরকম খাট তোমার আছে ?

মেয়েটি আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরটিতে বেশহাওয়া আসে, আর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরে দু'খানাখাট—একটাতে মেয়েটির ছোট ভাই থাকে—সে নিকটবর্তীকারখানায় কাজ করে। আর একটা ঘর আছে পাশে, মেয়েটিবললে, সে ঘরে সে নিজে, তার ছোট মেয়ে এবং তারবোন থাকে।

—বেশ, ভাড়া কত ?

—যদি এখানে তুমি থাকো, থাকা আর খাওয়ার জন্যেতুমি দৈনিক চার শিলিং দিয়ো।

বেশ সস্তা বলেই মনে হল—আমি মেয়েটির প্রতি আরোকৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, যখন সে অগ্রিম কিছু টাকা চাইলে নাভাড়া বাবদ। চাইলে দিতে পারতাম না।

আমরা আবার বাইরে ফিরে গেলে মেয়েটি বললে—তুমি এক পেয়ালা চা খাবে কি ?

—যদি তৈরি থাকে দিতে পারো, কিন্তু চা করার কষ্টেরমধ্যে যেয়ো না।

—চা করার কষ্ট আর কি ?তুমি বিস্কুট আর চিজ পছন্দকরো ?

একটু পরে মেয়েটি একটা প্লেটে খানকতক ক্র্যাকার ওখুব খানিকটা চিজ নিয়ে এল। ইংরেজরা দিনে তিনবারখায়—ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার—এ ছাড়া বিকেলে চাখায়, রাত আটটার সময় আর একবার চা খায়, একে এরাবলে high tea।

পরদিন ওদের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বুঝলাম ওরা ভালোই খেতে দেয়। খাওয়ার পরে হাই স্ট্রিট বেয়ে চাকরি খুঁজতে বার হলাম। যতগুলো হোটেল ছিল কাছাকাছি, তাদের একটাতেও কোনো কাজ খালি নেই। একটাহোটেলের কর্ত্রী স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটি আমায় দেখে হেসেউঠে বললে—কাজ খুঁজতে এসেছ ?তোমার চাকরির দরকারকি ?তুমি দেখছি আর একজন পাগলা আমেরিকান—বোধহয়তুমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাজি ফেলেছ যে, তুমি এইবাজারেও চাকরি জোগাড় করতে পারো কিনা এইনিয়ে—ঠিক নয় কি, সত্য কথা বলো তো ?

স্ত্রীলোকটির কথা শুনে আমার কৌতুক হল, রাগও হল।বললাম—কে বললে আমি অস্ট্রেলিয়ান নই ?আর সত্যিই কাজ খুঁজছি না ?

সে একটু নরম হয়ে বললে—আমি ভেবেছিলাম তুমিআমেরিকান। তা এখানে কোনো কাজ খালি নেই।

এ দেশের পাড়াগাঁয়ে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে যে, প্রত্যেক আমেরিকানই টাকার কুমির। তাদের আর চাকরিকরে খেতে হয় না। আমার স্বদেশ থেকে ট্যুরিস্ট দল এসেএদের মনে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। তাই হোটেল-কর্ত্রীরভুল ভেঙে দেবার জন্যে বললাম—তুমি সত্যিই আন্দাজ করেছ, আমি আমেরিকানই বটে, কিন্তু আমার পকেটে টাকাঝমঝম করছে না। আমি নিজের খরচে কাজ করে চালিয়েপায়ে হেঁটে সারা ইংল্যান্ড বেড়াব মতলব করেছি।

হোটেল-কর্ত্রী বললে—কাজকর্ম এখানে পাওয়া যাবেনা।তোমাকে বন্ধুর মতো বলছি।

সেখান থেকে বার হয়ে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট, মদেরদোকান খুঁজলাম—সর্বত্র এক কথা—চাকুরি কোথাও খালি নেই। অনেক কারখানা থেকে লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে—নতুনলোক নেওয়া তো দূরের কথা। এতক্ষণ পরে মনে হলহ্যাথাওয়ে ফার্মের চাকুরিটা না নিয়ে কী অন্যায় কাজইকরেছি।

পরদিন আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম—ওয়েলসের বনাকীর্ণ পথে। আমার সামনে বড় পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়েরঢালুতে হিদারের বন, আর কিছুদিন পরে আগুনের মতোরাঙা ছোট ছোট ফুল ফুটে পাহাড়ের ঢালুতে আগুনলাগিয়ে দেবে। একজন মেষপালক ভেড়া চরিয়ে ফিরছে, সে আকাশে উড়ন্ত একটা সিন্ধু-শকুন দেখিয়ে বললে—ঝড়বৃষ্টি আসবে, পাখিটা কত নীচুতে উড়ছে দেখছনা ?এই বেলা কোথাও আশ্রয় নাও।

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি নামল, কিন্তু বাতাস ছিল না।বৃষ্টিতে ভিজেই পথ চলেছি, আশ্রয় নেবার জায়গা নেই।বারো-তোরো মাইলের মধ্যে একখানা মোটরগাড়িও চোখেপড়ল না। তারপর অন্ধকার হয়ে এল, বৃষ্টি ও অন্ধকারেরমধ্যে আমি রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যে যাচ্ছি, কিছুই ঠিক করতে পারি না,—মহা বিপদে পড়ে গেলাম।আমার সামনে শুধু তৃণাবৃত প্রান্তর ও ছোটপাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড়।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটাবাড়ি দেখা গেল। আনন্দে ও আগ্রহে সেদিকে চললাম, কিন্তুবাড়িটার খুব কাছে এসে মনে হল বাড়িটা জনহীন, পরিত্যক্ত। তবুও দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। আমার অদৃষ্টভালো, একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলে। আমি বললাম—তুমি রাত্রে আমায় একটু জায়গা দিতে পারো ?আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

স্ত্রীলোকটি বললে—অসম্ভব, আমাদেরই জায়গা হয় না।

আমি যথাসম্ভব সুমিষ্ট স্বরে বললাম—কিন্তু এক পেয়ালাচা তুমি অবশ্য আমায় দেবে।

—আমরা বড় গরিব, শুধু তোমাকে প্লেন চা দিতে পারি।

ঘরে ঢুকে আমি আগুনের কাছে বসলাম। একটু পরেঘরে একজন ষণ্ডামার্কা গোছের লোক ঢুকে আমার দিকেকটমট দৃষ্টিতে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসাকরলে, কে এ ?

স্ত্রীলোকটি যেন একটু ভয়ের সুরে ইতস্তত করে আমার ব্যাপার যা জানে বললে। লোকটা তখন নরম সুরে বললে—এমন দিনে রাস্তায় বেরুতে আছে ! আমাদেরএখানে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না রাত্রে।আর একটিমাত্র ঘর আছে, তাতে আমার মেয়ে শোয়। মাইল তিনেক দূরে একটা ফার্ম আছে, সেখানে যাও।

স্ত্রীলোকটি চা নিয়ে এল—চায়ের সঙ্গে রুটি, মাখন ওজ্যাম। সব জিনিস টাটকা, দিয়েছেও প্রচুর পরিমাণে। খেয়েসারাদিনের পথ হাঁটার কষ্ট দূর হল। চা খাওয়া শেষ করেবললাম—কত দাম দিতে হবে ?

স্ত্রীলোকটি বললে—এক শিলিং।

আমি স্ত্রীলোকটির হাতে একটা শিলিং দিলাম—সে ওরমেয়েকে ডাকলে—মেয়েটির পরনে চেকের গাউন, বয়সঅল্প, একটু লাজুক। তার মা তারই হাতে শিলিংটা দিলে। শিলিং পেয়ে মেয়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—কতকাল বোধহয় পয়সা হাতে পায়নি।

বাইরে ঘোর অন্ধকার—বাতাস জোরে বইছে—ওদেরবাড়ি থেকে বার হয়ে আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়েলিও-মিনিস্টারের দিকে রওনা হলাম।

মাইক্রোনেসিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চলে

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জকে মাইক্রোনেসিয়া নামে অভিহিত করা হয়। মাইক্রোনেসিয়ায় এমন অনেকদ্বীপ আছে, যাহাতে ইহার পূর্বে কোনো ইউরোপীয়ানপদার্পণ করেন নাই। লিগ অব নেশনস্ হইতে অনেকগুলি দ্বীপের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য জাপানকে ক্ষমতা দেওয়াহইয়াছে এবং অনেকের মতে জাপান এই অঞ্চলেরণতরীবহরের একটি কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছে।মেজর বড্‌লের বিবরণ হইতে মাইক্রোনেসিয়া-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ভ্রমণকাহিনী উদ্ধৃত করা গেল :

"ভ্রমণের সুবিধা আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এইশতাব্দীর প্রথমে যে সকল স্থান প্রায় অজ্ঞাত ছিল, বর্তমানেসে সকল স্থানে বড় বড় 'লাইনার' যাতায়াত শুরু করিয়াছেএবং ওই সকল স্থানের লোকের চোখে শ্বেতকায় মানুষেরাএতই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে অনেক স্থানেই তাহাদেরআগমন নূতন ঘটনা বলিয়া আর গণ্য হয় না।

"আমি চার বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এবং সর্বত্রই এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। ইউরোপীয়ানেরা যায় নাই এরূপ জায়গা তো বড় একটা দেখি না। মুক্তার ব্যবসায়ী, নারিকেলের শুষ্ক শাঁসেররপ্তানিকারক, কফি-চাষি, সিনেমার দল প্রায় সর্বত্রইগিয়াছে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই দুনিয়ায়। কাজেই চারবৎসর পরে যখন সত্যই এমন দেশের সন্ধান পাইলাম, যাহার কথা টমাস কুকের ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে উল্লিখিতনাই, তখন মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, সে অঞ্চলে একবার যাইতেই হইবে।

“কেন এই অঞ্চলে লোক যায় নাই তাহার কারণ আছে।বড় বড় জাহাজের লাইন হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরেঅবস্থিত, নিকটতম বন্দর ইয়োকোহামা দু’হাজার মাইল দূরে। তাছাড়া এই দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলি বহুবিস্তৃতমহাসমুদ্রের মধ্যে এরূপভাবে দূরে দূরে অবস্থিত যে ইহারপূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব প্রায় দুই হাজারচারশো মাইল।

“জাপানি ছোট ছোট মালবাহী জাহাজ ব্যতীত এই অঞ্চলে যাইবার অন্য কোনো উপায় নাই। তাও তারা কখনযাইবে না যাইবে, কেহ বলিতে পারে না, কারণ তারাযাইবে তাদের সুবিধামতো, ভ্রমণকারীর সুবিধামতো নয়। মালবাহী জাপানি জাহাজে আরোহী হওয়া যে কত সুখ, যিনি একবার ইহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ নাকরিয়াছেন, তিনি কিছু বুঝিবেন না। এসব ছাড়া আছেসর্বজনভীতিপ্রদ টাইফুন—প্রশান্ত মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্করঘূর্ণিবাত্যা।

“আমার বন্ধু ওয়াল্টার হ্যারিস আমাকে এই দ্বীপপুঞ্জদেখিতে পরামর্শ দেন। জাপানি অধিকারভুক্ত হওয়ার পরেতিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি এখানে আসিয়াছিলেন এবং বোধহয় আমিই প্রথম ইউরোপীয়ান, যে এই ১৪০০ মাইলব্যাপী দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকটি দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছি। ইউরোপ বা সিনেমাতে যাহা সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা প্রধানত ডাচ-ইন্ডিজ দ্বীপগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কল্যাণে এসব দিকেএখন বড় বড় লাইনের জাহাজ অনবরত যাতায়াত করেএবং দেশীয় শিল্পদ্রব্য বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়—তাহারঅধিকাংশই ভ্রমণকারীদের মধ্যেই বেচিবার উদ্দেশ্যেজাপানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ‘কিউরিও’ বেচাকেনা এখনএকটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

“যখন আমাদের ছোট জাপানি জাহাজ ক্যারোলিনদ্বীপপুঞ্জের অদূরে নোঙর করিল এবং স্টিমার হইতে নামিয়ালঞ্চে করিয়া আমরা তীরের অভিমুখে রওনা হইলাম, তখনই দেখি জেটিতে দস্তুরমতো ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তাহারা পূর্বেই জাপানি কোয়ারান্টাইন অফিসারের নিকট শুনিয়াছে যে এই জাহাজে একজন শ্বেতকায় লোক আছে এবং সে তীরে নামিতেছে। অনেকে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভেলা বা দেশি নৌকায় চাপিয়া আমাদের জাহাজেরকাছে আসিয়া কৌতূহলদৃষ্টিতে জাহাজের ডেক নিরীক্ষণকরিতেছে, শ্বেতকায় লোকটা যদি চোখে পড়ে !

“প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দেশি শিল্পদ্রব্য বা ‘কিউরিও’ এখানে পাওয়া যায় না। ওসব জিনিসের ব্যবসায় যে চলিতে পারে, তা এই সকল কৃষ্ণকায় লোকগুলির নিকটঅজ্ঞাত। সভ্যতার হাওয়া এখনো ইহাদিগকে নষ্ট করে নাই। ক্যারোলিন দ্বীপে কোনো জিনিসের কোনো ধরাবাঁধা দামআছে বলিয়া মনে হইল না, কারণ এখানে মুদ্রার প্রচলন নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত এই সব সরল মানুষমুদ্রার মূল্য আদৌ বুঝে না। তুমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগলকিনিতে চাও, ছাগলের মালিককে একবাক্স সিগারেট দিয়াছাগলটি লও, অভাবে একখানা সাবান কিংবা একখানাছুরি।

“তীরের নিকটেই একটা জাপানি দোকান। অনেকক্ষণবসিয়া বসিয়া দোকানে মজা দেখিলাম। চামোরো জাতির মেয়ে-পুরুষ জিনিস কিনিতে আসিয়াছে—সঙ্গে কেহআনিয়াছে কলার পাতে মোড়া কয়েকটি ডিম, কেহ একঝুড়ি পাকা পেঁপে, কেহবা নাকে দড়ি বাঁধিয়া আনিয়াছে একটি শূকরের বাচ্চা। এগুলির পরিবর্তে তাহারা দোকান হইতেলইয়া যাইতেছে তামাক, রঙিন কাপড়ের ছিট কিংবাচকোলেট বা লজেঞ্চুস।

“ইয়োকোহামা ছাড়াইয়া এ পথে আসিতে প্রথম বন্দর পড়ে সাইপান, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। জাপানের খুবইনিকটবর্তী বলিয়া এস্থানের লোকে অপেক্ষাকৃত সভ্য ওচতুর হইয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সেদিক হইতে সাইপানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। এখানকার বড় বড় আখেরক্ষেতগুলি সমুদ্রবক্ষ হইতেই চোখে পড়ে। জাপানিরা খুবআখের চাষ শুরু করিয়াছে এখানে, এমনকি আখের গুড়হইতে হুইস্কি চোলাই করিবার একটি কারখানাও খুলিয়াছে।

“আখের গুড় হইতে হুইস্কি, কেহ কখনো শুনিয়াছে কি?কিন্তু জাপানিরাহটিবার পাত্র নয়। হুইস্কির বোতলগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের হুইস্কির বোতলেরইমতো—তার গায়ে লেবেল আঁটা আছে—“খাঁটি পুরাতনস্কচ হুইস্কি, সাইপানে প্রস্তুত”—এবং সত্তর হাজার কোয়ার্টএই হুইস্কি প্রতি বৎসর এখান হইতে টোকিওতে রপ্তানিকরা হয়। কারখানার ম্যানেজার আমাকে কারখানার সর্বত্র দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন এবং একটু গর্বের সুরে বলিলেন যে, আগামী বৎসরে তিনি ওই ঝোলাগুড় হইতে ‘পোর্ট ওয়াইন’ চোলাই করিবার মতলব করিতেছেন এবং আশা করেন, ইহাতে কৃতকার্যও হইবেন।

“সাইপান ছাড়িয়া আমরা খাড়া পূর্বমুখে চলিলাম, তিনদিনের মধ্যে ডাঙা চোখে পড়িল না, শুধু জল আর জল। বাণিজ্যবায়ু প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া প্রতিপদে আমাদিগকেবাধাপ্রদান করিতেছিল। অবশেষে একদিন আমরা একটিঅপরিসর খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া প্রবাল বাঁধের মধ্যবর্তী স্থিরসমুদ্রে নোঙর করিলাম। এই বন্দরের নাম ট্রাক।

“সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জের অন্য সবগুলির মতো ট্রাকেরও এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্য আছে, যা ঠিকমতো বর্ণনাকরিতে পারা যায় না, অথচ তা প্রকাশ না করিতে পারিলেমনকে পীড়া দেয়। জাপানের শাসনাধীনে আসার দরুনএখানে একটা বড় উপকার হইয়াছে এই যে, কোনোপ্রকারের ট্রপিক্যাল রোগ এখানে নাই।এমনকি ট্রপিকসেরঅতি সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়াও না। ম্যালেরিয়ারবীজবাহী মশা এখানে নাই।

“কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হাওয়াই ও টাহিটি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের যে দুর্দশা শুরু হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়াইও টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের মতো ইহারা মরিয়া উজাড় হইয়া এখনো যায় নাই বটে, কিন্তু চামোরো ও কানোকাজাতিদের মধ্যে বর্তমানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশি দেখা যাইতেছে।

“ট্রাকের একটি গৌরব করিবার বিষয় এই যে, দ্বীপটিটাইফুনের জন্মস্থান। টাইফুন বা ঘূর্ণিঝড় অনেক সময় পাঁচশোমাইল ব্যাস লইয়া বহিতে থাকে এবং বৎসরে কোনোকোনো ঋতুতে উত্তরপ্রশান্ত মহাসাগরে প্রলয় বাধাইয়াতোলে। কিন্তু ট্রাক টাইফুনের জন্মস্থান হইলেও বায়ুমণ্ডল এখানে সব সময়ই প্রশান্ত। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া দূরেরতালিবনের সহস্র শাখার মধ্যে বাতাসের গতিবিধি লক্ষ্যকরিতেছিলাম। বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতেছে বটে, এখনোকচি শিশুর মতোই প্রবাল সরোবরে ভেলাদের দোলদিতেছে, তাল-নারিকেলের পত্রপুঞ্জ নাড়িয়া খেলাকরিতেছে...

“...কিন্তু এখান হইতে একশো মাইল পশ্চিমে যখন গিয়াপড়িবে, তখন ইহার শৈশব চলিয়া যাইবে, তখন ইহারসম্মুখস্থ জেলে-ডিঙিগুলি ব্যস্তসমস্তভাবে আশ্রয় অভিমুখেঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিবে। আরো একশো মাইল দূরে গেলে, তখন বেতার-স্টেশন হইতে সকল জাহাজকে ঝড়ের গতিসম্বন্ধে সতর্ক করিতে থাকিবে। বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরাঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের নারিকেল পাতার কুটিরে মাথাগুঁজিয়া ভয়ে কাঁপিবে এবং বড় বড় যাত্রীজাহাজ পর্বতপ্রমাণঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে।

“টাইফুন কখনো একদিকে ছুটে না। ট্রাক হইতেপশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো ফিলিপাইনে শুধু খুবঝড়বৃষ্টির উপর দিয়াই গেল, হংকং-এ আটচল্লিশ ঘণ্টারজন্য জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকিল, কিন্তু হংকং-এর নিকটস্থবন্দর এময়ের (Amoy) সর্বনাশ ঘটিল, অথচ ফরমোসা দ্বীপে শুধু বেতারের মারফত ঝড়ের খবর পৌঁছিল মাত্র।

‘টাইফুনের খামখেয়ালী গতির বিষয় কেহ কিছু বলিতেপারে না ঠিক বটে, কিন্তু টাইফুনের নির্দয় কবলে পড়িলে জাহাজ, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রের কী দুর্দশা ঘটে, তাহা কাহারো জানিতে বাকি নাই। আমি দুইবার প্রকৃতির এই রুদ্রলীলারঅভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, পুনরায় টাইফুনের সম্মুখীনহইবার ইচ্ছা আমার নাই।

“ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোনাপি নামে একটি দ্বীপআছে। তাহাতে দুটি আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। প্রথম, প্রায়দু’হাজার ফুট উচ্চ একটি পর্বত, এ অঞ্চলের প্রায় কোনোদ্বীপেই এত উচ্চ পর্বত নাই, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে একটিবহু প্রাচীন যুগের দুর্গ। এই দুর্গ কাহারা নির্মাণ করিয়াছিলতাহা কেহ জানে না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাহা এই দ্বীপেরঅধিবাসীদের দ্বারা নির্মিত নয়।

“এই প্রাচীন কীর্তি সম্বন্ধে নানারূপ কৌতূহলপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে কোনো কোনো অতিবৃদ্ধ লোক নাকি ইহার গোপন তত্ত্ব অবগত আছে, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস বিদেশিদের কাছে তাহা প্রকাশ করিতেনাই। একজন জাপানি স্কুলমাস্টারের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, একজন বৃদ্ধ লোক তাঁহারনির্বন্ধাতিশয্যে ভুলিয়া গুপ্ততথ্যটি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বলিবার পূর্বেই বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যায়। সেই হইতে এই সংস্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে আরোবদ্ধমূল হইয়াছে।

“এই দুর্গের ধ্বংসস্তূপ প্রায় পাঁচ বর্গমাইল জুড়িয়া অবস্থিত। বড় বড় চৌরস করিয়া কর্তিত প্রস্তরখণ্ডে ইহানির্মিত। ত্রিশ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থান হইতে যে এইসকল প্রস্তর আনীত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়াগিয়াছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, দুর্গটি যেন মহাসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। আসলে কতগুলি অতি ক্ষুদ্রকায় দ্বীপেরউপর বাড়িগুলি নির্মিত। বড় বড় খাল দ্বারা সেগুলিপরস্পরসংযুক্ত। জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। এক সময়এই প্রাসাদে বড় বড় কক্ষ ছিল এবং জল হইতে প্রাসাদেউঠিবার সুবৃহৎ সোপানাবলির ধ্বংসাবশেষ এখনো দৃষ্ট হয়।দুর্গের প্রাচীর তিন-চার ফুট পুরু, এবং ক্রমশ পিছনদিকেঢালু। পিকিং শহরে এই ধরনের গাঁথুনি দেখা যায়।

“সমুদ্রের ধারে একটি প্রাচীনকালের পোতাশ্রয়েরধ্বংসাবশেষ আছে। এক সময় পোতাশ্রয়টি খুব গভীরছিল বলিয়া বোধহয়, বড় বড় জাহাজ আশ্রয় গ্রহণ করিত।দুর্গের বাকি অংশ ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে আবৃত হইয়াগিয়াছে, কিন্তু গাঁথুনি এত মজবুত যে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলওতাহাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই।

“সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জের সহিত যাহারা পরিচিত, ক্যারোলিন দ্বীপে এরূপ একটি প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্বেরবিবরণ তাহাদের নিকট অবান্তর বলিয়া মনে হইবে। আমিওযখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন বিশ্বাস করি নাই—দিনেরআলোয় না দেখা পর্যন্ত।

“এশিয়া মহাদেশের কোনো স্থানে প্রাচীন নগর অবস্থিতহইলে তাহা বিস্ময়ের কারণ হয় না, কারণ অনেক সময়েইতাহার একটা ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে। জাভার প্রসিদ্ধবৌদ্ধকীর্তি বুরোবদর দীর্ঘ নয় শতাব্দীকাল অরণ্যাবৃত ছিল, কিন্তু যখন তাহা আবিষ্কৃত হইল, তখন সেটাকে ভয়ানক আশ্চর্য ঘটনা কেহ বলে নাই, বুরোবদরের উৎপত্তি ও তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে গিয়া সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

“কিন্তু সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জে, যেখানকার অধিবাসীরা আবহমান কাল ধরিয়া নারিকেল পাতা ছাওয়া কুটিরে বাস করিয়া আসিতেছে, এত বড় প্রাসাদ-দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়া সত্যই বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। এই দুর্গ ও পোতাশ্রয় নির্মাণে যে শ্রেণির স্থাপত্যবিজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয়প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্ধনগ্ন স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহারধারণাও অসম্ভব।

“ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় নাবিকেরা তাহাদেরভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এই রহস্যাবৃত প্রবালদুর্গের উল্লেখকরিয়াছে এবং ইহা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে যেস্থানীয় অধিবাসীরা নিতান্ত বর্বর, তাহাদের মধ্যে অনেকে নরমাংসভোজী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাহাদের অবস্থাএখন অপেক্ষা ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ কিছু উন্নত ছিলনা।এই দুর্গের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে আমাদের আরো হয়তো অনেকশত বৎসর পিছাইয়া যাইতে হইবে। এশিয়াহইতে আগত কোনো সভ্যজাতির কথা ভাবিতে হইবে, যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ছিল, যাহারা বড় বড় জাহাজনির্মাণ করিতে ও মহাসমুদ্রের পথে চালনা করিতে জানিত।

“গভীর রহস্যের অনুভূতি লইয়া এই অরণ্যাবৃত ধ্বংস্তূপপরিত্যাগ করিলাম। কেহ কোনোদিন এ রহস্যের সমাধানকরিতে পারিবে কিনা কে জানে !

“মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জা সুইট নামে একটা ছোট দ্বীপে আমাদের জাহাজ লাগিল। স্টিভেনসনের উপন্যাস ওভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে ধরনের প্রবালদ্বীপের বর্ণনা আছে, জাসুইট সেই শ্রেণীর দ্বীপ। প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিধি ব্যাপিয়াপ্রবালের একটি বাঁধ, জল হইতে তাহার উচ্চতা তিন ফুটের বেশি নয়। নারিকেল গাছ ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষলতা সেখানে জন্মে না, অন্তত আমাদের চোখে পড়ে নাই। সমুদ্রের জল এত স্বচ্ছ যে, গভীর জলের তলায় সন্তরণশীলরামধনুকের মতো বিচিত্রবর্ণের মাছের ঝাঁক স্পষ্ট দেখা যায়।

“এখানে বড় বড় সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলা দেখিলাম।বড়গুলিতে ছোট ছোট ছেলের স্নানের টব হইতে পারে।সমুদ্রের তীরে জোয়ার নামিয়া গেলে এইসব ঝিনুক ইতস্তত ছড়াইয়া থাকে, ছোট ছোট ঝিনুকও অনেক, কত বিচিত্রতাদের রং, ঢেউয়ের গর্জন ও তীরস্থ নারিকেলশাখার মধ্যেবাণিজ্যবায়ুর যাওয়া-আসা—সবসুদ্ধ মিলিয়া জা সুইটের সমুদ্রোপকূল যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হয়। আমাদেরজাহাজ ডাঙার কাছেই নোঙর ফেলিয়াছিল। চাঁদের আলো পড়িয়াছিল প্রবাল সাগরের জলে, আমরা ডেকে বসিয়ানাচগান করিতেছিলাম, জাহাজের কাপ্তেন মাজং খেলায়মত্ত, যেন জীবনে কাহারো কোনো দায়িত্ব নাই, বন্ধন নাই।

“মিশনারিরা এই দেশকে সভ্য করিতে ও পশ্চিমের রীতিনীতি অনুকরণ করাইতে বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু বিভিন্নসম্প্রদায়ের মিশনারিদের পরস্পর মনের মিল না থাকাতেসে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক মিশনারিদের মধ্যে এত বিবাদ যে কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। অথচ শত শতবর্গমাইল পরিমিত স্থানে দশ-বারোটির বেশি পাদরি নাই।আমার মনে হয়, ভালো না করিতে পারিলেও ইহারা অনিষ্ট যথেষ্ট করিতেছে। ইতিমধ্যে অনেক স্থানে মেয়েদের সুন্দরঘাসের পোশাক পরার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। পুরুষেরাওদেহে চিত্র-বিচিত্র উল্কি কাটে না। সৌভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে মিশনারিদের এখনো শুভাগমন হয়নাই। প্রস্তরযুগের রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ তথায় দিব্যচলিতেছে।

“যদি কেহ সাউথ-সি অঞ্চলের এই সব মায়াপুরীতেবেড়াইতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিয়া রাখি যে, ইয়োকোহামা বন্দর হইতে বাহির হইয়াদশ হাজার মাইল ভ্রমণের ব্যাপারে আমার ব্যয় হইয়াছিলমাত্র পঁচিশ পাউন্ড। জাহাজভাড়া ও খাইখরচ এতই সস্তা।”

এশিয়ার নদীপথে

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এশিয়ার বড় বড়নদীপথগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মি.জোসেফরকের নেতৃত্বে যে দলটি প্রেরণ করেন, তাহাদের লিখিতবিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম ইউনান প্রদেশে ও দক্ষিণ-পূর্বতিব্বতের জারুং পার্বত্য অঞ্চলে যে দৃশ্যাবলি দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে উহার তুলনা কোথায় মিলিবে ?

চীনদেশের বিরাট নদীগুলির আশপাশে যে সকল পর্বতমালা বিদ্যমান, সেগুলি আরোহণ করিবার সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, বহু প্রাচীনকালে এই অঞ্চল সমগ্র মধ্যএশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিগন্তব্যাপী এক বিরাট মালভূমির অন্তর্গত ছিল। ওই উচ্চ মালভূমিরবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কালে কালে বড় বড় নদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নদী পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির অন্যতম।

এই নদীগুলি আদিম যুগের মালভূমিকে শুধু যে একবিশাল পর্বতময় অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে তাহা নয়, বড় বড় গভীর উপত্যকা ও অন্ধকারময় পাষাণমণ্ডিত নদীখাতেরও সৃষ্টি করিয়াছে। এমন অনেক নদীখাত আছে, যাহার মধ্যে মানুষে কোনোদিন প্রবেশ করে নাই।

বিশ হাজার ফুট পর্বতমালার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াস্যালউইন, মেকং ও ইয়াংসি নদী সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে।এই নদীগুলি পশ্চিম চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে প্রায় সমান্তরালভাবে বহিয়া যাইতেছে এবং এক স্থানে পরস্পরের ৪৮ মাইল মাত্র ব্যবধানে আসিলেও ইহাদেরপরস্পরের মোহনা পরস্পর হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

যখন আমরা আমেরিকা হইতে যাত্রা করি, তখন এই অদ্ভুত নদীখাতগুলির ফটো তুলিয়া আনিব, ইহাই ছিল আমার ইউনান অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই তিনটি নদীই তিব্বতের মালভূমি হইতে বহির্গতবটে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তিস্থান এখনো অজ্ঞাত। স্যালউইনতিব্বত দিয়া বহিয়া আসিয়া বর্মা শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলেপ্রবেশ করিয়াছে এবং মৌলমিনের নিকট ভারত মহাসাগরেপড়িতেছে। মেকং নদী অনেকদূর পর্যন্ত স্যালউইনের সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়া আসিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমা নির্দেশ করিতেছে এবং সাইগনেরনিকট দক্ষিণ-চীনসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম নদী ইয়াংসি কিছুদূর পর্যন্ত মেকংনদীর সহিত সমান্তরালভাবে বহিয়া আসিয়া হঠাৎ বাঁকিয়াউত্তরাভিমুখী হইয়াছে এবং সেই স্থান হইতে পুনরায়দক্ষিণমুখে ফিরিয়া আসিতে একটা খুব জড়িপট্টির সৃষ্টিকরিয়া ও দৈর্ঘ্য আরো কয়েকশত মাইল বাড়াইয়া অবশেষেউত্তর-পূর্বাভিমুখী হইয়া সাংহাইয়ের নিকট প্রশান্তমহাসাগরে পড়িতেছে।

ইয়াংসি নদীর বিষয় এখনো বেশি কিছু জানা যায় নাই। মোহনা হইতে ইহার প্রায় ১৫০০ মাইল পর্যন্ত ছোট নৌকায়যাওয়া যায়। আরো ছোট নৌকায় তারপর পূর্ব-ইউনানপ্রদেশের মাচাং পর্যন্ত যাওয়া চলে। এই নদী সর্বসুদ্ধ প্রায় ৩০০০ মাইল লম্বা এবং ইহার বহু অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইটাং প্রদেশে ইয়াংসি নদী পর্বত কাটিয়া যেখানে নিজেররাস্তা করিয়া লইয়াছে, আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কৃপায় তাহা এখন বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ইটাং নদীখাত অপেক্ষাও লিকিয়াং প্রদেশে ইয়াংসি যে খাত নির্মাণ করিয়াছে, তাহাআরো অদ্ভুত। এই ভীমনদীখাতে পূর্বে মি. বেকো ও ড. হ্যান্ডলম্যাজেটি ছাড়া অন্য কোনো ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কখনো পদার্পণ করেন নাই। বর্তমান লেখক (জোসেফ রক, ইয়াংসি অভিযানের দলপতি) পূর্ববর্তী ভ্রমণকারীদের দ্বারাঅতিক্রান্ত স্থান ছাড়াইয়া আরো উত্তরে গিয়াছিলেন।

এখানে ইয়াংসি নদী দুইধারে যে পাহাড়ের মধ্য দিয়াবহিতেছে, তাহার উপর ক্যাকটাস ছাড়া অন্য কোনোগাছপালা নাই। ক্যাকটাস (ফনীমনসা জাতীয় গাছ) আমেরিকার গাছ কিন্তু ইউনান প্রদেশের সর্বত্র প্রচুর জন্মায়।

যেখানে দুইটি নদী সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, সেখানে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, তাহার তুষারাবৃত শিখররাজির সৌন্দর্য গভীর নদীখাতের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যে অবস্থিত কাকেরসু পর্বতমালা ও তাহার২৪০০০ ফুট উচ্চ মিয়েটজিমু শৃঙ্গের দৃশ্য সর্বাপেক্ষামনোরম।

এই পর্বতমালার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া ও রহস্যাবৃতনদীখাতগুলির ফটো লইবার উদ্দেশ্যে আমি অক্টোবর মাসে নালি গ্রাম হইতে (লিকিয়াং পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত)বহির্গত হইয়া উত্তরমুখে যাত্রা শুরু করি।

আমার সঙ্গে ১৫জন কুলি ও অশ্বতর ইত্যাদি ছিল। বর্ষাকাল তখনো শেষ হয় নাই। পথঘাট কর্দমাক্ত, নদীখরস্রোতা। অশ্বতরের পৃষ্ঠে আমি তিন মাসের উপযুক্তখাদ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া লইলাম। প্রথমদিন বেশিদূর যাইতে না যাইতে এমন বৃষ্টি আসিল যে, টোকে নামের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমাদের তাঁবু ফেলিতে হইল।

আমি গ্রামের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলাম। রাত্রিতে ঘুম হইল না। যেমন মশা, তেমনি উকুন। চীনা কুলিরা দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। পরদিন আমরা লিকিয়াংপর্বতের ১০,০০০ ফুট উচ্চ একটি শাখা অতিক্রম করিলাম।এখানে জঙ্গল একটু বেশি ঘন। শোনা গেল এই পথে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশি।

বেলা দুপুরের সময় আমরা শিবু গ্রামে পৌঁছিলাম।সেদিন সেখানে হাটবার, শিবু গ্রামের মধ্য দিয়া একটি রাস্তাচলিয়া গিয়াছে এবং হাটবার বলিয়া রাস্তাটি স্ত্রী, পুরুষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। চারিধারের পার্বত্যগ্রামগুলি হইতে জাশী, লিসু ও লোলো জাতীয় লোকেরাতরিতরকারি, শূকর, ডিম ইত্যাদি বেচিতে আসিয়াছে।

এই গ্রামের রাস্তার ধারে পাথর কাটিয়া একটি অভিনয়ের স্থান তৈয়ারি করা হইয়াছে। যে ওই স্থানটিতৈয়ারি করিবার জন্য টাকা দিয়াছে, তাহার নাম ও সে কতটাকা দিয়াছে, তাহা একপার্শ্বে একটি প্রস্তরফলকে খোদিতআছে।

ইউনান প্রদেশের রাস্তাগুলি যতই খারাপ হউক, চলিবার সময় তত কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্টের শুরু হয় তখনই যখন কোনো লোকালয়ে প্রবেশ করা যায়। দস্যুসঙ্কুল পার্বত্যস্থানে লোকালয় হইতে দূরে শৈলপাদমূলে অরণ্যের প্রান্তে রাত্রিযাপন বিদেশি ভ্রমণকারীর পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে, কিন্তু গ্রামে ঢুকিলেই জঞ্জাল, ধুলা, মাছি, উকুন, চণ্ডুর কড়াধোঁয়া ও গোলমালের দরুন যে কষ্ট উপস্থিত হয়, দস্যুরহাতে পড়াও তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। চীনা গ্রামের সহিতযাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের এ উক্তির তাৎপর্য বুঝিতেবিলম্ব হইবে।

তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, আমি শিবু গ্রামেরসর্বাপেক্ষা পবিত্র ও পরিষ্কার স্থানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ স্থানীয় মন্দিরে, বুদ্ধমূর্তি যে গৃহে অবস্থিত, সেইগৃহেরই এক পার্শ্বে।

আমার ঘরের পাশেই আস্তাবল, সেখানে মন্দিরের পুরোহিতের অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর বাঁধা। উঠানে এতকাদা যে জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিলে জুতার চামড়ার উপর একপুরু কর্দমের প্রলেপ লাগিয়া যায়। এক পাশে কয়েকটি গ্রাম্যকুকুর বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে। ইয়াংসিনদীর বামতীরের পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা।

পল্লীগ্রামগুলি খুব শান্ত, নদীর দু’ধারে উচ্চ পর্বতশিখরে ঘন মেঘপুঞ্জ খেলা করিতেছে। পথের ধারে একটা খাড়াউত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় একটা বৌদ্ধমন্দির। একটা গ্রামে কেহমারা গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন শোক প্রকাশ করিতেছে, বাড়ির উঠানের বেড়ার গায়ে সারি সারি বাঁশের চটা ও কাগজেরতৈয়ারি মানুষের মূর্তি, সিডান চেয়ার, বাড়ি, নৌকা, কাগজের ঘোড়া ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, এগুলি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে, পরজগতে ইহারা তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে।

নদীর ধার দিয়া যে পথ, তার দুই ধারে খুব ঘন জঙ্গল, তবে বড় গাছের চেয়ে ছোট গাছপালা, ঝোপঝাপই বেশি।এক এক জায়গায় দুই দিক হইতে জঙ্গল আসিয়া পথকেচাপিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক গাছের ডালপালায় অসংখ্যমাকড়সার জাল, বড় বড় হলদে রংয়ের মাকড়সা জালেরকেন্দ্রস্থানে ওত পাতিয়া শিকারের আশায় বসিয়া আছে।

নদীর এক দিকে খুব উঁচু বেলে পাথরের পাহাড়—ঠিকযেন কেহ পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া রাখিয়াছে মনে হয়।পাথরের গায়ে জলের দাগ দেখিয়া বুঝা গেল, বর্ষাকালে অনেকদূর পর্যন্ত জল ওঠে।

পথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। চীন দেশের রাস্তারকখনো সংস্কার করা হয় না। মানুষ পায়ে হাঁটিয়াকোনোক্রমে হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু এসব পথে যানবাহন চলাচল একরূপ অসম্ভব। একটি মন্দিরে আট-দশ বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালক একমাত্র সেবাইত। সে মন্দিরেরদুয়ারে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, হয়তো সে তাহার আট বৎসরের জীবনে কোনোইউরোপীয়কে কখনো দেখে নাই।

পাঁচ দিনের দিন আমরা চু-তি-য়েন্ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম। পথে লিনিয়া হইতে চু-তি-য়েন্ পর্যন্ত ভীষণঅন্ধকারময় বনভূমি, বড় বড় বার্চ ও পপ্‌লার একদিকে, বহুনিম্নে খরস্রোতা ইয়াংসি, অন্যদিকে দুরারোহ পর্বত-প্রাচীর। অশ্বতরের পদস্খলন হইলেই ইয়াংসি অভিযানের ছুটি !

চু-তি-য়েন্ গ্রামে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল।আশ্রয়স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ছোট নালার ধারে একটি পাথরের ঘর পাওয়া গেল। ঢুকিয়া দেখি সেটা গ্রামেরস্কুল-ঘর। একটিমাত্র চীনা বালক বড় বড় চীনা হরফেবোধহয় হস্তলিপি অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু কোনোগুরুমহাশয়কে দেখিলাম না। লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রটির মনোযোগের প্রশংসা না করিয়া উপায় কী?

সেখানেই আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি থামিলে অধ্যবসায়ীছাত্রটি বিদায় লইল। আমরা ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতিলাম। বাতাস চলাচলের কোনো অভাব নাই ঘরে, তবেসে বাতাস জানালা দিয়া আসিতেছে না—আসিতেছে মাথার উপরের ছাদ দিয়া। মেঘভরা আকাশে দু'দশটা যানক্ষত্র উঠিয়াছিল, তাহাও চোখ উপরের দিকে তুলিয়া দেখিলে বেশ দেখা যায়। গ্রামের লোকের স্কুলের প্রতি যেখুব দৃষ্টি আছে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল না।

সন্ধ্যার বাতাসটি অদ্ভুত ধরনের আরামদায়ক, অবশ্যইহাও দেখিতে হইবে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থানটির উচ্চতা৯০০০ ফুট। বৃষ্টি থামিয়া গেল; আকাশে এখন বেশ নক্ষত্রউঠিয়াছে; আমরা পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

পাশেই দুইঘর চীনা পরিবার থাকে, তারা আমাদের জলও কাঠ সরবরাহ করিয়া দিল। তারা এখন তাদের প্রাপ্য অর্থের অংশ লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করিয়াদিল—আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাদের ঝগড়া থামে নাই।

ইয়াংসি ও মেকং নদীর মধ্যবর্তী পর্বতমালার পাইন ওস্প্রুস গাছের অরণ্যের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম। আরোকিছু দূরে গিয়া লিটিশিং পর্বতশ্রেণি, এই পর্বতের উপর দিয়া যে পথ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা ১১০০০ফুট।

বড় বড় গাছের নীচে ঘন বেত-বন, মাঝে মাঝেসমতলভূমিতে জেনসিয়ান ফুল ফুটিয়াছে। পর্বতের হাওয়া যেন নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে আমাদের মধ্যে, কীসুন্দর পাখির ডাক চারিদিকে ! এশিয়ার এই সব অঞ্চলেলোক কেন যে বেড়াইতে আসে না, তাই ভাবি। রেল নাই, মোটর নাই, হোটেলওয়ালাদের উৎপাত নাই, বর্তমানসভ্যতার সর্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বহুদূরে মধ্যএশিয়ার এইঅরণ্য ও পর্বতের নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রাচীন চৈনিকজাতির প্রাণশক্তি যেন কোথায় লুকাইয়া আছে,—আজওযে শক্তি অমর, শত বিপদ-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও যাহাচীনদেশ ও চীনা জাতিকে অটুট রাখিয়া আসিয়াছে এবংভবিষ্যতেও রাখিবে।

বৈকালের দিকে আমরা উই-সি গ্রামে পৌঁছিলাম।সেখানে চারশত ঘর লোকের বাস। মেকং নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের চারিদিকে উঁচু মৃন্ময়প্রাচীর, তার তিনদিকে তিনটি প্রবেশদ্বার। শুনিলাম এইপ্রাচীর বহুকাল পূর্বের তৈয়ারি, দস্যুভয় হইতে নগরেরঅধিবাসীগণের ধনসম্পত্তি নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাগঠিত।

উই-সি গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। আমার পত্র ওপার্সেল সেখান হইতে ওয়াশিংটন ডিসি-তে পাঠাইতে কত ডাকটিকিট লাগিবে, পোস্টমাস্টার তাহার হিসাব করিতেবসিল এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া হিসাবের পরে আমাকেজানাইল অত ডাকটিকিট উই-সি ডাকঘরে নাই। আমিবলিলাম, যতগুলা টিকিট পাওয়া যায়, আঁটিয়া পার্সেল পাঠাইয়া দাও।

চীনদেশের ডাক-ব্যবস্থার সপক্ষে একটু বলিতে চাই যে, আমার পত্র ও পার্সেল ঠিক সময়ে ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়াছিল।

উই-সি পরিত্যাগ করিয়া দশ মাইল হাঁটিবার পরে কা-কাটাং গ্রামে পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির আশ্রয়স্থান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গ্রামেরবাড়িগুলিতে কাদার দেওয়াল, পাতায় ছাওয়া। জানালারবালাই নাই। সেগুলি কি মানুষ-বাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত, তাচেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা শক্ত।

অবশেষে একটা পাহাড়ের ধারে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া ভাবিলাম, সেখানেই আশ্রয় লইব। মন্দিরের মধ্যেঢুকিয়া মনে হইল, এখানে বহুকাল মানুষ প্রবেশ করে নাই, মাকড়সার জালে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ আচ্ছন্ন। ঘরেরসর্বত্র জঞ্জাল।

শীঘ্রই কারণ আবিষ্কার করা গেল। আলো জ্বালিয়া দেখিঘরের এক পাশে একটা গালার তৈয়ারি শবাধার, তার মধ্যে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে।

শোনা গেল, এক বৎসর পূর্বে লোকটির মৃত্যু হয় এবংতার পর হইতে তাহার শব এই মন্দিরে রাখিয়া দেওয়াহইয়াছে, কারণ সমাধিস্থ করিবার শুভদিন এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। নক্ষত্রের ঠিকমতো যোগাযোগঘটিতেছে না।

বলা বাহুল্য, মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্তবায়ুতে আসিতে আমাদের মুহূর্তকালও বিলম্ব হইল না।

এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এসব জায়গায় এত অসুখ-বিসুখ মানুষের কেন যে হয় ! আমাদের আসিবারনাম শুনিয়া দলে দলে রোগী আমাদের সঙ্গে দেখা করিতেও চিকিৎসিত হইতে আসিল। তাহাদের দেখিয়া কষ্ট হয়, কাহারো শরীরে ক্ষত, গোড়ায় উপযুক্ত ঔষধ না পড়াতেপচিয়া উঠিয়াছে, কাহারো দন্তশূল, কাহারো পেটেরপীড়া—আবার কয়েকটি যক্ষ্মারোগীও তাহাদের মধ্যেআছে। এদেশের প্রায় সকলের গলায় ছোট-বড় গলগণ্ড।অনেকের চোখের অসুখ, বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা না হওয়ার দরুন তাহারা প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের নিকট এসব রোগের ঔষধ কোথায় ?আমরাডাক্তার নই বা সঙ্গে চলন্ত দাওয়াইখানা লইয়াও বেড়াইতেছি না। কিন্তু এ কথা তাহারা শোনে না, তাহাদেরবিশ্বাস একদাগ বিলাতি ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেইযতদিনের পুরাতন দুরারোগ্য রোগই হউক না কেন, ঠিকসারিয়া যাইবে। বেচারিদের সরল বিশ্বাস ও অসহায় অবস্থা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল বটে, কিন্তু আমরাসমানই অসহায় এ বিষয়ে। কী করিবার ক্ষমতা আছেআমাদের ?

পরদিন আমরা আর একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। এসবঅঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা। গ্রামের আশপাশের মাঠে, পাহাড়ের ধারে ভুট্টার চাষ খুব।

গ্রামের মণ্ডলের বাড়ি হইতে আমাদের জলযোগেরনিমন্ত্রণ আসিল। আমার ক্যামেরা দেখিয়া মণ্ডল তাহারফটো তুলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে আমি রাজি হইলাম।সে তখনই তাহার স্ত্রীদিগকে ভালো পোশাক আনিতেবলিল। তারপর ময়লা পোশাকের উপর একটা জমকালোরেশমি আলখাল্লা পরিয়া ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ফটো তোলাইবার জন্য বসিল—যেন সে নিজেই চীনসম্রাট !ইয়েচি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা সত্যই এক রাজারবাড়িতে অতিথি হইলাম। এই রাজার নাম লি—রাজা লিইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

১৯০৫ সালে স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্যঅঞ্চলে নূতন গাছপালার সন্ধান করিতে ইংল্যান্ড হইতে একটিবৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়—প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞপণ্ডিত ডা. জর্জ ফরেস্ট ছিলেন ইহার নায়ক।

ডা. ফরেস্ট কী কারণে তিব্বতি লামাদের বিরাগভাজনহন এবং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অভিযানকারীদের আক্রমণকরে ও ফাদার ডুবারনার্ড নামক জনৈক ফরাসি পাদ্রি ও আরো কয়েকটি নাশি লামা ও কুলিকে হত্যা করে। দিনেরপর দিন ধরিয়া তাহারা ডা. ফরেস্টকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল এবং সে সময়ে ধরা পড়িলে ডা. ফরেস্টের মুণ্ড আটুংজিমঠের সিংহদরজা অলঙ্কৃত করিত—সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজালির বন্ধুত্ব ও করুণায় সে যাত্রা ডা. ফরেস্ট বাঁচিয়া যান। রাজা লি এমন এক দুর্গম স্থানে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখেন যেলামার দল কোনো সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষেহতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

রাজা লি এখন বৃদ্ধ, অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু তাঁর চালচলন, এমনকি বসিবার ধরনটি পর্যন্ত আভিজাত্যমণ্ডিত। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহুকাল ধরিয়া এই পর্বত ও অরণ্যে নাশি ও অন্যান্য জাতির উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন—ইরাবতী নদীর তীর পর্যন্ত এক সময়ে এই রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। এমনকি উত্তর-পশ্চিম চীন সীমান্তের দুর্ধর্ষ কুট্‌কু পার্বত্য জাতিপর্যন্ত রাজা লিকে রাজস্ব দেয়।

ইয়েচি ছাড়াইয়া জঙ্গলের পথে ১০/১২ দিন যাইবার পরে স্যালউইন নদী পাওয়া যায়। রাজা লির সহায়তায় আমরা ১৩ জন কুলি সংগ্রহ করিয়া দুর্গম জঙ্গলের পথেস্যালউইন নদীর তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলাম।ভীষণ দুর্গম জঙ্গল, বন্য চেরি, রোডোডেনড্রন বৃক্ষে পূর্ণ, বড় বড় মৌমাছির চাক ডালে ডালে দুলিতেছে—দেখিয়ামনে হইল, ইউরোপীয় তো দূরের কথা, কোনো উপকূলবাসীসভ্য চীনা লোকও কখনো এ অরণ্যের ধারণা পর্যন্ত করিতেপারিবে না।

স্যালউইন নদীর তীরে পৌঁছিয়া আমরা বাহাং ফরাসিমিশনে আশ্রয় লইলাম। ফাদার আঁদ্রে বর্তমানে মিশনের অধ্যক্ষ। তাঁহার মধুর আপ্যায়নে ও আতিথেয়তায় আমাদের পথকষ্ট দূর হইল। ফাদার আঁদ্রে সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে১৯০৫

সালের লামা-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা করিলেন।এই মিশন-বাড়ির প্রত্যেক মানুষটিকে যখন উন্মত্ত লামারাহত্যা করে, কেবল ফাদার জেনস্টিয়ার নামে একজন পাদ্রিরাতারাতি পালাইয়া দূর জঙ্গলের মধ্যে পার্বত্য লিসুজাতিদের গুহার মধ্যে আশ্রয় লওয়াতে বাঁচিয়াগিয়াছিলেন।

ফাদার আঁদ্রে অবশ্য সে-সময় এখানে ছিলেন না, তাঁরবয়স বেশি নয়—কয়েক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন।বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফাদার আঁদ্রে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যুদ্ধকরিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হইলে সংসারের উপর বিরক্তহইয়া এই দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এ বড় দুঃখের জীবন, মে হইতে নভেম্বর পর্যন্তসমস্ত পার্বত্য গিরিবর্ত্ম তুষারে ঢাকিয়া যায়, বহির্জগৎ হইতেকোনো চিঠিপত্র আসে না—তদুপরি আছে প্রতিমুহূর্তেইবিশ্বাসঘাতক অসভ্য জাতিদের দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কা।দুইবার তারা এই মিশন-বাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছে। কী করিয়াকী উদ্দেশ্যে মানুষে এমন স্থানে বাস করে—তরুণ ফাদারআঁদ্রের মনের দুঃখ কী, কে তাহা বলিবে ?

বাইবেল-প্রসিদ্ধ পেট্রা

পেট্রা শহর অতি প্রাচীন। ডেড-সি ও আকাবাউপসাগরের মধ্যবর্তী মরুময় ও পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে এই শহর অবস্থিত। বাইবেলের সময় থেকে এই শহরব্যবসাবাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই শহরের প্রবেশপথ অতি দুর্গম ও সংকীর্ণ পাহাড়ের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে। পেট্রা শহরেবহু প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা কেটেতৈরি করা। বহু প্রাচীনকালের মন্দির এসব। সংখ্যাও বড় কমনয়, এক হাজারের বেশি হবে। ব্যাবিলোনীয়, সিগরীয়, গ্রিক, রোমান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাস্কর্যরীতি মন্দিরের গঠনেপ্রদর্শিত হয়েছে।

বাইবেলের যুগে পূর্বে এখানে গুহাবাসী হোরাইট জাতি বাস করত। পেট্রার অদূরবর্তী শৈলগাত্রে এদের অঙ্কিত চিত্রাবলি এখনো বর্তমান আছে।

প্রাচীনকাল থেকে সার্থবাহদের উষ্ট্রবাহিনী এই পথে যাতায়াত করে। সমগ্র আরব উপদ্বীপই এই সার্থবাহউষ্ট্রবাহিনীর পথ। এই পথে আফ্রিকা, আরব ও ভারতবর্ষেরপণ্যদ্রব্য নীলনদ তীরবর্তী ভূভাগ, প্যালেস্টাইন, ফিনিশিয়া, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস উপত্যকায় আসে। পেট্রা শহরে এসেএইসব পণ্যদ্রব্য জড়ো হয় ও এখান থেকে এগুলি বিভিন্নদিকে প্রেরিত হয়। এই বাণিজ্যদ্রব্যের সুব্যবস্থার জন্যপ্রাচীনকালে রোমানরা এখানে দুটি বড় দুর্গ তৈরি করেছিল।

কিন্তু তারপর বহুকাল এই নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েই রইল। কেন, তার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।

বহুশত বৎসর কেটে গেল। কতকগুলি বর্বর মরুবাসীজাতি এর গুহাগুলিতে বাস করত। তারা আশপাশেরপাহাড়ের উপর মেষপাল চরাত। বেদুইন-দস্যুদলে মিশেএরা মাঝে মাঝে সার্থবাহকদের দ্রব্যাদি লুটপাট করত।

এইভাবে কেটে গেল এক হাজার বছর।

১৮০২ সালে সুইস ভ্রমণকারী লুইস বুকহার্ট বেদুইনশেখের ছদ্মবেশে পেট্রা শহরে প্রবেশ করেন এবং সেখানথেকে ফিরে সভ্য জগতে এর নানা প্রাচীন মন্দির ও সমাধিরবর্ণনা করেন।

বুকহার্টের পর খুব কমসংখ্যক ভ্রমণকারী এখানেএসেছেন। এটা কী করে যে আরবীয়দের একটি তীর্থস্থানহয়ে উঠেছিল, তার কোনো কারণ ইতিহাসে জানা যায় না।আরবীয়েরা কোনো বিধর্মীদের এখানে প্রবেশ করতে দিতেচায় না। গুপ্তভাবে ঢুকলে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল মহাযুদ্ধের পূর্বেও।

এখনো যে কেউ পেট্রা শহরে বিনা উদ্দেশ্যে ঢুকতে পারে না—সশস্ত্র রক্ষীর দল না নিয়ে গেলে অনেক সময় বিপদেরসম্ভাবনা। এখন অবিশ্যি সেখানে ট্যুরিস্টদের থাকবার জন্যভালো ভালো হোটেল তৈরি হয়েছে—কিন্তু ট্যুরিস্টদেরসাধারণ চলাচলের পথের অনেক বাইরে বাইবেলোক্ত এইবিপজ্জনক প্রাচীন নগরীটি অবস্থিত।

পেট্রা শহরে যাবার রেলরাস্তা নেই, ভালো কোনোমোটর রোডও নেই। জেরুজালেম থেকে দুরূহ পার্বত্যপথে একমাস উট কিংবা অশ্বতরের পিঠে গেলে তবে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব। পথে দুর্দান্ত বেদুইন দস্যুর ভয়। ডামাস্কাসথেকে মক্কা পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হয়ে এখন খানিকটা সুবিধা হয়েছে। এই রেলপথের শেষ প্রান্তের স্টেশনেরনাম—মা'আন। পয়সা খরচ করতে পারলে মা'আন থেকে এরোপ্লেনেও পেট্রা যাওয়া যায়।

মা'আন থেকে পেট্রা পর্যন্ত ভালো মোটর রোড তৈরিকরবার চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। কিন্তুবেদুইনরা এতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে রাস্তা তৈরি করবার সাজসরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলে। এ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিতহয়, উভয়পক্ষে বিস্তর লোক মারাও পড়ে। অবশেষে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অর্থবলে ও যন্ত্রবলে বিদ্রোহ দমিত হয় এবংবেদুইন শেখদের সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়।

তবুও সন্ধির একটা প্রধান শর্ত এই যে, মা'আন থেকেপেট্রা পর্যন্ত কোনো স্থায়ী মোটর রোড তৈরি হতে পারবেনা বা কোনো ব্রিটিশ কোম্পানি ব্যবসা হিসাবে এপথেমোটর চালাতে পারবে না।

জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারী সম্প্রতি এই প্রাচীন নগরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে কিছু উদ্ধৃতি করা গেল :

"আমরা জেরুজালেম থেকে মোটরে মা'আন এলাম।

যে পথেই যে আসুক, এ ক্ষুদ্র মৃৎকুটিরবহুল গ্রামে তাকেআসতেই হবে। গ্রামখানির চারিপাশে বাগান ও তরকারিরক্ষেত, মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগানে তাল ও মিষ্ট ডুমুরের গাছ। গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী উদ্যানের বাইরে ধু-ধুবালুময় মরুভূমি সুদূর দিগ্বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে একটি ইংরেজি স্কুল আছে এবং অনেকভ্রমণকারী দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় যে, গ্রামের ছেলেরা বেশইংরাজি বলতে ও বুঝতে পারে।

মা' আন থেকে মোটরে এলজি এসে দু'দিন অপেক্ষা করতে হল। আর মোটরের রাস্তা নেই। ওইখান থেকে বেদুইন কুলি ও অশ্বতর ভাড়া করে যাত্রা করতে হবে।আমাদের আসবার খবর টেলিফোন-যোগে পূর্বেই এলজিপুলিশ স্টেশনে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের লোকের চেষ্টায়কয়েকটি জীর্ণকায় আরব ঘোড়া ও অশ্বতর জোগাড় হল।কুলিও কয়েকটি পাওয়া গেল। মার্ক টোয়েন প্যালেস্টাইনভ্রমণের সময় যে আরবি অশ্বে আরোহণ করেন, তার নামতিনি দিয়েছিলেন 'বা আলবেক্' অর্থাৎ 'অতীত গৌরবেরধ্বংসস্তূপ'। আমাদের ঘোড়া কয়টির পক্ষেও সে নাম চমৎকার খাটে।

এলজি গ্রামে লোকের বাস খুবই কম। এখানকারলোকেরা যাযাবর প্রকৃতির; সাধারণত তারা ছাগ-লোমনির্মিত তাঁবুতে বাস করে এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণউপত্যকায় ও গ্রীষ্মকালে উচ্চ মালভূমিতে উঠে যায়। জল এ অঞ্চলে একমাত্র পাওয়া যায় আইন সুসা নামে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীতে। এই জলে এখানকার কৃষিকর্মের অত্যন্ত সুবিধা হয়। এলজি থেকে আমরা যাত্রা করি দুজন সশস্ত্রবেদুইনরক্ষী নিয়ে। পুলিশ স্টেশনের ওপর ট্রান্সজর্ডানপ্রদেশের পতাকা উড়ছে। বর্তমান সভ্যতা ছেড়ে দু হাজারবছরের প্রাচীন ইতিহাসের পথে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

পথ অনেকটা নেমে গিয়েছে। এত পিচ্ছিল পথেঅশ্বতরই একমাত্র উপযুক্ত বাহন। পথ এসে মিশে গেলওয়াডি মুসা নদীর শুষ্ক খাতে। ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলাম এক বিশাল পর্বতপ্রাচীরের নিম্নে। পেট্রা নগরী যে ঘাস বেলেপাথরের পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এটা তারই পূর্বদিকেরশাখা।

ওয়াডি মুসা নদী ক্রমে গভীর হয়ে এল। আমরা যেনএকটা অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করছি। প্রকৃতিপর্বতপ্রাচীরকে দু'ভাগে ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা করেদিয়েছেন। শীতকালে এ পথে ওয়াডি মুসা নদীর বন্যার জলপ্রবাহিত হয়। পেট্রা শহরকে কিছু দূরে রেখে সেই জলগিয়ে মেশে ওয়াডি-এল-আরবি নামে আর একটা পার্বত্যনদীর সঙ্গে।

পেট্রা শহর চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। শহরের বাইরে একটা নোংরা ও অপকৃষ্ট শহরতলি, গরিব ইহুদি ও আরবীয়গৃহস্থেরা এখানে বাস করে। তাদের ছোট ছোটদালান-পসারে জায়গাটা ভর্তি। এখানেও পাহাড়ের গায়েকেটে তৈরি করা কয়েকটি সমাধিমন্দির আছে। নিকটবর্তীপাহাড়ের বড় বড় পাথরের মধ্যে খুদে তৈরি কয়েকটা কুঠুরি দেখা যায়, কত প্রাচীনকালে এগুলি তৈরি হয়েছিল জানাযায়না।

পাহাড়ের মধ্যের যে সংকীর্ণ পথে পেট্রা শহরে যেতে হয়, স্থানীয় ভাষায় তার নাম বার-এস্-সিক। এই পথেরএক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্ব সোজা ধরলে হবে ৬০০০ ফুট, কিন্তু এঁকেবেঁকে যাওয়ার পথটি আরো অনেক দীর্ঘ ও গড়ে ২০ ফুট চওড়া। দুদিকের পাথরের খাড়াদেওয়ালের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। মাথার উপর নীল আকাশকে এক ফালি নীল ফিতের মতো দেখা যায়।

পাহড়ের দেওয়ালে মাঝে মাঝে ছোট-বড় কুলুঙ্গি কাটা। সম্ভবত প্রাচীনকালে এইসব কুলুঙ্গিতে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত ছিল, এখন সেসব পৌত্তলিকতার চিহ্ন নেই।বার-এস্-সিকের পথে বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো।

আমার ঘোড়া অনেকবার পা পিছলে ও হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। অশ্বতরগুলি খুব মজবুত, একবারও হোঁচট খেল না।

কুড়ি মিনিট এই অন্ধকার গলির মধ্যে যাওয়ার পরেআমরা পেট্রার প্রথম মন্দির দেখবার জন্য অন্ধকারের মধ্যেসামনের দিকে চাইতে লাগলাম। যারা এ পথে কী আছেজানে না, তাদের কাছে শৈলগাত্রে উৎকীর্ণএই সুপ্রাচীনদেবায়তনটি বিস্ময়জনক আকস্মিকতার সঙ্গে আবির্ভূত হবে। বার-এস্-সিক এখানে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, উত্তর-দক্ষিণ মুখে আড়াআড়ি ভাবে প্রসারিত আর একটা শুষ্ক নদীখাতের সঙ্গে এক সমকোণের সৃষ্টি করে। এই দ্বিতীয় খাতের অপর পারে উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীরের গায়ে এল খাননানামে প্রসিদ্ধ এই মন্দিরটি প্রাচীনকালের কোনো অজ্ঞাতজাতির শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়স্বরূপ বিদ্যমান। কোন দেবতারউদ্দেশ্যে এ মন্দির তৈরি হয়েছিল, আজ তা জানবার কোনো উপায় নেই।

এল খাননার প্রথম দর্শনে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। ১৯০৫ সালে আমিবীরশেবার পথে জেরুজালেম ও সেখান থেকে পেট্রাতেআসি। তখন এ পথে আসতে হত প্রাণ হাতে করে। আমরাবেদুইন দস্যুদলের উৎপাতের আশঙ্কায় কোনো কূপের ধারেতাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতে সাহস করিনি।

কী বিপদেই পড়েছিলাম সেবার জলের অভাবে। পথেরমধ্যে আইন মুসা একমাত্র নদী, সেখানে পৌঁছে দেখি নদীএকেবারে শুষ্ক, এক ফোঁটা জল নেই শিলাস্তৃত নদীখাতে।চব্বিশ ঘণ্টা চলবার পরে ওয়াডি মুসা নদীতে এক জায়গায় সামান্য একটু জল পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই আমাদের ঘোড়া ও অশ্বতরের প্রাণ বাঁচে।

তখন পেট্রা শহর ১২ ঘণ্টার পথ। জানোয়ারগুলিকেজল খাইয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আমি একবিন্দুও জলপাইনি। ওয়াডি মুসার জল মানুষের পানের অযোগ্য।পিপাসায় অত্যন্ত কাতর অবস্থায় আমি বার-এস্-সিক-এর দিকে অগ্রসর হই, পথ-প্রদর্শকের মুখে শুনেছিলাম এখানে পচা জল পাওয়া যায়। ছোট একটা ঝরনা দেখতে পেয়েযখন আমি হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতের অঞ্জলি পুরে জল পানকরছি, তখন এল খাননার মন্দির আমার চোখে পড়ে। মন্দিরের সৌন্দর্য আমায় এত মুগ্ধ করেছিল যে, অঞ্জলি-ভরা জল আমার হাত থেকে পড়ে গেল। জীবনে আর কোনোদৃশ্য আমায় এত অভিভূত করেনি।

সমগ্র পেট্রা শহরের আশপাশে এক হাজারের বেশিপ্রাচীন দেবালয় ও সমাধিস্থান আছে। এদের মধ্যে মাত্রপঁচিশটির উপর গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট, বাকিগুলি আরো প্রাচীন। পেট্রা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খুব বড় হয়ে ওঠে এবং এক হাজার বছর ধরে তার এই প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

বার-এস্-সিক-এর পরেই যে নদীখাতের কথা পূর্বে বলাহয়েছে, তার কাছে রোমান থিয়েটার। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রোমান থিয়েটারের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। এর বসবার আসনগুলি পাহাড় কেটে তৈরি, অনেকটা জায়গা নিয়ে সমস্ত থিয়েটারটা, প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বসবার আসনআছে।

রোমান থিয়েটার ছেড়ে কিছু পশ্চিমে গেলে প্রাচীন পেট্রাশহরের ভগ্নাবশেষ। এখানে শুধু ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুইচোখে পড়বে না, কারণ প্রাচীন পেট্রা নগরীর কিছুই মাটিরউপরে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই।

মাটি খুঁড়ে মাঝে মাঝে এখানে প্রাচীন নগর-প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ওয়াডি মুসার ধারে উত্তর-পূর্ব কোণেশহরের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল এবং এই প্রবেশদ্বারেরনিকটেই রোমান পদ্ধতিতে নির্মিত একটি সুবৃহৎ বিজয়তোরণের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান।

পেট্রা শহর মৃতের পুরী, শুধুই প্রাচীন দিনের সমাধি-মন্দিরে ভরা। প্রথম দর্শনেই একটি অতি দুর্গম পর্বতবেষ্টিত সংকীর্ণ উপত্যকায় এরূপ একটি শহরের দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দিল যে, শত্রুদের আক্রমণ থেকেবাঁচবার এমন চমৎকার দুর্ভেদ্য স্থান পৃথিবীতে বেশি নেই।

এই পর্বতগুলির মধ্যে সবগুলিই এত বেশি খাড়া যেউপরে ওঠা বিশেষ কষ্টকর। পূর্বদিকের পাহাড় অল্প ঢালু, কিন্তু এত বিভিন্ন শিলাখণ্ডের স্তূপ সেদিকে যে অশ্বতর নিয়েও উঠতে সাহস হয় না।

এইসব শিলাখণ্ডের মধ্যে পাহাড়ের নীচে প্রচুররক্তকরবীর বন। রোমান থিয়েটার তোবর্তমানে রক্তকরবীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আমরা যে সময়েগিয়েছিলাম, তখন এদের ফুল ফুটেছে—ফুলের বনে আমাদের তাঁবু ফেলা হল, এল হাবিস বলে ছোট একটাপাহাড়ের তলায়।

করবী ফুলের একগোছা লালা ফুলফলসুদ্ধ ডাল ভেঙেনিয়ে তার উপর রাগ বিছিয়ে আমরা রাত্রে নিদ্রা যেতাম।আমাদের বিছানায় যত ফুল ছিল, ফিফথ এভিনিউ-এর যেকোনো ফুলের দোকানে তাদের দাম দুশো ডলারের বেশি।

পেট্রা শহরের পূর্বে যে পর্বত, তার প্রাচীরের গায়ে সবচেয়ে বড় একটি ইহুদি মন্দির অবস্থিত। এই পর্বত বহুনদীখাত দ্বারা খণ্ডিত এবং এর কয়েক মাইল পূর্বেওয়াডি-এস-সিয়াগের বিখ্যাত খাদ (gorge)।এস-সিয়াগের পশ্চিমে জেবেল-এড ডে'র নামে পাহাড়।প্রথম যুগের খ্রিস্টিয়ানদের এটি একটি উপাসনার স্থান ছিল।

নিকটেই একটি পাহাড় আছে, তার শীর্ষদেশ সমতল। প্রাচীন যুগের অধিবাসীরা এখানে পাথর খুদে খুব বড় একটা চৌবাচ্চা করেছিল—এই জলহীন দেশে জল সঞ্চিত করেরাখা হত এতে, যাতে শত্রুপক্ষের নগর অবরোধ করে ওয়াডি মুসা নদীর জল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে এদেরজব্দ না করতে পারে।

গ্রিক ঐতিহাসিক দিও দোরাস সিকুলাস যিশুখ্রিস্টেরজন্মের কিছু পূর্বে তাঁর গ্রন্থে পেট্রা শহরের নেবাটিয় অধিবাসীদের কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁর লিখিতবিবরণ-পাঠে জানা যায়, সে সময় এদের কোনো নির্দিষ্টঘরবাড়ি ছিল না। নিকটবর্তী উপত্যকায়, নদীতীরে, মরুপ্রান্তে উট ও ভেড়া চরিয়ে বেড়ানোই ছিল তাদেরপেশা।

এই নেবাটিয় জাতি অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। এদেরদুর্গম পার্বত্য বাসস্থানের উল্লেখ উপরোক্ত গ্রিক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে আছে। আলেকজান্দারের সেনাপতিএন্টিগোনাস দুবার এদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, দুবারইসে অভিযান ব্যর্থ হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ওয়াডি মুসা নদীখাতের অনতিদূরে এবং এই সংকীর্ণ উপত্যকায় ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল টি.ই.লরেন্স একদল তুর্কি সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেনএবং প্রাচীন নেবাটিয়দের অনেক কৌশল তাঁকে অবলম্বনকরতে হয়েছিল। বর্তমান যুগের এত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও পেট্রা শহরের ও ওয়াডি মুসা নদীরউপত্যকার দুর্ভেদ্যত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ওয়াডি-এস-সিয়াগ সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার পক্ষে চমৎকারস্থান।

দু'ধারেই শুধু পাহাড়, মধ্যে প্রাচীনকালের নদী পাথরকেটে নিজের পথ করেছে। দু'পারেই পাথরের ছোট-বড়স্তূপের মধ্যে রক্তকরবীর বন। অস্তসূর্যের রঙে একদিকেরপাহাড়ের দেওয়াল রাঙা, অন্যদিকে নিবিড় ছায়া।

আমরা একটা ছোট ঝরনার ধারে এসে বসলাম। খুব উঁচুপাহাড়ের উপর থেকে ঝরনাটা পড়ছে, উপলাকীর্ণ পথ বেয়েতার গায়ে সেটা নেচে চলেছে ওয়াডি মুসার বিস্তৃততরজলাধারার সঙ্গে মিশতে।

এখানে আর একটি প্রাচীন মন্দির আমাদের চোখেপড়ল। এই মন্দিরে একটা ঘরের মধ্যে আর একটা ঘর আছে। ঘরের দেওয়ালে তেকোনা কুলুঙ্গির মতো অসংখ্যগর্ত কাটা। এগুলির উদ্দেশ্য যে কী ছিল, তা আজ বোঝবার কোনো উপায় নেই।

নেবাটিয়গণ কি পায়রা পুষত ?

একটা অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথ দিয়ে আমরা এল হাবিস পাহাড়ের মাথায় উঠি। এই পাহাড়ের পূর্বদিকের ঢালু গা বেয়ে এই পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। পাহাড়ের মাথাসমতল, সেখান থেকে একদিকে দেখা যায়ওয়াডি-এস-সিয়াগের বিরাট নদীখাত, অন্যদিকে পায়ের তলায় সমগ্র পেট্রা শহর।

এখানে দুটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। কেউ বলেনএগুলি রোমানদের তৈরি, কেউ বলেন মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধেআগত খ্রিস্টীয় বীরদের তৈরি। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রথম বলডুইন সার্থবাহ বণিকদের নিকট কর আদায়ের জন্য পেট্রা শহরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন—এলহাবিসের পাহাড়ের উপরকার এই ধ্বংসস্তূপ সে দুর্গেরওধ্বংসস্তূপ হতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের লেখায় পাওয়া যায় যে, নেবাটিয়জাতি সূর্যদেব দুশারার পূজা করত এবং একখণ্ড আস্ত কালো পাথর ছিল এই সূর্যদেবের প্রতিমূর্তি। পেট্রা শহরে সর্বত্র কালো পাথরের দুশারা মূর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়পাওয়া যায়। খ্রিস্টানদের ক্রুশ যেমন তাদের ভজনালয়ে ওসমাধিস্থানে থাকে, নেবাটিয়গণ দুশারার মূর্তি তেমনি তাদেরমন্দিরে ও সমাধিগুহায় রেখে দিত।

আবন পর্বতের মন্দিরের খুব বড় একটা দুশারা দেখবারউদ্দেশ্যে দুজন বীরশেবা আরবীয় পথ-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়েআমরা পর্বতে উঠতে আরম্ভ করলাম। দশ বছর আগেও এসব স্থান বিদেশীয়গণের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল।রাস্তা খুব দুর্গম বটে, কিন্তু আমাদের ঘোড়া একেবারেপাহাড়ের মাথায় আমাদের পৌঁছে দিল।

ঘোড়া থেকে নেমে আমরা জেবেল হারুনের মন্দির দর্শনকরলাম।

পাহাড়ের মাথায় এখানেও প্রকাণ্ড বড় একটা চৌবাচ্চা খোদা আছে, প্রাচীনকালের তীর্থযাত্রীদের জন্য এখানে জল সঞ্চিত থাকত। মন্দিরের একটু নীচে, পাহাড়ের উত্তর ঢালুরগায়ে একটা প্রাকৃতিক গুহায় তিনটি তাম্রকটাহ আছে।সম্ভবত দেবতার নিকট বলিপ্রদত্ত পশু এই তাম্রপাত্রে সিদ্ধকরা হত। একটা পাত্র এত বড় যে তাতে একটা গোটা উটঅনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে।

জেবেল হারুনের মন্দিরে এখনো স্থানীয় অধিবাসীরাভেড়া ও ছাগল মানত করে। তার প্রমাণ আমরা ওখানেথাকতেই পাওয়া গেল। একদল গ্রাম্য লোক কয়েকটি ভেড়ানিয়ে মন্দিরে পূজা দিতে এল।

মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে গাঁথা একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর, তার রংটা ঈষৎ সবুজাভ কালো। এই সেইইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুশারা। তীর্থযাত্রীর দল চুম্বন করে তারউপরটা মসৃণ ও চকচকে করে তুলেছে। গৃহতল থেকেপাথরখানার অবস্থান প্রায় ৫ ফুট উঁচুতে।

আমরা মন্দিরের বাইরে এসেছি, এমন সময় দেখা গেল দূরে একদল বেদুইন আসছে। তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। জেবেল হারুনের পবিত্র মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।সুতরাং আমাদের পথ-প্রদর্শকের পরামর্শে আমরা শীঘ্রসেখান থেকে সরে পড়লাম।

মন্দিরের কিছু দূরে বলির স্থান। নিহত পশুর রক্ত এনে দুশারা প্রস্তরের সামনে পাথরের মেজের একটা গর্তে রাখাহত। নেবাটিয়গণের একটা প্রথা এখনো স্থানীয় সামারিটানইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা হচ্ছে বলিপ্রদত্ত পশুর রক্তসর্বাঙ্গে মাখা।

নিম্নের উপত্যকার প্রবেশপথে ক্ষুদ্র একটি গুহায়কয়েকটি বেদুইন পরিবার বাস করে। এদের বাড়িঘর, তাঁবু, কিছু নেই। সামান্য যা কিছু পরিচ্ছদ তা তাদের পরনেইআছে, একখানা করে ছেঁড়া কম্বল পেতে রাত্রে শোয়। বালক-বালিকারা অনাহারে শীর্ণ, উলঙ্গ ও অপরিষ্কার।যবের রুটি এদের একমাত্র খাদ্য, তাও প্রচুর পরিমাণে জোটেনা।

অজ্ঞাত তুবা জাতির দেশ

বিশাল ইনিস নদীর উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিতে গিয়া মি. ডগলাস কারুথাস ও তাঁহার সঙ্গী তুবা জাতিরসন্ধান পান।ইনিস নদীর উৎপত্তিস্থান যে পর্বতবেষ্টিতঅরণ্যময় প্রদেশে, এক সময় সেখানে তুবা জাতির সংখ্যাঅত্যন্ত বেশি ছিল, এখন ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। খুব কমইউরোপীয় ভ্রমণকারীর এদের দেশে গিয়া এদেরআচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখিবার সুযোগঘটিয়াছে।

এশিয়া মহাদেশ সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে পৃথিবীর মধ্যে বারোটি সুবৃহৎ নদীর অবস্থান এইখানেই। এদের মধ্যেসর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হবে ইয়াংসি ও হোয়াংহোনদীদ্বয়ের। এশিয়ার মধ্যে এরা যে শুধু দুই বৃহত্তম নদী তাইনয়, বহুতর জাতি এদের দু'পারে বাস করে, যাদের সংস্কৃতিও সভ্যতা অতীব প্রাচীন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইকথা খাটে। স্যালউইন ও মেকং দৈর্ঘ্যে খুব বড়।

এইসব নদী তিব্বতের মালভূমি থেকে উঠে হয় পূর্বদিকে চীন-সমুদ্রে, নয়তো দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে পড়ছে।এদের সঙ্গে ইরাবতী নদীর কয়েক হাজার মাইল দৈর্ঘ্য যোগদিলেই যে-সব নদী উত্তরবাহিনী নয়, তাদের মোট দৈর্ঘ্যেরএকটা হিসাব পাওয়া যাবে।

বাকি নদীগুলিকে বলা যায় সাইবেরীয় ও উত্তর মেরুদেশীয় নদী—কারণ যদিও তাদের উৎপত্তিস্থান এশিয়ার মধ্যস্থলের পর্বতশ্রেণিতে বা মালভূমিতে, কিন্তুএরা উত্তরমুখে বয়ে গিয়ে উত্তর মহাসাগরে পড়েছে।

এদের মধ্যে কতকগুলি নদী আছে, যাদের উৎপত্তিস্থান কখনোই কোনো ইউরোপীয় ভ্রমণকারী দেখেননি। যেমন অক্সাস নদীর উৎপত্তিস্থান, যেমন ঘোর নির্জন ও ঊষর তুন্দ্রা অঞ্চল, হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীদ্বয় যেখান থেকেবার হয়ে আসছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্বন্ধেও একথাঅনেকটা খাটে। স্যালউইন ও মেকং নদীর খাতউৎপত্তি-স্থানের দিকে এত গভীর ও দুর্গম যে, এই ভীষণনদীখাতের জন্যে চীনদেশ ব্রহ্মকে গ্রাস করতে পারেনিকখনো।

যেসব নদী অপেক্ষাকৃত সুগম মঙ্গোলীয় মালভূমি থেকেবেরিয়েছে, তাদের উৎপত্তিস্থানও যথেষ্ট রহস্যাবৃত—যেমনউদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আলতাই পর্বতশ্রেণির যেউচ্চ অঞ্চলে ইরবিশ নদীর জন্ম, বা মধ্য-এশিয়ার যে সৌন্দর্যময় হ্রদমালার মধ্যে ইনিস নদীর জন্ম—সে পার্বত্য প্রদেশ বা সে রহস্যাবৃত হ্রদ ক'জন ভ্রমণকারী দেখেছেন ?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইনিস নদীর উৎপত্তিস্থাননিজেদের চোখে দেখবো। আমরা শুনেছিলাম ওই অঞ্চলে বহু কৌতূহলপ্রদ দ্রষ্টব্য স্থান আছে, বাইরের লোকে যাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সাইবেরিয়ার বিরাট সমতলভূমির মধ্যে দিয়ে যেসব নদী বয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ইরতিশ, লেনা ও আমুর নদীর উৎপত্তিস্থানে যাওয়া অপেক্ষাকৃতসহজ—কিন্তু ইনিস নদী যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে, তার চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণি, মধ্যের উপত্যকা গভীরঅরণ্যময়।

ম্যাপে দেখা যায়, এই পর্বতবেষ্টিত সমতলভূমি আকারেপ্রায় ইংল্যান্ডের সমান বড়, এতে প্রায় হাজারখানেক ছোট-বড় হ্রদ আছে, চতুর্দিকে পর্বতমালার জলধারা এসে জমাহয় এই সব হ্রদে। পর্বতশ্রেণির প্রাচীরের এক জায়গায়সংকীর্ণ একটি পথ আছে, এই সংকীর্ণ খাত দিয়ে ইনিস নদীসবেগে বেরিয়ে আসছে।

বোতলের গলার মতো এই সংকীর্ণ স্থানটা পার হয়েইনিস অন্যান্য সাইবেরীয় নদীর মতো বিস্তৃত উর্বরসমতলভূমি, বিশাল আরণ্য ভূভাগ ও ঊষর তুন্দ্রার উপর দিয়ে বয়ে এসে উত্তর উপসাগরে পড়েছে।

আমাদের যাত্রা পিকিং থেকে আরম্ভ করা চলত—কিন্তুতাহলে ১২০০ মাইল ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। সাইবেরীয় রেলপথের যে-কোনো নিকটবর্তীস্টেশন থেকে এই অঞ্চল অন্তত দুশো মাইল ঘন অরণ্য ও দুর্গম জলাভূমির পারে অবস্থিত। আমাদের একমাত্র ভরসাছিল, বসন্ত ঋতুতে ওদিকের পথ অনেকটা সুগম হয়।

কিন্তু বসন্তে বিপদও আছে। বরফ গলতে আরম্ভ করার ফলে এই সময়ে নদীতে বন্যা আসে। জলাভূমি টাটকাবরফ-গলা-জলে ভর্তি হয়ে যায়।

মে মাসের মাঝামাঝি আমরা এমন একটা জায়গায় এসেতাঁবু ফেললাম, যার পর ফসল আর জন্মায় না। আমাদের সম্মুখে শুধু অরণ্যাবৃত শৈলমালা ও জলাভূমি সাইনস্কপর্বতশ্রেণির পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে যে উপত্যকার কথা বলা হয়েছে, এই পর্বতমালা সেই উপত্যকার উত্তর দিকের প্রাচীর। আমাদের সঙ্গে ছিল জনকয়েক সাইবেরিয়ার লোক, এরা তুন্দ্রা অঞ্চলের মাঝে মাঝে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করে। প্রতিদিন ঘোড়ার পিঠে আমরা পাঁচমাইলের বেশি যেতে পারতাম না।

মাঝে মাঝে উঁচু একটা পাহাড়ে উঠে আমরা সামনেরদিকে চেয়ে দেখছিলাম, শুধু পাহাড় আর ঘন অরণ্যপাহাড়ের মাথায়, এ ছাড়া আর কিছু তো চোখে পড়ে না।

ক্রমে আমরা উচ্চতর অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম।

গাছপালা ক্রমশ কমে গেল। যাও বা রইল, তারাউচ্চতায় বেশি বড় নয়। আমরা একটা গিরিবর্ত্ম দিয়ে যাচ্ছি, দু'ধারে তার তুষারাবৃত পর্বতশিখর। সমুদ্রবক্ষ থেকেগিরিবর্ত্মটার উচ্চতা কিন্তু খুব বেশি নয়, মাত্র ৪৫০০ ফুট।

আমাদের পায়ের নীচের সমতলভূমিতে অনেক ছোটখাটো নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে উত্তরমুখেতাদের দু'হাজার মাইল দীর্ঘ পথে ভ্রমণ শুরু করেছে।

কিন্তু এই পর্বতপ্রাচীরবেষ্টিত নিম্নস্থান অতিক্রম করেতাদের যেতে হবে আরো আড়াইশো মাইল রাস্তা ! তারপরেএরা গিয়ে পড়বে সাইবেরিয়ার সমতলভূমিতে। আমাদেরসামনে যে অঞ্চল, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই অপূর্ব, পাহাড়ের পাদদেশে ঘন অরণ্য, তারপর পার্কের মতো তৃণাবৃত ভূমি, নানাবিধ বিচিত্র বন্য পুষ্পে ভরা।

মাঝে মাঝে দু-একটা নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। গাছপালারফাঁকে ফাঁকে কোথাও পর্বতচূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণদিকে যে পর্বতমালা সেটা আমরা ঠিকমতো দেখতে পেলামনা, কারণ তার দূরত্ব অনেকটা। খুব যেখানে সংকীর্ণ, সেখানেও এই উপত্যকা অন্তত পঞ্চাশ মাইল চওড়া। দৈর্ঘ্য৫০০ মাইলেরও কম নয়।

এই সব অজানা অঞ্চলের বহু বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে সারা গ্রীষ্মকাল আমরা কাটিয়ে দিলাম। যেখানে নদীপথে নৌকা চালানো সম্ভব, ততদূরে গিয়ে আমরা খুব বড় একটা কাঠের ভেলা তৈরি করে জলে ভাসালাম। তিনটি শাখানদী পরস্পর মিলিত হয়ে ইনিস নদীর বৃহত্তরজলাধার সৃষ্টি করেছে।

সমগ্র উপত্যকার সৌন্দর্যে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। ইনিসঅতীব সৌন্দর্যশালী নদী, যদিও এর উভয় তীরের অধিকাংশঅঞ্চল জনহীন অরণ্যে আবৃত, কিন্তু যে পর্বতপ্রাচীরবেষ্টিতউপত্যকায় এর জন্ম, তার বৈচিত্র্যের তুলনা নাই। এই অঞ্চলের গাছপালা, জীবজন্তু ও অধিবাসী সবই বিচিত্র।

অতি দুষ্প্রাপ্য জাতীয় কস্তুরী-মৃগ এখানকার বনে পাওয়া যায়। খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় সেব্‌ল্ ইনিস নদীর উৎপত্তিস্থানেরঅরণ্যে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই অরণ্যেইতুবা জাতি বাস করে। এই তুবা জাতির আচার-ব্যবহার ওজীবনযাত্রাপ্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত।

প্রস্তর যুগের সভ্যতার আবহাওয়া থেকে এরা সবে বারহয়েছে। অনেক সময় নিয়েছিল প্রস্তর যুগকে অতিক্রম করে আসতে। এরা গরু ও বল্‌গা হরিণ পোষে, কৃষিকার্যেঅনেকটা জ্ঞানলাভ করেছে, ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিব্যবহার করে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত এরা লৌহের ব্যবহারজানত না।

বহু প্রাচীনকাল থেকে ইনিস নদীর উপত্যকায় তুবা জাতিবাস করত। মাঝে মাঝে অন্য জাতি এসে বাহুবলে এদেরবিতাড়িত করে গভীরতর অরণ্যঅঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। উত্তরদিকে গিয়ে এরা প্রথম যে জায়গায় পৌঁছলসেখানে মাছ ও শিকারের জীবজন্তু প্রচুর পরিমাণে মেলে।তারা সেখানে গিয়ে কৃষিকার্য ভুলে গেল, জীবজন্তু শিকারই তাদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল।

তুবা জাতির এই অধঃপতিত শাখা উত্তর মেরুদেশের অন্তর্গত তুন্দ্রা-অঞ্চলে বিচরণ করে।তুবা জাতির অন্যান্য শাখা বৈদেশিক আক্রমণের বেগসহ্য করতে না পেরে গভীর অরণ্যপ্রদেশে পালিয়ে যায়।এরাই চীনসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ইউরিয়ান খাই জাতি, ইনিসনদীর অরণ্য অঞ্চলে এদের বাস।

আমরা বাই-কেম নদীর উত্তরদিকের একটা শাখানদীতে ভ্রমণ করবার সময় ইউরিয়ান খাই জাতির একটি পরিত্যক্ত বাসস্থানে এসে পৌঁছুই। তাঁবুর খোঁটাগুলি তখনো মাটিতে পোঁতা ছিল। কেবল ওপরকার বার্চ-বল্কলের আচ্ছাদন ছিলনা।

এদের বাসস্থান বছরের মধ্যে অনেকবার বদলায়। একজায়গায় থাকা এদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমরা যখনগিয়েছিলুম তখন জুন মাস, ও-সময়ে পাহাড়ের ওপর বনে তারা তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে ফলমূল ও বন্য জন্তুশিকারের সন্ধানে। শীতকালে আবার উপরে এসে এখানেইবাস করবে। আমরা স্থির করলাম, পাহাড়ের উপর তুবাজাতির সন্ধানে আমাদের যেতে হবেই।

কয়েকদিন পরে আমাদের তাঁবুর কুকুর বনের মধ্যেবিচরণশীল একটা বল্‌গা হরিণকে তাড়া করলে। কিছু পরে বল্‌গা হরিণে চড়ে একজন খর্বাকৃতি লোক বনের মধ্যেথেকে বেরিয়ে এল। আমরা আমাদের কুকুরকে ডেকে শান্তকরলাম, খর্বাকৃতি মানুষটি আমাদের নিয়ে গেল বনের মধ্যেতাদের তাঁবুতে।

এইভাবে আমরা তুবা জাতির প্রথম সন্ধান পাই।

বনের মধ্যে একটি শান্ত উপত্যকা। চারিধারে অরণ্যাবৃতপর্বতমালার মধ্যে এখানে অনেকখানি অঞ্চল সবুজতৃণভূমি। এই তৃণভূমিতে সারি সারি বার্চ-বল্কলের তাঁবু, ওপরের দিকে সরু, নীচরে দিকটা গোল। এ ধরনের তাঁবুকেএরা বলে “টেপি”।

তাঁবুর চারিপাশের মাঠে বড় বড় বল্গা হরিণের দলশুয়ে আছে বা দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে। এরা তুবাদের পোষা বল্গা হরিণ, বন্য নয়। আমরা এদের মধ্যে দিয়ে গিয়েমাঠের ঠিক মাঝখানে আমাদের তাঁবু ফেললাম। ওদের প্রত্যেক লোকে আমাদের সাহায্য করল। সেদিক দিয়েদেখতে গেলে এরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও ভদ্র।

আমাদের এরা কোনোদিন দেখেনি—কিন্তু এই অপরিচয়ের দরুন আমাদের প্রতি ওদের কোনোরকম সন্দেহবা বিদ্বেষের ভাব জাগল না—বরং ওদের ব্যবহার দেখে মনে হল, আমাদের আগমনে ওরা সন্তুষ্ট হয়েছে। যদিওপ্রথমটা দেখে মনে হয়েছিল যে, এরা অত্যন্ত বিষণ্ণ ওনিরুৎসাহ জাতি, কিন্তু কয়েকদিন থাকার পরে বোঝা গেলযে বনের মধ্যে বেশ মনের আনন্দেই ওরা আছে।

পালিত পশুর শ্রেণী হিসাবে তুবা জাতি দুটি প্রধানশাখায় বিভক্ত।

একটি শাখা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে বাস করে এবং ঘোড়া, ভেড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি পোষে আর একদল বল্গা হরিণ পোষে, এবং বাস করে গভীর অরণ্যের মধ্যে। অরণ্যচারী তুবা জাতি সংখ্যায় অল্প, বাইরের জগতের সংস্পর্শে এরা বড় একটা বেশি আসে না বলে জাতিগতবৈশিষ্ট্য এখনো এদের বজায় আছে। গ্রীষ্মকালে এরাসমতলভূমিতে আর থাকে না, পাহাড়ের ওপরকার উচ্চস্থানে বল্গা হরিণের দল নিয়ে গিয়ে ওঠায়, কারণ বল্গা হরিণগরম মোটে সহ্য করতে পারে না।

আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছিলাম সেটা ওদেরগ্রীষ্মকালের আবাসস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিন হাজারফুট উঁচু।

সেখানে যথেষ্ট পশুচারণ-ভূমি আছে, শরৎকালের পূর্বে সেখান থেকে অন্যস্থানে যাবার কোনো আবশ্যক হবে না।এদের জীবিকা-নির্বাহের জন্যে তিনটি জিনিসের আবশ্যকঅত্যন্ত বেশি, বন্যপশু, বল্গা হরিণ ও বার্চ-বল্কল। আমরা যখন ওদের তাঁবুতে প্রবেশ করলাম, তখনই আমাদের মনে হল, প্রকৃতিদত্ত বন্য ফলমূল, বন্য গাছের ছালের ওপরএদের কতটা নির্ভর করতে হয়। এদের গৃহস্থালিরবাসন-কোসন সবই বার্চ কাঠের, বার্চ গাছের ছালের এবং বল্গা হরিণের চামড়ায় তৈরি। বিদেশি কেটলি দু-একটা তাঁবুতে দেখতে পাওয়া যায়।

তুবা জাতি অত্যন্ত দরিদ্র। সাতাশটি পরিবার সাতাশটিতাঁবুতে বাস করে। সবসুদ্ধ দু'শো বল্গা হরিণ আছে এদের দলে। এক-একটি পরিবারের পিছু বল্গা হরিণের সংখ্যগড়পড়তা খুব বেশি নয়।

এর ওপরে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, বল্গাহরিণ বিনা কারণে বিনা নোটিশে হঠাৎ মরতে শুরু করে, মড়ক একবার আরম্ভ হলে পাল সাবাড় হতে বেশি সময় নেয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তুবা জাতি—যাদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় বল্গা হরিণ—জীবন ওমরণের মাঝখানে দড়াবাজির খেলোয়াড়ের মতো অতি সন্তর্পণে বাস করে।

বল্গা হরিণের দল তাঁবুর আশপাশে গাছের ছায়ায়শুয়ে থাকে—কারণ রোদ এরা আদৌ সহ্য করতে পারে না।বিকেলের ছায়া পড়লে গাছতলা থেকে উঠে বাইরের মাঠেচরতে যায়। অনেক সময় এদের সঙ্গে রাখালের দরকার হয়না, আপনা-আপনিই আবার তাঁবুতে ফিরে আসে।

বল্গা হরিণ অত্যন্ত পোষ মানে। তারা সব সময়েইআমাদের তাঁবুর আশেপাশে বেড়াচ্ছিল, খুব সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের সঙ্গে নুন আছে। বল্গা হরিণ নুনখেতে ভারি ভালোবাসে—নুনের লোভ দেখিয়ে এদের দূরেনিয়ে যাওয়া যায়। তুবা মেয়েদের দেখতাম ছোট ছোটচামড়ার থলির মুখ খুলে নুন বার করে এদের খাওয়াচ্ছে।নুন খেতে না পেলে বল্গা হরিণের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।মেজাজও খারাপ হয়ে যায়।

বল্গা হরিণের পিঠে চড়ে ও জিনিসপত্র চাপিয়ে তুবাজাতির লোকেরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়যায়। এইসব দুর্গম পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হত, বল্গা হরিণ না থাকলে বিশেষ করেস্ত্রীলোক ও বালিকাদের পক্ষে। বল্গা হরিণের দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর, তুবাদের এ একটি প্রধান খাদ্য। তারা মাংসের জন্যে হরিণ কখনো মারে না। তাঁবুর বল্গা হরিণের পালেরসঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খুব বন্ধুত্ব, তারাকোনোরকমজিন বা লাগাম ব্যবহার না করে অনায়াসেই বল্গা হরিণের পিঠে চড়ে এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে যাতায়াতকরছে।

তুবা জাতির মধ্যে যে মঙ্গোলি ও চৈনিক সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা তাদের মুখাবয়ব থেকে অনুমান করা শক্ত নয়।অনেকেরই চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখ তেরচা, নাকখ্যাঁদা—যদিও কারো কারো বাঁশির মতো নাকও দেখতে পাওয়া

যায়। এরা সাধারণত খর্বাকৃতি, দড়ি-দড়ি চেহারা, চর্বি বলেকোনো জিনিস এদের দেহে বাইরে থেকে ধরা পড়ে না।চুল খুবই কম, গোঁফদাড়ির বালাই নেই।

এদের একটা দোষ, এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। বনের নির্জনতা অত্যন্ত ভালোবাসে। বাইরের জগতের কর্মসংঘর্ষও ব্যস্ততাকে সযত্নে দূরে পরিহার করে চলে। দারিদ্র্যে কষ্টপাবে, না খেয়ে বরং মরতে প্রস্তুত, তবু কখনো কোনোরুশীয় বা চীনা ঔপনিবেশিকের বাড়িতে মজুরি করে অর্থসংগ্রহ করবে না। স্বাধীনতা ও মনের আনন্দকে এরা এতভালোবাসে যে, সাংসারিক সচ্ছলতার বিনিময়েও তাদের ত্যাগ করতে রাজি হয় না। জীবনের পথে এদের আবশ্যকহয় খুব কম জিনিসেরই, কোনোপ্রকার বিদেশি বিলাস-দ্রব্যের এরা ধার ধারে না, কেবল চা, তামাক ওবারুদ ছাড়া।

তুবা জাতির তাঁবুতে মুদ্রার ব্যবহার প্রায় নেই। জঙ্গলে প্রচুর বন্যজন্তু আছে, তাদের অনেকেরই গায়ে দামি লোমআছে। এই পশুচর্মই তুবা জাতির মুদ্রা। গ্রীষ্মকালের পোশাক ছিঁড়ে গেলে এরা জঙ্গলে লোমশ পশু শিকার করতে বার হয়, তাদের চর্মের বিনিময়ে চীনা বণিকদের কাছে পোশাককিনতে পায়। তামাক ফুরিয়ে গেলেও ওই ব্যবস্থা।গবর্নমেন্ট-কর দেয় কেবল চর্মের।

বিদেশি আমদানি খাদ্যের মধ্যে দই-পাতা ঘোটকীর দুগ্ধ এদের অত্যন্ত প্রিয়, চামড়ার বিনিময়ে এই অতি উপাদেয়খাদ্যটিও নিকটস্থ কোনো চীনা মুদির দোকানে কিনতেপাওয়া যায়।

পূর্বে শিকার-কার্যে এরা তীর-ধনুকের ব্যবহার করত।এখন লম্বা নলওয়ালা সেকেলে ধরনের বন্দুক দ্বারা শিকার করে। পুরাতন আমলের তীর-ধনুক এখনো কিছু কিছু এদেরতাঁবুতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তুবা জাতীয় লোকেরানিশ্চয়ই খুব কৌশলী শিকারি ছিল, কারণ এই আদিমকালের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ওই গভীর জঙ্গলে মুজ বা ওয়াশিটিশিকার করা হয় তার শিঙের জন্যে। এই শিঙ যখন নরমথাকে চীনা ব্যবসায়ীরা বেশি দামে কিনে নেয়। সবচেয়েদামী হচ্ছে পশুলোম বা লোমশ চর্ম। সাইবেরিয়ার অরণ্য ও তুন্দ্রা অঞ্চলে যত ধরনের লোমশ পশু আছে, পৃথিবীর মধ্যেউত্তর কানাডা ছাড়া এত আর কোথাও নেই। তুবাদের বসতিস্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অরণ্যের লোমশ-চর্ম পশুদের মধ্যে সেবল্‌, মার্টেন, সাদা খেঁকশিয়াল, নিংকস ওকাঠবিড়ালী প্রধান।

বনের মধ্যে যতগুলি পার্বত্য নদী আছে, অধিকাংশইম্যাসন মাছে পরিপূর্ণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তুবা জাতি মাছধরতে জানে না। জল দেখে এরা কেমন একটু ভয়পায়—ভালো মাঝিও নয় এরা। জলে বেড়ানোর উপযুক্তনৌকা বা ভেলা এদের নেই। জলপথে যাওয়া অপেক্ষা স্থলপথে যাওয়াটাই এরা বেশি পছন্দ করে। ভেলা বা নৌকাতৈরি করবার উপযুক্ত শক্ত কাঠের অভাব নেই স্থানীয়অরণ্যে, অথচ ওসব জিনিস ওরা গড়তে জানে না। বড়ো বড়োপ্রাকৃতিক হ্রদ ও নদীর দেশে বাস করেও তারা যে নৌকার ব্যবহার জানে না—এটা খুব আশ্চর্যের কথা।

নদী পার হওয়ার দরকার হলে এরা সাঁতার দিয়ে পার হয়। সঙ্গে যদি জিনিসপত্র থাকে, তবে ছেলেমানুষী ধরনের একটা ভেলা তৈরি করে তাতে জিনিসপত্র রেখে নিজেদের পোষা ভারবাহী জন্তু দিয়ে টানিয়ে সেটা অপর পারে উত্তীর্ণকরতে চেষ্টা করে।

খরস্রোতা পার্বত্য নদী এভাবে উত্তীর্ণ হতে গিয়ে অনেকে মারা পড়েছে। প্রত্যেক নদী পার হওয়ার ঘাটে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্রস্তরস্তূপ দেখতে পাওয়া যাবে। নিরাপদে নদী পার হওয়ার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপসেগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

এদের জীবন নানারকম কুসংস্কারপূর্ণ। বহুঅপদেবতাকেও ভয় করে চলতে হয় এদের। বনের প্রত্যেকঝোপঝাপ, গাছপালায় বিবিধ শ্রেণীর দেবতা ও অপদেবতার ভিড়। তাদের সর্বদা সন্তুষ্ট করে না চলতেপারলে সহস্র রকম বিপদের সম্ভাবনা। অপদেবতার ভয়ে বেচারিরা কাঁটা হয়ে থাকে।

নিজেদের জন্যে ঘরবাড়ি তৈরি করতে এরা জানে না—হয়তো দরকারও হয় না—কিন্তু এইসবঅপদেবতাদেরউদ্দেশে বনের মধ্যে লতাপাতা ও কাঁচা ডালপালায় তৈরি মন্দির অনেক জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

তুবাদের অনেক মন্দিরেই বুদ্ধের রঙিন ছবি দেখা যায়।বাইরে এরা যদিও বৌদ্ধ, আসলে এরা কিন্তু প্রকৃতিরউপাসক।

মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির দেহকে একটি পাহাড়ের উন্মুক্ত আকাশের তলায় রেখে আসা এদের নিয়ম। এদের বিশ্বাস পুণ্যবান ব্যক্তির মৃতদেহ বন্য জন্তুরা এসে খেয়ে ফেলে, কিন্তু পাপীর দেহের ত্রিসীমানায় তারা ঘেঁষবে না।সমাধিস্থানের

ওপরে একটি সাদা নিশান উড়িয়ে দেওয়াথাকে। সমাধিস্থান মানে পাহড়ের ওপর এই রকম ফাঁকাজায়গা, যেখানে অনেক সময় মৃত ব্যক্তির একটুকরো হাড়ওপড়ে থাকে না।

সুতরাং তুবা জাতির বেশিরভাগ লোকই বোধ হয় পুণ্যবান।

ফরাসী ইন্দোচীনের পথে

কাপ্তেন কিংডন ওয়ার্ডের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

নতুন অর্কিডের সন্ধানে পৃথিবীর কোন্দেশ ঘুরতে লোক বাকি রেখেছে !

কেউ বলবে ব্রাজিল, যেখান থেকে অনেক অদ্ভুত জাতীয় অর্কিড এসেছে, সম্ভবত যেখানকার জঙ্গলেবিচিত্রতর অর্কিড এখনো থাকলেও থাকতে পারে। কেউবলবে আসাম।

অর্কিড অবশ্য অল্প-বিস্তর সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু অর্কিড যেসব দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব, তাদের মধ্যে ফরাসী, ইন্দোচীনে তেমন করে এখনো খোঁজাহয়নি। ম্যাপেও এই দেশের খুঁটিনাটি ভৌগোলিক ব্যাপার কিছু দেওয়া হয় না, একে ‘বৃহত্তর ভারত’ বলে অন্ধকারেরমধ্যে বিদায় দেওয়া হয়—যদিও ভারতের সঙ্গেবর্তমানকালে অন্তত এর বিশেষ যোগ নেই।

অনেক সময় এই কথাটা কেউ ভেবে দেখে না যে, ভারত সাম্রাজ্য সিন্ধু নদী থেকে মেকং পর্যন্ত প্রায় দু’হাজারমাইলের ওপর বিস্তৃত। ইরাবতী নদীর উপত্যকা থেকে ৫০০মাইল পূর্বে এই সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত। কিছুদিন আগেওশান্রাজ্যের মালভূমিতে অবস্থিত ব্রিটিশের শেষ ছাউনিরেলওয়ে-স্টেশন থেকে এক মাসের পথ ছিল।

এখন টাঙ্গিয়াই পর্যন্ত মোটরের রাস্তা খোলার পর থেকেএ কষ্টের অনেকটা সমাধান হয়েছে বটে, তবুও যেন কেউ মনে না করে যে, দশ দিনের কমে চীন সীমান্তের কেংটুং-এ তিনি পৌঁছুতে পারবেন।

আমি দশ দিনের কমে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমারযেসব সুবিধা ছিল, অনেকে সে সুবিধা পাবেন না।

মান্দানে মেল-ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা দেখতে পাবেযে, একটি বিস্তৃত সমতলভূমির মাঝখানে তারা দাঁড়িয়েআছে। এই সমতলভূমির কিছু অংশে ফসলের চাষ করাহয়েছে, কিছু অংশ কাঁটা ও জঙ্গলে ভর্তি। স্থান—ব্রহ্মদেশেরমধ্য অঞ্চল, গ্রীষ্মের প্রকোপ অতিরিক্ত। পূর্বে বহুদূরে শান মালভূমির প্রান্ত তাপ-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবেদেখা যায়।

সরু সাদা ফিতের মতো একটা রাস্তা সমতলভূমির বুক চিরে চলে গিয়ে দূরের শৈলশ্রেণির তলায় অদৃশ্য হয়েছে।এ রাস্তায় জোরে মোটর চলানো বিপজ্জনক, কারণ রাস্তা খুব প্রশস্ত নয়। আমার লরি-চালক ব্রহ্মদেশীয়, সে কিন্তু বেশ জোরেই লরি চালিয়ে দিলে পিছনে ধুলোর কুণ্ডলীকৃত পাহাড় সৃষ্টি করে। এরা মোটর চালায় সম্পূর্ণ মরীয়াভাবে—ওদিক থেকে যে লরি এদিকে এসেছে তাদের বেগ আরো ভয়ানক। কাজেই যখন বাহারে শুনলাম যে, পূর্বদিনএকখানা লোক-বোঝাই বাস পাহাড়ের মোড় ঘুরবার সময় একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে যাত্রীসমেত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েগিয়েছে—তখন আমি খুব বিস্মিত হইনি।

১০৫ মাইল দূরবর্তী টাঙ্গিয়াই প্রথম দিনেই পৌঁছানো গেল।

ছোট্ট শহর, চারিধারে সবুজ মাঠ, চুনা পাথরের অনুচ্চশৈলমালায় ঘেরা। দৃশ্য ও আবহাওয়া বেশ ভালো। পরদিনবৈকাল নাগাদ বাকি ৬০ মাইল গিয়ে আমরা মোটরে রাস্তারশেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। এবার মেটে রাস্তা আছে আরো১২০ মাইল, তাতে মোটর চলে না গোরুর গাড়ি চলে।তবে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লরি চলতে পারে।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল; সুতরাং মেটে রাস্তা দিয়ে একশো মাইল লরি চালিয়ে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে আমরা যেখানেপৌঁছে গেলাম সেখান থেকে স্যালউইন নদীর উপত্যকার দিকে রাস্তা গিয়েছে নেমে। লরি এখানে এসেই থামল।

দলে দলে চীনা অশ্বতর খেয়ার ওপারে নীত হচ্ছে।গ্রীষ্মকালে নদীর জল বেশি না থাকায় পার হওয়া আদৌকঠিন নয়। বর্ষাকালে স্যালউইন ৮০ ফুট স্ফীত হয়, তখনপার হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। অনেক সময় খেয়ারভেলাগুলো খরস্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে। মাঝ-নদীতে এ রকম ব্যাপার ঘটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কাঁচা রাস্তা স্যালউইনের খেয়াঘাটেই শেষ হয়ে গেল।ওপারে একটা সংকীর্ণ অশ্বতর যাতায়াত করার পথ কেংটুং পর্যন্ত গিয়েছে।

আমার কাছে এই মোটরে যাওয়ার উত্তেজনাটুকু কাম্য বলে মনে হল—বিশেষ করে পথে যখন ছ-হাজার ফুট উঁচুদু-দুটো গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হবে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা খবর এল যে টাঙ্গিয়াই থেকে কেংটুংপর্যন্ত একখানি লরি যাচ্ছে। পরদিন সকালবেলাতেইলরিখানা খেয়াঘাটে এসে পৌঁছে গেল এবং আমি তারই সঙ্গে যাবার বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলে সেইদিন বৈকালেইরওনা হলাম।

রাস্তা প্রথম একটা পার্বত্য নদীর সমান্তরালভাবেগিয়েছে। নদীটি স্যালউইন নদীর একটি শাখা। চতুর্থ মাইলে পথ ক্রমশ ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি আবশ্যক হল, এই দুর্গম পথে গাড়িউঠতে লাগল, অর্ধেক উঠে এঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে এবংগাড়ি সেই দুর্গম ঢালু বেয়ে বাক্যব্যয়টি না করে দিব্যিপিছুদিকে গড়াতে শুরু করলে। আমরা তাড়াতাড়ি ব্রেক কষেগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চাকার তলায় কাঠ ফেলে তারগতি বন্ধ করে দিলাম।

এরপর কষ্ট—কতরকম চেষ্টা করা গেল, পুরাদমে এঞ্জিন চালিয়েও গাড়ি কিছুতেই ওপরের দিকে উঠতে চায় না। হঠাৎ পার্বত্য নদীর বিপুল গর্জন ছাপিয়েও একটা মোটরের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল এবং কেংটুং-এর দিক থেকে একখানা লরি পার্বত্য ধাপ-কাটা পথে লাফাতে লাফাতেওপরের পাহাড় থেকে নামছে দেখা গেল।

আশ্চর্য যোগাযোগ যে, একশো মাইল পথের সংকীর্ণতমও সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক স্থানেদু'খানা বিপরীতমুখী লরিরসামনা-সামনি এভাবে দেখা হবে। কে আগে পথ দেবে ?

আগে পথ দেবার শক্তি আছে কার ?এক দিকে বহুশতফুট খাড়া পাথরের দেওয়াল ঠেলে উঠেছে, আরএকদিকে গভীর খাদ, কয়েকশো ফুট নীচেতে সেইগর্জনকারী পার্বত্য স্রোতস্বিনী।

সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল, নদীর দিকটাতে পাহাড়ের একটা অংশ কয়েক ফুট বেরিয়ে আছে; ঠিক যেন ছাদের টালির কার্নিসের প্রান্তভাগের মতো। সেই কার্নিসটাআমাদের দুটো গাড়ির মধ্যে পড়ে। যদিও সেই সরু কার্নিসেগাড়ি দাঁড় করানো খুব বিপজ্জনক, তবু আমরা সাহস করেতাই করলাম। নতুবা উপায় ছিল না। কেংটুং-এরলরিখানাকে সেই কার্নিসে দাঁড় করিয়ে আমরা আমাদেরগাড়ির মাল নামিয়ে সেখানা ঠেলে তুললাম উপরের দিকে।সরু রাস্তা থেকে বার হয়ে আমরা মোড় ঘুরবার জায়গাপেলাম।

এসব করতে বেলা গেল। সন্ধ্যা নামবার অনেক পরে আমরা আবার স্যালউইন নদীর খেয়ায় ফিরে এলাম। পরদিন সকালে কম বোঝাই নিয়ে আবার লরি ছাড়া গেল।এবার আমরা পাহাড়ের ধাপগুলো সহজেই উত্তীর্ণ হয়েনিরাপদে সংকীর্ণ পথটি অতিক্রম করে শৈলশ্রেণির প্রথম বাঁকটার সামনে এসে পৌঁছলাম। রেডিয়েটারে ইতিমধ্যেজল দিব্যি মনের আনন্দে ফুটছিল এবং প্রত্যেক আধঘণ্টাঅন্তর আমাদের গাড়ি থামিয়ে ভ্যাকুয়াম-ট্যাঙ্ক ভর্তি করতেহচ্ছিল।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা ৬০০০হাজার ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘোর বিপদ ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাতথেকে একটুখানির জন্যে রক্ষা পেয়ে গেলাম।

একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে ড্রাইভার দেখল, সেরকমসংকীর্ণ জায়গায় সে ঘুরতে পারবে না—আমরা পর্বতশৃঙ্গেরএকেবারে ধারে এসে পড়েছি। গাড়ি তখনই থামানো হল। রাস্তার যে অংশে সামনের চাকা ছিল, গাড়ির ভারেসেখানটি ভেঙে ঝুর ঝুর করে পাথরের টুকরো আর ধুলো খসে পড়তে লাগল।

একটু পরে দেখা গেল, একখানা সামনের চাকা শূন্যেভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন আবার আমরা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়েআস্তে আস্তে লরিখানা পিছু হটিয়ে নিরাপদস্থানে এনে দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে রাত্রিদ্বিপ্রহরের সময় বহুকষ্টে নিচের উপত্যাকস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছুই।

এই বিপদের পরে পথে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরকিছু ঘটেনি। পরদিন আমরা ত্রিশ মাইল পথ সহজেই উত্তীর্ণহলাম। মোড় ঘুরবার সময় এবার আমরা খুব সাবধানেদু-একবার পিছু হটে আস্তে আস্তে এঞ্জিন চালিয়ে মোড় ঘুরছিলাম। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে পাথরের ধারের নালা থেকে জল নিয়ে এঞ্জিনে দিতে হচ্ছিল। গাড়ির হর্নের আওয়াজে কখনো কখনো স্থানীয় জংলী লোকেরাগাছপালায় ঘেরা তাদের ক্ষুদ্র গ্রাম ছেড়ে দৌড়ে পথেরধারে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়েদেখছিল।

আমাদের চারপাশের বন একজাতীয় বন্যপুষ্পে অপূর্বশোভা ধারণ করেছে, ফুলটার বৈজ্ঞানিক নাম Bauhinia purpurea, ফুটলে মনে হয় যেন চারিদিকে শুভ্র তুষারপাত হয়েছে। অথচ নিদারুণ গ্রীষ্মে বনের বৃক্ষ এমন নিষ্পত্র—সেইসব পত্রহীন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকেডেনড্রোবিয়াম জাতীয় অর্কিডের ফুল ঝুলছে।

তৃতীয় দিনে শেষ গিরিবর্ত্মটা অতিক্রম করে আমরানীচের সমতলভূমিতে নামলাম, যদিও সেখানকার রাস্তাটাকম বিপজ্জনক নয়—পাহাড়ি ঝরনার জলের ধারায় পথেরমাঝে মাঝে বড় নালার সৃষ্টি করেছে। আমরা অবশেষে কেংটুং পৌঁছে গেলাম—মাঙ্গানে থেকে এর দূরত্ব ৪০০মাইল।

কেংটুং শহর ওই নামধেয় শান-রাজ্যের রাজধানী।যতগুলি ছোট বড় রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত শান-রাজ্য গঠিত, তার মধ্যে কেংটুং সর্বাপেক্ষা উন্নত। গাছপালার আড়ালেঅনেকগুলি প্রাচীনকালীন মন্দির চোখে পড়ল। স্থানীয়রাজার উপাধি সউবা। রাজপ্রাসাদ দেখে মনে হল যেনএকটি পিকচার-প্যালেস। রাজপ্রাসাদের পাশেই বাজার।বাজারটা দেখবার জিনিস, কারণ চতুষ্পার্শ্ববর্তী সকল পাহাড়ি জাতি তাদের বিচিত্রবর্ণের জাতীয় পোশাকে এখানেবাজার করতে নামে।

একদিন সউবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সউবার বয়সহয়েছে অনেক, সর্বদা পান খাবার অভ্যাস আছে। পানের পিচ ফেলবার জন্যে কাছেই একটা সোনার কলাইকরাপিকদানি। সউবার ছেলে অল্পবিস্তর ইংরাজি জানেন, তিনিইদোভাষীর কাজ করলেন। রাজপ্রাসাদের বাইরের দিকে দুটোবড় বড় হল; হলে অন্য কোনো আসবাবপত্র দেখলাম না, কেবল দেওয়ালে দু'খানা বড় আয়না টাঙানো আছে।

রাজা ধনী লোক। তাঁর নিজের একখানা মোটর-লরিআছে, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্যের সঙ্গে নানারকম কারবারওতিনি করেন। বাজারে শ্যামদেশীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু ইন্দো-চীনের ফরাসী মুদ্রার প্রচলন নেই। এর কারণ এই নয় যে, শান ও ইন্দো-চীনে ব্যবসাঘটিত মনোমালিন্য আছে।খরস্রোতা মেকং নদী ও বিরাট শৈলমালার বাধা অতিক্রমকরে শান-রাজ্য থেকে মালপত্র ইন্দো-চীন যাওয়া একরকম অসম্ভব। শ্যামরাজ্য দিয়ে যাওয়া অনেক সহজ ওসুবিধাজনক।

আরো একটা কারণ এই যে, শান-রাজ্যে উৎপন্ন শস্যাদিশ্যামরাজ্যের মধ্যে দিয়ে গেলে ১৭০ মাইলের মধ্যে রেলপথ পায়। শ্যাম স্টেট রেলওয়ের উত্তর দিকের সীমানাবর্তমানে চিং মাই-কেংটুং থেকে এখানে যাবার ভালো রাস্তাআছে, এ রাস্তা মোটর যাতায়াত করার পক্ষে তেমনসুবিধাজনক নয় বটে, কিন্তু ভারবাহী অশ্বতরের দল সর্বদাইযায়।

উভয় রাজ্য থেকে চেষ্টা চলছে এই রাস্তাটিকে মোটররোডে পরিবর্তিত করবার জন্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হবে তাহলে একথা বলাই বাহুল্য। রাস্তা ভালো নাবলেই এখনো কেংটুং-এর বাজারে স্কচ হুইস্কি ১৭ টাকায়বোতল বিক্রি হয়। রেঙ্গুনেই যার দাম অন্তত দশটাকা।কেংটুং থেকে আমার গতি সোজা পূর্বমুখে।

সেদিকে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আরো বেশি। এমনসব জায়গা আছে, যেখানকার অধিবাসীরা কখনো সাহেবদেখেনি।

নিকটবর্তী গোলাকার পাহাড়ের মাথায় কঅ নামেপাহাড়ি জাতি বাস করে—এরা শানজাতীয় লোকের চেয়েদেখতে ভালো এবং ব্রহ্মদেশীয় পার্বত্য জাতিসমূহের তুলনায় অনেকাংশে সভ্য ও নরম প্রকৃতির। আমি অশ্বতরচালাবার জন্যে কয়েকজন কঅ কুলি নিযুক্ত করেছিলাম, কষ্টকর চড়াই-এর পথে উঠবার সময় তারা মনের আনন্দে গান ধরে দিত। তাদের সুরের মাধুর্য বিশেষ কিছু বুঝতামনা, আমার মনে হত, এ যেন এরা নিজেদের মধ্যে পাল্লাদিয়ে চলেছে, কে কত চেঁচাতে পারে।

কঅবালক-বালিকাদের পোশাক বেশ সুন্দর। নানারংয়ের কড়ি ও পাথর দিয়ে পোশাকের প্রান্তভাগ সাজানো। শানদের পোশাকের মতো এদের পোশাক ঢলঢলে নয়, বেশ গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। শান-জাতির পুরুষমানুষেরাসাধারণত অত্যন্ত অলস, বাড়ির ছেলেমেয়ে নিয়ে বসেথাকে। মেয়েরা যায় মাঠে কাজ করতে। কঅ-দের মধ্যে কিন্তুএ প্রথা প্রচলিত নেই।

যত ছোটো গ্রামই হোক, প্রত্যেক গ্রামে একটা করে মঠ ওএকটা স্কুল থাকবেই।

সাধারণত মঠেই স্কুল বসে এবং দশ-বারোটি বালকজাফরানী রংয়ের পোশাক পরে সকালে বিকেলে সুর করেস্তোত্র আবৃত্তি করে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রেরা জলতোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাড়ে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটেআনে।

শান-জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনেহয় না। এরা ইউনান, ব্রহ্মদেশ ও আসামে সাম্রাজ্য পত্তন করেছে, কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এ রকম ঘটেছে কয়েকবার।যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তারা কোনোদিনই হারায়নি, এই যুদ্ধকরবার ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষা ও দলগঠন করবার ক্ষমতা যুক্তহলে চীন সীমান্তে শান-জাতির রাজনৈতিক উন্নতিঅবশ্যম্ভাবী।

এপ্রিল মাসের শেষ দিনে মেকং নদীতে খেয়া পার হয়েআমি অপর পারের ফরাসী রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুলাম।

খেয়া নৌকার অবস্থা দেখেই বোঝা গেল, উভয় রাজ্যের মধ্যে ব্যবসাগত সম্বন্ধ নেই বললেই হয়। আমার দলেরবারোটি অশ্বতর ও জিনিসপত্র পারাপার করতে অন্ততপাঁচবার নদী পারাপারের প্রয়োজন হল।

মেকং নদীর মূর্তি এখানে খুব শান্ত। কিন্তু নদীগর্ভে পাথরছড়ানো থাকায় নৌকা চলাচল এখানে খুব নিরাপদ নয়।

নদী পার হয়ে পথ ঢুকে গেল গভীর অরণ্যের ভিতর।বড়ো বড়ো লতা দুলছে গাছের ডাল থেকে, নানাজাতীয় অর্কিড, যেদিকে চোখ তাকানো যায় সেদিকেই। এখন অনেক গাছের ফুল ফুটে বনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। দু-দিন এই বনের মধ্যে দিয়ে যাবার পরে আমরা হেই সাই পৌঁছুলাম। তার পরেই মং সিং-এর সমতলভূমি।

স্থানীয় ফরাসী শাসনকর্তা আমার আগমনের সংবাদঅবগত ছিলেন না, কিন্তু জনৈক আসামী সিপাই আমায় বিদেশী দেখে সন্দেহ করে আমার পিছু নিলো। তারধরন-ধারণ দেখে মনে হল যে সে যেন নিউইয়র্ক বন্দরের ইমিগ্রেশন অফিসার। তার ওপর মুশকিল, আমি যেভাষাতেই কথা বলি সে কিছু বুঝতে পারে না। চীনা ওফরাসী ভাষায় কথা বলে দেখলাম, সে ঘাড় নেড়ে জানালেও ভাষা সে শেখেনি। আমার সঙ্গে বন্দুক দেখে সেঅস্বাভাবিক ধরনের গম্ভীর হয়ে গেল—কার অনুমতিতেফরাসী সীমা পার হয়ে আমি বন্দুক হাতে এসে ফরাসীরাজ্যে ঢুকেছি !

আমি ফরাসী শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম—না করলে কড়া আসামী সিপাই আমার পিছু ছাড়ে না। একটাবড়ো বাংলো আমার বাসার জন্যে নির্দিষ্ট হল। দু-খানা খুব বড়ো কাঠের খাট ছাড়া সে ঘরে আর কোনো আসবাবপত্র নেই।অশ্বতরচালকেরা আর অগ্রসর হতে চাইলে না, তাদেরপাওনা চুকিয়ে দিলাম। তারা কেংটুং ফিরে গেল।

মং সং এই অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।এখানে তিনটি সাম্রাজ্য এসে মিশেছে। ব্রিটিশ সীমান্ত মাত্র৪০ মাইল দূরে, চীন সীমান্ত তিন ঘণ্টার পথ, শান-রাজ্যেরসীমান্ত এক সপ্তাহের পথ। শীতকালে চীনা বণিক দলঅশ্বতরপৃষ্ঠে নানা দিক থেকে এসে মং সং-এর বাজারেপণ্যদ্রব্য নিয়ে জমা হয়। এখান থেকে লাওস যাবার দুটোপথ আছে।

একটা পূর্বদিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, দুদিনের পথ গেলে নাম্‌থা নদী, এখান থেকে নদীপথে ভেলাযোগে পৌঁছানো যায়।

আমি এই পথেই যাওয়া ঠিক করলাম। পাহাড়ি ঘোড়া জোগাড় করা গেল, তারা ভারী সতর্ক, দুরারোহ চড়াইয়েরপথে উঠতে অমন মজবুত জানোয়ার নেই। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে পাহাড়ের পথে কাদা হয়েছে—একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে বৃষ্টিধারার ধূসর আবরণের মধ্যে চেয়ে দেখি, যতদূর চোখ যায় শুধুই পাহাড়ের পর পাহাড়শ্রেণি, দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত।

নর্থ ক্যারোলিনার ধীবর দল

ডা. এপালারের বিবরণ হইতে :—

রোয়ানোক দ্বীপের শেওলা ও ছাতা ধরা জেটির ধারেপয়লা এপ্রিলের প্রত্যুষের অন্ধকারে ভীষণ ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রাচীনকালের একটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার দর্শকরূপে যেন আমি এখানে উপস্থিত রয়েছি।

ঝড় ও বৃষ্টি সেই আকাশ ও সেই জলরাশি থেকে আসছেযা একদিন স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ঔপনিবেশিকগণেরঅভ্যর্থনা করে সাদরে তীরে আহ্বান করেছিল, তখন তাঁরাএখানে প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করেন, রানী এলিজাবেথেরযুগে।

ঝড়ের মধ্যে ডিভনশায়ার অঞ্চলের উচ্চারণে কে যেন আমাকে জেটির খুঁটিগুলো জোর করে হাত দিয়ে ধরে থাকতে বললে। তার এই উচ্চারণ-রীতি আমায় একবারে ৩৪০ বছর পিছনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। আমার সঙ্গে কথা বললে মেল বোটের কাপ্তেন এবং যে ভাষায় সে কথা বললে সেটা রানী এলিজাবেথের যুগের ভাষা।

এখানকার ভাষায় ও আচার-ব্যবহারের প্রথম ঔপনিবেশিকদের চিহ্ন এখনো বর্তমান। এই তিনশ বছরেওতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কেবল সম্প্রতি ভার্জিনিয়া ট্রেন ও রাইট সেতু নির্মিত হবার জন্য সভ্য জগতের সঙ্গেরোয়ানোক দ্বীপের যোগ স্থাপিত হয়েছে।

মেলবোট নাম বটে, কাজে সেটা একপাটি জুতোরআকারের ছোটো একখানা জাহাজ। তার কেবিনের মধ্যেঅস্পষ্ট আলোতে অনেকগুলি যাত্রী বসেছিল, তার মধ্যেএকজন বৃদ্ধ যক্ষ্মার রোগী, অসুখে ভুগে প্রায় শেষ দশাউপস্থিত হয়েছে। আত্মীয়স্বজনেরা তাকে দূরবর্তী কোনোএক ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কেবিনেরএক কোণে একটা পেরেক দেখে তাতেই আমার টুপিটাটাঙিয়ে রেখে ডেকে গিয়ে বসলাম। আমার চারিধারে আলুর বস্তা, ঝিনুক-বোঝাই বস্তা এবং আরো নানা মালপত্র।এই সব জিনিসপত্রের মধ্যে নিজের সুটকেসটায় ঠেস দিয়েবসে আমি যে কর্মক্লান্ত জীবনটা পিছনে ফেলে এসেছি তারকথা প্রায় ভুলে গেলাম।

একটা ছোট শহরে আমি গত বিশ বছর ডাক্তারি করেআসছি। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে নর্থ ক্যারোলিনার উপকূল থেকে কিছুদূরে হ্যাটেরাস দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা আহূত হয়ে তাদের সেখানেই যাচ্ছিলাম। প্রায় ২৪০০ ধীবর পরিবারসেখানে বাস করে, তাদের মধ্যে ডাক্তারের বড়ই অভাব। এদের সরল জীবনযাত্রা আমায় অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল, তাই শহরের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এদের মধ্যে গিয়ে বাসকরতে কৃতসঙ্কল্প হই।

বর্তমান সভ্যতার সংঘর্ষ থেকে বহুদূরে জীবনের অনেক সুন্দর দিক দেখতে পাওয়া যায়। রোয়ানোক দ্বীপের অধিবাসীদের সরল চালচলন আচার-ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমাকে মানুষের চরিত্রের সেই সুন্দর দিকগুলিদেখিয়েছিল। প্রাচীন আমলের ইংলন্ডের ডিভনশায়ারকে এখানে এনে কে যেন স্থাপন করেছে। এলিজাবেথের যুগেরডিভন এই সুন্দর দ্বীপে এখনো বেঁচে আছে।

১৫৫৪ সালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে রানীএলিজাবেথের কাছ থেকে অনুমতিপত্র পেয়ে আমেরিকায়উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য জাহাজ রওনা করেন। ওই সালের জুলাই মাসে ঔপনিবেশিক দলের কর্তা আমাডাস ওবার্লো রোয়ানোক দ্বীপ আবিষ্কার করে এখানেই প্রথমউপনিবেশ স্থাপন করবার মতো করেন।

রোয়ানোক দ্বীপ তখন তরুলতায় ফুলপুষ্পে সমৃদ্ধ। তারাজায়গাটাকে এত পছন্দ করল যে, দুজন স্থানীয় ইন্ডিয়ান অধিবাসী সঙ্গে করে নিয়ে ইংল্যান্ডে এই দ্বীপ আবিষ্কারের কাহিনি প্রচার করতে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দ্বীপে উৎপন্ননানাবিধ দ্রব্য—তামাক, ভুট্টা, কুমড়ো, আঙুর, কোয়াশ এবংঅন্যান্য ফলমূল। এদের গল্পে ইংলন্ডে খুব একটা সাড়া পড়েগেল। পর-বৎসর র‍্যালেআর একদল লোক পাঠালেন। এখানে স্থানীয় উপনিবেশ স্থাপন করতে ও চাষ-আবাদেরব্যবসা করতে, এ দলে ছিল ১০০ জন লোক, স্যার রিচার্ডগ্রানভিল ছিলেন এদের নেতা।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট এরা রোয়ানোক দ্বীপেঅবতরণ করে। প্রথমে এরা একটা কাঠের দুর্গ তৈরি করলএবং তার নাম দিল ফোর্ট র‍্যালে। কিন্তু স্থানীয় ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে বেশিদিন এখানে বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র দলটি স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের সঙ্গে আবার জাহাজে ইংল্যান্ডফিরল। এর দুই সপ্তাহ মাত্র পরে ঔপনিবেশিকদেরসাহায্যার্থে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিল তারা রোয়ানোকদ্বীপে উপস্থিত হয়ে দেখল কাঠের দুর্গে লোকজন কেউ নেই।পনের জন্য মাত্র দুর্গে রেখে বাকি সৈন্য ইংল্যান্ডে ফিরে এল।

১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে র‍্যালে আর একটি দল পাঠালেন। তারা এসে দেখল, দুর্গের বা সেই পনের জন লোকের চিহ্নমাত্র নেই—কেবল একজন লোকের হাড়গোড় পাওয়া গেল।স্থানীয় অসভ্য জাতিরা নিশ্চয়ই বাকি সকলকে মেরে ফেলেছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে দলের কর্তা জনহোয়াইট ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করবার চেষ্টাকরলেন। তাদের একজন নেতাকে এরা লর্ড এফ রোয়ানোক উপাধি দিলে, এবং সে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করল।

ইন্ডিয়ান সর্দারের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পাঁচদিন পরে জন হোয়াইটের এক পৌত্রী জন্মগ্রহণ করে, এর নাম ভার্জিনিয়া ডেয়ার—এই মেয়েটি প্রথম ব্রিটিশশিষ্য, যে আমেরিকার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হল। এই মেয়েটিই নূতন উপনিবেশের সর্বপ্রথম নাগরিক।

কিন্তু এই পরিবারের পরবর্তী ইতিহাস বড় করুণ।

ভার্জিনিয়া ডেয়ারের পিতামাতা এবং আরো প্রায়কয়েকজন নরনারীকে রোয়ানোক দ্বীপে রেখে জন হোয়াইটইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিল, তিন বৎসর পরে ফিরে এসে দেখল দ্বীপে তাদের একজনও নেই। কেবল একটা গাছে CRO খোদাই

করা আছে। সকলে ভাবলে হঠাৎ শত্রুদ্বারা আক্রান্তহয়ে ওরা বোধ হয় সেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইন্ডিয়ান সর্দারেরবাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেওতাদের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

এটা বোঝা গেল তারা তাড়াতাড়ি কোথাও চলেগিয়েছে—বাড়ির চারিধারে অগ্নিদগ্ধ সিন্দুক, আসবাবপত্র, বহু মরচে-পড়া লোহার যন্ত্রপাতির চিহ্ন পাওয়া গেল। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে এঁদের সন্ধানার্থে অভিযানের পর অভিযানপাঠালেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতভাগ্যদের কোনো খোঁজইপাওয়া গেল না।

ওইসব ঔপনিবেশিক আমেরিকানরাএই নিভৃত স্থানেপ্রথম ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানি করে। এলিজাবেথেরযুগের ইংল্যান্ডের ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদএরাই প্রথম এখানে নিয়ে আসে।

জাহাজের দোলানির মধ্যে ডেকে বসে এইসব পুরাতন কথা ভাবছি, এমন সময় কেবিনের মধ্যে গোলমালের শব্দেআমার মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হল। বৃদ্ধ যক্ষ্মারোগীটি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

আমাদের জাহাজ হ্যাটেরাস দ্বীপের খাঁড়ির মধ্যে ঢুকল।একটা ছোট বোটে আমরা নেমে গেলাম। বৃদ্ধের মৃতদেহ নিয়ে তার আত্মীয়স্বজনেরা আর একখানা বোটে করেতীরের দিকে চলল।

দ্বীপে নেমে আমি যেখানে আশ্রয় নিলাম, একজন বৃদ্ধাধাত্রী ও নার্স সে বাড়ির মালিক। সমুদ্রের খাঁড়ির ধারের বাড়িটিতে সে একাই বাস করে। আমায় সে বললে—আমি তোমার নাইবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার জন্য রুটি তৈরি হয়েছে। নারকেল দিয়ে তোমার জন্যে কেকও তৈরিকরেছি।

বৃদ্ধার নাম—“মিস বাশি। সে অনেকদিন হল বিধবা হয়েছে, তার স্বামী উপকূল-রক্ষকের চাকুরি করত।

বৃদ্ধার ঘরের ফায়ারপ্লেসটা অনেকদিনের প্রাচীন। বহুপুরানো আমলের ইঁটের কাজ হিসেবে ফায়ারপ্লেসটাঅমূল্য। রোয়ানোক দ্বীপে আর একটি ছাড়া এত পুরানোফায়ারপ্লেস আর নেই শুনলাম। আর একটা যে আছে, সেটাআবার মিস বাশির চেয়েও পুরানো। তার চিমনিটা হার্ড উডের তৈরি, অদাহ্য করবার জন্য লবণজলে সেটাকে মাঝেমাঝে ধোয়া হয়।

খাওয়া শেষ করে আমি একটা কাঠের দোলনায় শুয়েবিশ্রাম করলাম। এই দোলনায় বৃদ্ধার দুটি শিশুসন্তান দোল খেয়ে মানুষ হয়েছিল।

বৃদ্ধা ধাত্রীর গল্প আমায় বড় আকৃষ্ট করল। তার গল্প শুনেমনে হল চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে বৃদ্ধার একটা নির্দিষ্ট স্থানথাকা উচিত ছিল। বৃদ্ধা খুব ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করতেপারে এবং তার মুখশ্রী দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ছেলেবেলায় সে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ স্কুলে গিয়েছিল, পড়তে সে শেখেনি, ঘরের কাজকর্ম, বাইরের কিছু কিছুকাজ এবং চরকায় সুতা কাটা শিখেছিল। ষোল বছরে তারবিবাহ হয়, একুশ বছর বয়সে জনৈক উপকূলরক্ষীর কুটিরেসে প্রথম প্রসূতি খালাস করবার জন্য আহূত হয়।

বৃদ্ধা বললে—ডাক্তার, আমি তখন কাজ কিছুই জানতাম না, মেহালি আমায় একখানা ডাক্তারি বই পড়ে শুনিয়েছিল, কারণ আমি নিজে পড়তে জানি না। শিশু ভূমিষ্ঠ হবেশুক্লপক্ষে, তাই দেখে আমি ঠিক করলাম এ শিশু নিশ্চয়ই মিতব্যয়ী হবে।

সমুদ্রের ধারে পাইন বনের মধ্যে বৃদ্ধা তার বাড়িতেযখন ছিল, সেখানে তার রুগ্ণ মাতা ওরই আশ্রয়ে থাকতেন, নিজের ছেলেমেয়েদের তো দেখতে হতই, তারভাইয়ের ছেলেমেয়েদেরও দেখাশুনা করতে হত। তা ছাড়াছিল গোরু, শূকর এবং বাসনমাজার কাজ। সংসারে এই সবদায়িত্বপূর্ণ কঠিন কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও গত ৪৫ বছর ধরে এইঅঞ্চলের সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও সেবা করে আসছে—ডাক্তার এসব জায়গায় ক্বচিৎ কখনো আসে। তার নেপোলিয়ানমানে ঘোড়াটা দু’চাকার গাড়িখানা করে তাকে টেনে নিয়েযেত রোগীদের বাড়ি, বন-জঙ্গল ও বালির চড়া কিছু নামেনে, শীত-গ্রীষ্ম ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে। সে ঘোড়া চড়তে পারত খুব ভালো এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ হাঁটতেও পারত। পায়ে হেঁটে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কতবার সে রোগী দেখেছে।

বৃদ্ধা তার নিজের মতো কতকগুলি ওষুধ তৈরিকরেছিল, অসুখ-বিসুখে ওষুধগুলো বেশ কাজ দিত।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি করে দিব্যি রুগীসারাও ?

বৃদ্ধা বললে—দেখুন ডাক্তার, কাজ করবার ইচ্ছাথাকলেই শেখা যায়। শেখার ইচ্ছার অভাব আমার কোনো দিনই হয়নি। ভালো ডাক্তারের উপদেশ মাঝে মাঝে মনদিয়ে শুনতাম, এর সঙ্গে নিজের বুদ্ধিতে যা কুলোয় তাযোগ করি।

বৃদ্ধা মাতা ও শিশুর সেবার জন্য ফি নেয় আড়াই ডলার—আজকাল বাড়িয়ে তিন ডলার করেছে।

বৃদ্ধা বললে—আমার চতুর্থ সন্তানটি আপনা-আপনিভূমিষ্ঠ হয়েছিল—যখন সে হয় তখন কাছে কেউ ছিল না।

বৃদ্ধার ভাষা ও উচ্চারণ-নীতি এলিজাবেথের যুগেরউচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো। এই ভাষা এ দ্বীপে বহুকাল ধরে চলে আসছে। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রেরিত লোকদল কর্তৃক এ ভাষা এই দ্বীপে আনীত হয়েছিল।

এই সব পুরানো আমলের ভাষা ও তার উচ্চারণ-রীতির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। heard, disremember, disencourage প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং ‘g'-এরউচ্চারণ বর্জিত aimin, goin, singin প্রভৃতি অষ্টাদশশতকের শব্দপ্রয়োগ, যে সময় ‘g'-এর উচ্চারণ সম্বন্ধেবিশেষ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হত।

মিস বাশির গল্প শেষ হবার পূর্বেই দরজায় কড়ানাড়ারশব্দ উঠল।

বৃদ্ধা বললেন—খিলটা খুলে ভিতরে এসো।

একজন সবল সুস্থকায় ধীবর প্রবেশ করে বললে—বনের উত্তর দিকে যে বাছুরটা চরছেসেটা তোমার নয় মিশ বাশি, মিস উইলি অ্যানের চিহ্ন তার গায়ে দেগে রয়েছে। আর একটা কথা, মি. জিয়ন আর মিস হোপির শরীর খারাপ। তারা এই মেয়ে ডাক্তারটিকে ডেকেছেন।

বৃদ্ধা উত্তর দিলে—আমার কোনো দোষ ধরো না। কিন্তুডাক্তার এখন বড়ই ক্লান্ত। কাল সকালে ভিন্ন ডাক্তার যেতেপারবেননা।

তারপর বৃদ্ধা আমার দিকে ফিরে একটা পুরানো দিনেরপাঁচন তৈরি করবার ছড়া বলে গেলেন। খুব ভালো ঔষধনাকি সেটা। সেবার মিস হোপির অসুখের সময় এইপাঁচনটা দিয়ে চমৎকার কাজ দেখা গিয়েছিল। কাটি কিংসিরছেলে যখন নর্থ ক্যারোলিনা থেকে বাড়িতে অসুখ হয়েআসে তখন এতে তাকে একবার সারিয়ে তোলে।

বাতিঘরের গোরস্থান থেকে আনতে হবে সাদা শেওলাসবুজ ও কচি পলিবডি আঙুরের পাতা তার সঙ্গে অমাবস্যার দিন তুলতে হবে, সব মিশিয়ে দুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করে একপাইন্ট থাকতে নামাও—

এ পাঁচনটা হল রক্তাল্পতার মহৌষধ। গায়ের চামড়ারহলদে ভাব ও চোখের হলদে রং নাকি সঙ্গে সঙ্গে সেরেযাবে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বাইরে গলার আওয়াজপেলাম।—আরাস্ক্রন, ডাক্তার এখনো যাবার জন্য মোটেইতৈরি নন। তবে তুমি যখন এসেছ তখন আমি গিয়ে বলছি।

মিস বাশি গিয়ে আমায় জানালেন—ডাক্তার, মিস গুলভ্যানির দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আপনাকে যেতে হবেবোধহয়।

আমিও বুঝলাম না গিয়ে উপায় নেই।

রোয়ানোক দ্বীপের রাস্তায় এখনো গোরুর গাড়ি চলে।তবে আমার জন্য যা এসেছিল তা গোরুর গাড়ি না হলেওএকে ঘোড়ায় টানা গোরুর গাড়ি বলা যায়। সেই বড়ো বড়োচাকা, সেই ধরনের বসবার জায়গা। অতিকষ্টে গাড়িতেচেপে বসা গেল।

রাস্তা নেই। সমুদ্রের উপকূলের বালির উপর দিয়ে সাতঘণ্টা গাড়িতে যেতে হবে। একদিকে তার সদাসর্বদা সমুদ্রেরঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গেমর্নিং বার্ডের শব্দ মিশছে, ঝড়ে বাঁকা বড়ো বড়ো গাছ পথেরদুধারে। ওক, পাইন ও হোলি গাছের গুঁড়ির অর্ধেকটা বালিরস্তূপে চাপা পড়েছে, সমুদ্রের জোয়ার নেমে গিয়েছে চড়াথেকে।

মনের মধ্যে একটা গভীর শান্তি। কাছেই একটা বালিরস্তূপে দীর্ঘগ্রীব এক বকজাতীয় পাখি বসে আছে। সমুদ্রেরঢেউয়ের অবিচ্ছিন্ন গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে উপকূলের অদূরেজেলেডিঙির আশেপাশে জলের উপর সিন্ধুশকুনের দলউড়ছে। ক্রমে লাল টকটকে সূর্য উঠে কুয়াশার আবরণ অপসারিত করেছিল। চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠল।

আমার গাড়িচালকটি বধির, সে বেশ একমনে গাড়িচালিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেই একটা মানব-দ্বীপ—বাহিরের জগতের সঙ্গে কোনো সংস্রবে না এসেও সে বেশ কাজচালিয়ে নিতে পারে।

উপকূলের দূরপ্রান্তে পুরানো আমলের হ্যাটেরাসঅন্তরীপের বাতিঘর ঘুরানো সিঁড়ির আকারে কালো ও সাদা রং করা। ১৮৬০-৯০ সালে যখন বাতিঘরটা প্রথম তৈরি হয়, তখন সমুদ্র থেকে ওর দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইল—এখন একেবারে সমুদ্রের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।প্রতি ছ'সেকেন্ড অন্তর ওর ৮০,০০০ হাজার ক্যান্ডেলপাওয়ারের আলো দূর সমুদ্রে ২০ মাইল দীর্ঘ একটাআলোকরশ্মি পরিয়ে দিচ্ছে।

খুব ঝড়ের সময় আলোর রশ্মিটা ৯ ইঞ্চি পরিমাণ স্থাননিয়ে দোলে। অর্থাৎ একবার উত্তরে এবং একবার দক্ষিণেবেঁকে যায়—ওই ৯ ইঞ্চির মধ্যেই। আটলান্টিক মহাসাগরেরএই উপকূলে ঝড়ে দুর্ঘটনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, ১২৫গজের মধ্যে এখানে ১৫টি ভগ্ন জাহাজের কঙ্কালবালিরাশিতে অর্ধপ্রোথিত হয়ে রয়েছে। এই ভগ্নপোতেরসমাধিস্থানে ফরাসী, পর্তুগীজ, স্পেনিশ, ব্রিটিশ ও গ্রীক—সবজাতির জাহাজ আছে।

হ্যাটেরাস দ্বীপের বাতিঘরের উপকারিতা এ থেকে বোঝাযাবে।

নরওয়ে দেশের একটা জাহাজের কঙ্কাল দেখিয়ে আমারগাড়োয়ান বললে—এই জাহাজখানা উদ্ধার করতে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছিল। ভয়ানক ঝড় বইছিল, আমরাদু'বার চেষ্টা করে কিছু করতে পারলাম না—শেষে সাতজন সেই সমুদ্রে দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে ছাব্বিশ জনকেউদ্ধার করে আনি। আমাদের দলের চারজন এবং ওদেরপাঁচজন আহত হল। সেই ধাক্কায় আমার হাত গেল ভেঙে।

গাড়োয়ান দেখলাম বর্তমান দিনের উপকূলরক্ষীদেরওপর খুব চটা। তখনকার দিনের লোকেরা দাঁড় বেয়ে সমুদ্রে যেতে ভয় পেত না, খাটতও খুব, ফাঁকিবাজি ছিল না। এখনএরা শুধু বসে থাকে আর মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়।

সমুদ্রের বালির মধ্যে এক জায়গায় ৮০ ফুট লম্বা একটাতিমি মাছের কঙ্কাল পড়ে আছে। সেটা দেখিয়ে গাড়োয়ানবললে—এই রকম কঙ্কাল আর একটু আগে আর একটাআছে। সেটার হাড় বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমি চেয়ার বানিয়েছি।

বাইবেলে যেমন থাকতে বলেছে, তেমনভাবে চলে আসছি জীবনে। মেয়েদের কখনো প্রশ্রয় দিই না বা তাদেরদিকে কখনো ঘেঁষি না। তাদের আমি বলি, সকল মানুষেরসেবা কর, যেমন বাইবেলে সেন্ট নীল করতে বলেছেন।ভগবান আমার তেরোটি সন্তান দিয়েছেন।

এর বাড়ির কাছে সমাধিস্থানে কতকগুলি কবরের ওপরপড়লাম :

মোজেলা মিজেট—২৮

মেহানি মিটে—২৯

আনসে মিজেট—৩০

সব আমাদের গাড়োয়ান আরস্কিন মিজেটের মৃত সন্তানের সমাধি। অনেকগুলি শিশু সন্তানের সমাধিওআছে। অধিকাংশই থাইসিসে মারা গিয়েছে।

যেতে যেতে দেখি অনেকগুলি লোক জড়ো হয়ে দূর থেকে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে কি বলতে চেষ্টা করছে। তাদের কাছে যেতেই বললে—মিস ভিয়েনার অবস্থা খুব খারাপ, সেখানে একবার যেতে হবে।

রোগীর বাড়ি গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে বুঝলাম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। উপকূলরক্ষীদের স্টেশন থেকেটেলিফোনে এমারজেন্সি এরোপ্লেন সার্ভিসের এরোপ্লেনআনিয়ে তাতেই রোগীকে ন'ফোক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমার সঙ্গী গাড়োয়ান বললে—ডাক্তার, ওই যেছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ও হল মিস ভিয়েনার বোনপো। যে রাত্রে ও জন্মায়, ওর মা একটা ভূত দেখেছিল—এবং বেশিদিন বাঁচেনি। মিস ভিয়েনাও কাল রাত্রে একটা ভূত দেখেছে।

আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম। গাড়োয়ানের এ কথায় কোনো উত্তর দিলাম না।

আমার দ্বিতীয় রোগিণী অল্পের মধ্যে সেরে উঠল।

একদিন দুপুররাত্রে আমি আলো নিবিয়ে শুয়েছি, চারজন লোক মি. নেভাডাকে নিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা আগে সমুদ্রে মাছ ধরবার সময়ে স্টিংরে নামে দুর্দান্ত হিংস্র মাছ তার পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

স্টিংরে মাছের কাঁটা লেজের আগায় থাকে—পাথরেরমতো শক্ত ছুঁচাল সরু জিনিস। ইঞ্চি দুই পায়ের মাংসেরমধ্যে ঢুকে গিয়েছে, ইঞ্চি তিনেক বার হয়ে আছে।

ওদের মধ্যে একজন বললে—মাছটা নেভাডাকে মেরেফেলবার চেষ্টা করেছিল, সেই জন্য আমরা তোমার কাছেওকে আনলাম। স্টিংরে মাছ মি. ড্যানিয়েলকে মেরেফেলেছিল এবং ক্রিস্টোফারের পা কেটে ফেলতে হয় ওই মাছের কাঁটার দরুন।

মি. নেভাডা আমায় বললেন—আমি তো মরবার জন্য তৈরি হয়ে আছি ডাক্তার। যখন বয়েস আমার ত্রিশ পেরিয়েগিয়েছে, তখনই আমার যা কিছু পাপপূণ্য সব তার হাতেতুলে দিয়েছি।

একটা মস্ত সুবিধা দেখলাম, গ্রাম্যলোকেরা তাদের যা-তা টোটকা ওষুধ নিয়ে ক্ষতস্থান ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। আমিতাদের একথা বললাম, ক্ষতস্থানে মাছের যে লেজের কাঁটাঢুকেছে তাও পরিষ্কার, এমন অবস্থায় পা কাটতে হবে কেন ?মিস বাশির রান্নাঘরের টেবিলে মি. নেভাডাকে শুইয়েফেলে আর দুজন লোক ও বৃদ্ধা ধাত্রীর সাহায্যে সেইসাংঘাতিককাঁটাটি উঠিয়ে দিলাম। ক্রমে রোগী সুস্থ হয়েউঠল।

এই রোগীকে সুস্থ করার পুরস্কারস্বরূপ আমি একটা বাড়িঅল্পদামে কিনতে পেলাম। এ দ্বীপের নিয়ম, এখানে কেউভদ্রাসন বাড়ি দেয় না বা বাইরের লোককে বেচে না।সমুদ্রের ধারে ছোটো ছোটো বাড়ি দেখে কতবার কিনবার চেষ্টাকরেছি, কোনো ফল হয়নি। আর মি. নেভাডা নিজে থেকেইবললেন—ডাক্তার মিনসির যে বাড়িটা তুমি কিনতেযাচ্ছিলে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার কাছে ওরাবেচে।

সমুদ্রের একটা ছোটো খালের ধারে বাড়িটা। পুরাতনআমলের তৈরি জাহাজডুবির দরুন কাঠ সংগ্রহ করে সেইকাঠ দিয়ে গড়া। একদিকে খাল, অন্যদিকে বাড়ির তীরে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জনধ্বনি। সরু রাস্তার দু'পাশে বড়ো বড়ো ওক, হোলি ও মার্টল গাছের সারি। ইউনিমাস বলে একটাগাছ ঠিক কমলালেবুর গাছে মতো দেখতে। নিকটতম প্রতিবেশীও একপ্রকার দূরেই বাস করে।

বাড়িটা কিনে নিলাম, পরের বাড়িতে বেশিদিন থাকাচলে না। মিস্ত্রি আনিয়ে কিছু অংশ নতুন করে তৈরি করেনিতেও হয়েছে।

স্থানীয় জেলেরা বলে—আমাদের এখানে সমুদ্রের ধারে এমন সাজানোবাড়ি আর নেই।

হোরেস :রোমের পল্লীপ্রকৃতির কবি

প্রাচীন রোমানগণ কবি ও ভবিষ্যদ্বক্তা বোধক একটি মাত্রশব্দ ব্যবহার করত।

কেমন করে তাদের বিশ্বাস হয়েছে যে, প্রতিভাবান কবিআর দ্রষ্টা আসলে একই মানুষ। দুহাজার বছর আগে একজনকবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য রকমেসফল হয়েছে বলা যায়। এক পরম আনন্দের মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন :

“আমি কখনো একেবারে মরব না। হয়তো আমার এহাড় কখানা সমাধিস্থ করা হবে, কিন্তু আমার নাম ও আমারকবিতা হবে মৃত্যুজয়ী, যত দিন যাবে, তাদের যশঃসৌরভও তত বর্ধিত হবে।”

তাঁর ভরসা হয়তো অনেক কমে যেত, যদি তিনি রোমানসাম্রাজ্যের পতন মানসদৃষ্টিতে লক্ষ করতেন, বর্বর ভ্যান্ডালগণ কর্তৃক সাম্রাজ্যের ধ্বংস লক্ষ করতেন। কিন্তুতাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে—আজ সিজারদের প্রাসাদের চিহ্ন নেই, সাম্রাজ্যের বহু জয়স্তম্ভ কালের কোলেবিলীন, রোমান ফোরাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—কিন্তুপৃথিবীর সাহিত্যের উপর সে প্রাচীন কবির প্রভাব এখনোজীবন্ত।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর হোরেস ভেনুসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর পুরো নাম কুইন্টাসহোরেসিয়াস ফ্ল্যাকটাস। ভেনুসিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব ২৯১ অব্দে সামাইট যুদ্ধের কিছু পরেই রোমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়।অ্যাপেনাইন

পর্বতমালার পাদমূলে অবস্থিত এই সুন্দর উপনিবেশটি কখনো খুব উন্নতি করতে পারেনি বর্তমানে এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা সবসুদ্ধ ন'হাজারের বেশিনয়—এর বর্তমান নাম ভেনোসা।

এই নগরে একটি সুপ্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনো বর্তমান, স্থানীয় লোকের কাছে এটা কাসা ডিওরোজিও বলে পরিচিত। সকলের বিশ্বাস, হোরেস এইবাড়িতে বাস করতেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণ বড়ই ক্ষীণ।এখানে হোরেসের একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। ভাস্কর্য হিসাবেএর মূল্য আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন গ্রন্থে ভেনুসিয়ারউল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়, এখনো পর্যন্ত এই নগরের সম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, হোরেসএখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখন যেখানে নগরের সাধারণ বাজার, সেখানে প্রাচীনযুগে নগরের ফোরাম ছিল। গ্রাম্য কৃষকেরা তাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলমূল বিক্রয়ার্থ নিয়ে আসত, দু-একখানাদোকানে জিনিসপত্রের সামান্য কেনাবেচা চলত।

হোরেসের পিতা পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। স্বাধীন হওয়ার পরে জনৈক পোদ্দারেরকর্মচারী হিসাবে চাকুরি করে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জনকরেন।

ভেনুসিয়ার স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষারপরে হোরেস পিতার সঙ্গে রোম নগরে উচ্চশিক্ষার জন্যযান। তাঁর ব্যঙ্গকবিতার গ্রন্থের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ কবিতায়হোরেস তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরেছেন। হোরেসের ধনশালী পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালকম্যাকেনাসের উদ্দেশে এই বইখানা লিখিত।

বালকেরা সাত বৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রেরিত হত।অক্ষর পড়তে ও লিখতে শেখা এবং সামান্য অঙ্ক কষা শিখতে পাঁচ বৎসর কেটেযেত। মোম ঢালাই করা শ্লেটেরউপর ধাতুনির্মিত সুঁচালো কলম (stylus) দিয়ে ছেলেরালিখতে শিখত। গ্রীক ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণপ্রণালী ওবানান-প্রণালী ও বানান-রীতি এই সব প্রাথমিক পাঠশালায়একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

তারপরে ভালো ভালো উপদেশমালা, প্রবাদবাক্য ওউৎকৃষ্ট সাহিত্য থেকে সংগৃহীত অংশ মুখস্থ করতে হত। অঙ্কশাস্ত্র শেখাতে কিছু বেশি সময় ব্যয় করার রীতি ছিল।

হোরেসের পিতা পুত্রের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ওবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে বুঝতে পারলেন যে গ্রাম্য বিদ্যালয়েবেশিদিন একে রাখা চলবে না। তাই তিনি ছেলেকে এনেরোমে বড়ো স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকটিবেজায় কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কথায় কথায় বেত্র ব্যবহার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রীতিমতোত্রাসের সঞ্চার করে রেখেছিলেন। তাঁর এই নতুন ছাত্রটির কাব্যে সেই হেডমাস্টার অমর হয়ে আছেন।

এই উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিলরোমান গ্রীক সাহিত্য। বেশি জোর দেওয়া হত কাব্যশাস্ত্রের উপর। বড়ো বড়ো কবিদের কাব্যের ভালো ভালো অংশ মুখস্থরাখার পদ্ধতি ছিল, ব্যাকরণ নিয়ে বড় কড়াকড়ি ছিল।জ্যামিতি, সঙ্গীত, নৃত্যকলা বিষয়েও অনেক বিদ্যালয়েশিক্ষা দেওয়া হত।

হোরেস বড়ো হয়েও যখন দেশ-প্রসিদ্ধ কবি বলে পরিচিতহন, তখন তাঁর নিজের কাব্যের অংশ রোমের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে।

এর পরেও উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রেরা কোনোনামজাদা বক্তার কাছে গিয়ে কিছু দিন ধরে শিখত বড়োসভায় দাঁড়িয়ে কি করে বক্তৃতা করতে হয়। বাগ্মিতা শিক্ষাই ছিল প্রাচীন রোমের চরমতম উচ্চশিক্ষা। কেউ কেউ এরসঙ্গে অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের চর্চা করত।

রোমে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পরে হোরেস গ্রীসেপ্রেরিত হন, গ্রীক পণ্ডিতদের কাছে তদ্দেশীয় সাহিত্য ওদর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে।

এটা হল জুলিয়াস সিজার নিহত হওয়ার বছরখানেক বা তার কিছু বেশি পূর্বের ঘটনা।

ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস যখন গ্রীসে যান, তখন একদলপ্রবাসী রোমান ছাত্র তাঁদের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে পড়ে।হোরেস সেই দলের একজন। ব্রুটাসের শাসনাধীনে তিনিট্রিবিউনের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু ফিলিপের যুদ্ধে পরাজিতহয়ে পদচ্যুত হন।

এই যুদ্ধের সময় তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, যুদ্ধান্তে রোমে প্রত্যাবর্তন যখন করেন, তখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। কবিতা লিখে ও কবিতাবিক্রি করে তিনি অন্নসংস্থানের চেষ্টা করেন কিছুদিন। কিন্তুকবিতার বাজার চিরকালই খারাপ, তখনো যা ছিল, দু-হাজার বছর পরে আজও সেই অবস্থা। কিছুদিন পরেহোরেস বুঝলেন, কবিতা বিক্রয়ের আয়ের ওপর নির্ভরকরতে হলে তাঁকে উপবাসে দিন কাটাতে হবে। অনেকচেষ্টার পরে কুইন্টাসের দপ্তরে তিনি একটি কেরানীগিরির চাকুরি পেলেন—তারপর তাঁর অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হয়েউঠল।

এই সময় বিখ্যাত কবি ভার্জিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়হয়, এবং ভার্জিলই হোরেসের ইটালিতে প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পরে তৎকালীন বিখ্যাত ধনী, শিল্প ও কাব্যের বড়পৃষ্ঠপোষক সেয়াস সিলিয়াস ম্যাক্‌নোসের সঙ্গে হোরেসেরপরিচয় করিয়ে দেন।

এই অভিজাতবংশীয় রোমান একজন বিশিষ্টসাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। প্রধানত তাঁরই প্ররোচনায়অক্টোভিয়াস রাজদণ্ড গ্রহণ করতে উৎসাহিত হন এবংআগস্টাস নাম গ্রহণ করেন। সম্রাট কর্তৃক তিনি সমস্তইটালির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দেশের মধ্যেনিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

ম্যাকেনাস প্রভূত সম্পত্তি ও অর্থের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং নিজেও যথেষ্ট বিত্ত অর্জন করেন। এসকুইলিন পর্বতে তাঁর সুরম্য প্রাসাদ সে যুগের সকল বড়ো বড়ো কবি ও লেখকের মিলনস্থল ছিল।

এসকুইলিন পর্বতের বিখ্যাত উদ্যান ম্যাকেনাস প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে এইখানে মহামারীর আড্ডাস্বরূপ অতীবঅস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ছিল—আশ্চর্য নয়, যখন আমরা শুনিযে বহুকাল ধরে এইখানে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিভূমি ছিল। ম্যাকেনাস এই পচা জমির উপর অনেক উঁচু করে মাটি ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটিকে শুকনো খটখটে করে, তারপর অতি সুন্দর বাগান তৈরি করে সমস্ত জলাটাকে তিনি অপরূপ সৌন্দর্যভূমিতে পরিণত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, আজকাল যাকে বলে ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনিং অর্থাৎ প্রাকৃতিকদৃশ্যাত্মক উদ্যান আমেরিকায় বা ইউরোপে যে শিল্প অবলম্বন করে বহু লোকে অন্নসংস্থান করছে, সেই প্রাচীন যুগেররোমেও এ আর্ট অজ্ঞাত ছিল না। ভারতবর্ষেও যে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মোগলযুগের উদ্যান গঠনের রীতিদেখে—যদিও অবশ্য তা অনেক পরের কথা।

জলাভূমিকে সুন্দর উদ্যানে পরিণত করার এইসাফল্যকে চিরস্মরণীয় করেছেন হোরেস তাঁর অমর কাব্যেরপ্রথম খণ্ডে। প্রবাদ এই যে, ম্যকেনাসের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদ থেকে নৃশংসনীরো রোম নগরির দাহ্যমান দৃশ্য আনন্দে উপভোগকরছিলেন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপআবিষ্কৃত হয়েছিল সান্টা মারিয়া ম্যাজ্‌জোর ও ল্যাটেবাননদীর মাঝামাঝি স্থানে। অনেকে অনুমান করেন, এই বাড়িটাএক সময়ে ম্যাকেনাসের উদ্যানস্থ অভিনয়মঞ্চের প্রেক্ষামণ্ডপছিল। ঘরটি চতুষ্কোণ এবং এর উত্তরদিকে অনেকগুলি সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, এগুলি এক সময়েথিয়েটার দর্শকদের বসবার আসন ছিল।

ম্যাকেনাস হোরেসকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন।হোরেসের ওপর তাঁর প্রভাবও ছিল খুব বেশি। ম্যাকেনাসহোরেসের যা কিছু উপকার করেছিলেন, হোরেস তা শোধদিয়েছিলেন ম্যাকেনাসকে নিজের কাব্যের মধ্যে অমর করেরেখে। নইলে আজ কে এই ধনী রোমানদের কথা মনেরাখত ?ম্যাকেনাসের অনিদ্রা রোগের কথা আমরাহোরেসের কাব্য থেকে জানতে পারি। আমরা জানতে পারিম্যাকেনাসের নানা খামখেয়ালীর কথা। রাত্রে সুনিদ্রা হবে কিসে ?অনেক ভেবে ম্যাকেনাস একটা কৃত্রিম জলপ্রপাতবানালেন, শোবার ঘরের অদূরে, যাতে তার ঝরঝরজলপতনের শব্দে তাঁর নিদ্রাবেশ হয়। একদল বাদক নিযুক্তকরলেন, তারা বসে বীণায় বাজাবে মৃদু, নিদ্রাকর্ষক সুর।

ম্যাকেনাসের পরামর্শে সম্রাট অগস্টাস হোরেসকে কিছুভূমি দান করেন। এই স্থানটি রোমনগর থেকে কয়েক ঘণ্টারপথ মাত্র। লুক্রিটিলিস শৈলের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র মনোরম অরণ্যাবৃত উপত্যকা হিসাবে এর প্রাকৃতিক দৃশ্যছিল অতি সুন্দর।

হোরেসের বাসভূমির প্রকৃত অবস্থান নিরূপিত নাহলেও মোটামুটি সে জায়গাটা নির্ণয় করা কঠিন নয়। তাথেকে বোঝা যায় যে, হোরেস তাঁর এই পল্লীভবনে অত্যন্তসুখে দিন কাটাতেন, অথচ সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি ও রাজনীতির কেন্দ্র থেকে তাঁকে বেশি দূরে অবস্থান করতেহত না।

তাঁর পুস্তক থেকে যতটা জানতে পারি, পল্লী-বাটিকায় হোরেসের দৈনন্দিন কাজ ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

প্রাতঃকালে উঠে তিনি লেখাপড়ার কাজে ব্যস্তথাকতেন, নটার সময় রুটি ও মধুর সংযোগে প্রাতঃভোজনসম্পন্ন করতেন। কখনো কখনো তার সঙ্গে পনীর ও শুষ্কফলও থাকত। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে তিনি একটু বেড়াতে বার হতেন। মধ্যাহ্নেভোজন শেষ করে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে হোরেস তাঁর গৃহের অদূরে একটিবৃক্ষের ছায়ায় সাধারণত শয়ন করতেন। নিকটেই বয়ে যেতএকটি কুলুকুলু নদী—ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী। বৈকালটিতে তিনিসাধারণত বেড়াতেন এবং কিছু শারীরিক ব্যায়াম করতেন। অপরাহ্ণ চারটার সময়ে দিবসের প্রথম প্রধান ভোজন সম্পন্ননিষ্পন্ন হত। এতে আয়োজনের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণত ডিম, লেটুস, জলজ শাক, মধু প্রথমে খাওয়া হত। পরে বহু রকমভোজ্যের ডিশ আসত। তার মধ্যে থাকত মাছ, মুরগির মাংস, পক্ক ও টাটকা ফল, পিষ্টক ও মদ্য। পরবর্তী যুগে এইবৈকালিক আহারের ভোজ্যের সংখ্যা রোমানদের মধ্যেক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রসালাপ করতেন, নয়তো গায়ক কিংবা বাদকদিগের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শুনতেন।হোরেসের পল্লীভবনের চতুর্দিকে ছিল শ্যামল মাঠ, শস্যক্ষেত্র, নিকটেই ছিল একটি সুন্দর বনভূমি, ছাগচারণেরক্ষেত্র এবং একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী। তাঁর একটি সুন্দর ক্ষুদ্রকবিতা এই পার্বত্য ঝরনার উদ্দেশ্যে লিখিত। তাঁর দ্বিতীয়কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ কবিতায় হোরেস নাগরিক জীবনেরঅসাধারণ ও পল্লীজীবনের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।কবিতাটির প্রতি পংক্তিতে গ্রামবাসে তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি ওসন্তোষের আভাস পাওয়া যায় এবং সমগ্র কবিতাটি তাঁরসদয় পৃষ্ঠপোষক ম্যাকেনাসের উদ্দেশ্যে লিখিত ধন্যবাদেরবাণী।

“আমি চিরকাল এই চেয়ে এসেছি—এক টুকরো জমি, যা খুব বড়ো না হলেও আমার চলবে। একটুখানি বাগান, তার সঙ্গে থাকবে ছোটো একটা বনভূমি। কিন্তু দেবতারা সদয় হয়ে তার চেয়ে অনেক বেশিই আমাকে দিয়েছেন, আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, তাঁদের কাছে যা পেয়েছি, আমারজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন তা ভোগ করতে পারি।”

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করতেন। এরা গ্রাম্য লোক, সরল ছিল এদের চরিত্র। হোরেস লিখে গিয়েছেন, এরা পরনিন্দা, পরচর্চা করতেঅভ্যস্ত ছিল না, ভোজন সমাপ্ত করে অনেকেই সরল গল্পবলত।

তার এই ‘ইশোডস’ কবিতাবলীর দ্বিতীয়টিতে হোরেসআর একবার পল্লীজীবনের সুখ বর্ণনা করেছেন। কবিতাটিতে একটি সুদখোর কৃপণ মহাজনের চরিত্র বর্ণিতহয়েছে। রোমে তার ব্যবসাতে ক্ষতি হওয়ায় সে ভাবলেশহরের বাস উঠিয়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে সে চাষার কাজকরবে। “তার মতো সুখী আর কে আছে, ব্যবসার ঝঞ্ঝাটতাকে পোয়াতে হয় না ?প্রাচীন কালের লোকের মতো সে সরল জীবনযাপন করতে পারে। নিজের লাঙল গোরু দিয়েনিজের জমি সে নিশ্চিন্তে চষতে পারে, টাকা ধার দেওয়ারব্যবসায় যে দুশ্চিন্তা তা তাকে পোয়াতে হয় না। আদালতেতাকে ছুটতে হয় না মামলা করতে, বড়োলোকের বাড়ির উঁচুগাড়িবারান্দার তলায় তাকে বসে থাকতে হয় না। সে মনেরআনন্দে পরম আরামে কোনো প্রাচীন গাছের শীতল ছায়ায়ঘন তৃণশয্যায় শুয়ে নিকটবর্তী ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর কুলুকুলুধ্বনি উপভোগ করতে পারে।

“যখন শীতকাল আসে, বৃষ্টি ও তুষারপাত শুরু হয়।তখন সে শিকারি কুকুর নিয়ে শিকারে বার হতে পারে, কিংবা বনে ফাঁদ পেতে থ্রাস পাখি ধরতে পারে। আর যদি তার গৃহে অ্যাপুলিয়ান প্রদেশের শক্ত মেয়ে গৃহিণী হিসাবে থাকে তবে তো কথাই নেই। বাড়ি ফিরে সে দেখতে পায় কাঠের গুঁড়ির আগুন করা হয়েছে চিমনিতে, তার ছোটোছোট ছেলেমেয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে সেখানে আগুনপোয়াতে জড়ো হয়ে বাপের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করছেআগ্রহে—তবে আর মানুষে কি চাইবে ?

“অনেকে হয়তো লুসার্নের ঝিনুক ভালোবাসে, কিংবা টারবট মাছ, কিংবা টার্কি, অথবা হয়তো আহয়োনিয়ান, তিত্তির পাখি—ওসব আমি চাইনে, যদি গৃহিণীর হাতে তৈরিসাদাসিদে সামান্য খাদ্য খেতে পাই।”

এই হল সুদখোর মহাজন আলকিউয়ূসের কথা।

প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখে সে সব টাকাকড়ি আদায়করে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুতহয়—কিন্তু যেমনি পরের মাসের পয়লাটি আসে সমস্ত টাকা দাদন দিয়ে সে শহরকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরে।

বর্তমান ইটালির সুন্দর চওড়া রাজপথগুলি দিয়ে যাঁরালিমোসিন হাঁকিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান, তাঁদের কাছে হোরেসের কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ব্যঙ্গ-কবিতায় রোমের তৎকালীন রাজপথে ভ্রমণের বর্ণনা অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদহবে। কি ভয়ানক তফাত তখনকার ও এখনকার ভ্রমণেরসুখ-সুবিধায়।

অ্যাপিয়ান রাজপথ তখন ছিল, এখনো আছে, দেশেরএকটি বড়ো ও বিখ্যাত রাজপথ।হোরেস এই পথে সমুদ্র-তীরবর্তী কোনো একটি স্থানেযাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন।সরাইখানাটি যেমন অপরিষ্কার তেমনি নানারকমেঅসুবিধাজনক। প্রথম তো সেখানকার রেট বড় চড়া, তারপর সরাইরক্ষক লোকটি অভদ্র জুয়াচোর।

বিছানায় পালকভর্তি তোশক আছে বলে দাম আদায়করলে, শেষে দেখা গেল তোষকের মধ্যে খড়ভর্তি।

হোরেসের সময়ে রোমে প্রধানত দুরকম যানের ব্যবহারছিল—“লেকটিকা’ আর ‘রেডা’। ‘লেকটিকা’ এক ধরনেরপালকি বা ডুলি, এর ছাদ ছিল চামড়ার তৈরি, বসবার জন্যভিতরে নরম গদি দেওয়া থাকত, মাথা রেখে বিশ্রাম করবারব্যবস্থাও ছিল। মালিকের পদবী ও টাকার জোর অনুসারেলেকটিকা দুই থেকে ছয় বা আটজন ক্রীতদাস বয়ে নিয়েযেত। এই পালকির একটা সুবিধা এই ছিল যে, শহরে ওপল্লীপথে সর্বত্রই চলত, কিন্তু চক্রযুক্ত যান সে সময়ে শহরেপ্রবেশ করতে পারত না।

‘রেডা’ চার চাকার বড় গাড়ি, এতে জিনিসপত্র ও অনেকলোকজন নিয়ে ভ্রমণ করবার সুবিধা ছিল।‘রেডা’ অশ্বতরেটানত, বড়লোক অশ্বতরের পরিবর্তে সুসজ্জিত গল্‌দেশীয়ঘোড়া ব্যবহার করতেন।

হোরেস যাচ্ছিলেন রোম নগর থেকে ব্রিন্দিসি। বেশি লোক ছিল বলে ইনি রেডায় গিয়েছিলেন মনে হয়। বোধহয় তাঁর যাবার খুব তাড়াতাড়ি ছিল, কারণ রোম থেকে ৫৬ মাইল দূরে চেরাচিনয়ে তিনি পৌঁছান তিনদিনে।

যাদের বেশি তাড়াতাড়ি নেই, এমন পথিকদের জন্যেহোরেস লিখে গিয়েছেন, অ্যাপিয়ান ওয়ে নামক বিখ্যাত রাজপথটিই ভালো। অন্যান্য পথে ঝাকুনি যতটা লাগে, অ্যাপিয়ান ওয়েতে অত ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয় না।

ফোরো অ্যাপিও থেকে খানিকদূর হোরেসকে খালপারনৌকায় যেতে হয়। উঃ, সে কি ভীষণ কষ্টের ব্যাপার !ক্রীতদাসগুলো মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছে, বড় বড় মশা, দুধারে জলাভূমি, সারারাত ধরে একঘেয়েব্যাঙ-ডাকানির চোটে ঘুম অসম্ভব হয়ে পড়ল, এরই মধ্যেআবার একজন মাতাল মাঝি তার প্রণয়িনীর উদ্দেশে গানকরতে লাগল। অনেক কষ্টে হোরেসের একটু ঘুম এসেছিল; কিন্তু ভোরে উঠে দেখলেন মাঝি ও ক্রীতদাসেরা সারারাত্রিঘুমিয়েছে, সারারাত্রি নৌকা একদম এগোয়নি।

দৈনন্দিন জীবনে সামান্য সামান্য আনন্দকে হোরেস তাঁরকাব্যে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্য এই দুই হাজারবছর ধরে সকল ক্লাসিক কবিতার ভক্তের প্রিয়। তিনি তাঁরকাব্যে এক জায়গায় বলেছিলেন, তাঁর এইসব কবিতা পিরামিডের অপেক্ষা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে।

তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

উড়ো-জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণ

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার অ্যালান কবহামের বর্ণনা হইতে:—

আমার কাজের খাতিরে গত পাঁচ-ছ’বছরের মধ্যেআমাকে পৃথিবীর নানা স্থানে বেড়াতে হয়েছে।

এই সূত্রে আমাকে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতেযেতে হয়েছে এবং আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত স্থানে আমিগিয়েছি।

বিশাল সিরীয় মরুভূমি পার হয়ে আমাকে কয়েকবারভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ যেতে হয়েছে এবং কিছুদিন পূর্বেও আমি আকাশপথে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, ফিরবার পথেরেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও ডাচ ইন্ডিজ হয়ে আসি।

অথচ স্টিমারে চড়ে আমি আটলান্টিক পার হয়েছি মাত্র সেদিন, সাউদামটন থেকে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। এখন আমার মনে হয়, আমি এয়ারপ্লেন বা সি-প্লেনে যেসবজায়গায় গিয়েছি, সেসব দেশের স্মৃতি আমার মনে অত্যন্তরমণীয় ও উজ্জ্বলভাবে বর্তমান আছে। স্টিমারে, ট্রেনে বামোটরে যেসব জায়গায় গিয়েছিলাম, তার মূর্তি আমার মনে অত স্পষ্ট নয়।

১৯২৩ সালের প্রথম দিকে আমি আকাশপথে সমগ্রইউরোপ, ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং স্পেনের ওপর দিয়ে প্রায় বারো হাজার মাইল বেড়িয়ে আসি। আমার এক পুরাতন বন্ধু ছিলেন আমার সহযাত্রী। তাঁর শখ ছিল ভ্রমণ ও প্রাচীন সভ্যতার স্থানগুলি পরিদর্শনকরা।

এর আগেও আমি বহু হাজার মাইল বেড়িয়েছি, কিন্তু এবারের ভ্রমণটা খুব দীর্ঘ ব্যাপক ধরনের ছিল।

লন্ডন থেকে আমরা প্রথমে উড়ে যাই প্যারিসে, তারপরফরাসী দেশের মধ্যে দিয়ে রিভিরা উপকূলভাগের উপরদিয়ে ইটালী হয়ে গ্রীসে যাই, সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ও ইজিপ্টে যাই।

তারপর আকাশপথে ভ্রমণের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমরাআড়াআড়িভাবে আফ্রিকা পার হই,—ইজিপ্ট থেকে মরক্কোপর্যন্ত। জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপর দিয়ে আবার ভূমধ্যসাগর পার হয়ে স্পেন ও ফ্রান্সের পথে লন্ডনে আসি।

আমার সহযাত্রীটির একটা বিশেষ আগ্রহ এই ছিল যে, প্রাচীন সভ্যতার রঙ্গভূমিগুলি তিনি আকাশ থেকে দেখবেন। এইজন্যই আমাদের ইটালীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বাএড্রিয়াটিক সাগরের ওপর দিয়ে কর্ফুপর্যন্ত গ্রীসের পর্বতময় উপকূল পার হয়ে করিন্থ উপসাগর থেকে এথেন্স পর্যন্তযাওয়া।

এথেন্সে আমরা আক্রোপোলিস আকাশের উপর থেকেইদেখি। তারপর কয়েকদিন এথেন্স শহরে অবস্থান করবারঅবকাশে পার্থেনন ও স্টেডিয়াম দেখতে যাই।

আমরা যেদিন এথেন্স ছেড়ে যাই, দিনটা ছিল ভারিসুন্দর। আকাশ মেঘশূন্য নির্মল। ইজিয়ান সাগরের উপরদিয়ে উড়ে আমাদের চোখে শীঘ্রই ক্রীট দ্বীপ পড়ল।আমাদের নীচে আইডা পর্বতের তুষারাবৃত শিখর সূর্যকিরণেঝকঝক করছিল।

তারপর তিন ঘণ্টা ধরে আর ডাঙা দেখি না, নীচের দিকে শুধু জল আর জল—ভূমধ্যসাগর। তিনঘণ্টা পরেবহুদূরে নীচের দিকে কৃষ্ণ সরলরেখার মতো আফ্রিকারতীরভূমি দৃষ্টিগোচর হল। আমরা যাব সল্লাম নামে জায়গার এরোড্রোমে। দেখলাম তীরভূমির যেখানে গিয়ে আমরাপৌঁছাব, সেখান থেকে সল্লাম এক মাইলের মধ্যে।

সল্লাম মরুভূমির সীমান্তে অবস্থিত একটি সামরিক ঘাঁটি।সেদিন রাত্রে আমরা স্থানীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক একটি ভোজেআহূত হই। সেই ভোজসভায় উত্তর-পশ্চিম ইজিপ্টেরশাসনকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণের কষ্টের কথা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেনযে, সকালবেলাই তাঁকে মোটরে সিউয়া রওনা হতে হবে।আমি ম্যাপ দেখে বুঝলাম সিউয়া এখান থেকে ২০০ মাইলদক্ষিণে লিবীয় মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। উক্ত শাসনকর্তাবললেন সিউয়া পৌঁছাতে মোটরে লাগবে দুদিন।

আমি প্রস্তাব করলাম, তিনি এরোপ্লেনে যদি যেতে রাজি থাকেন, দু ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সেখানে পৌঁছে দেব।

তিনি আগ্রহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।

আমরা পরদিন সিউয়া পৌঁছে একটা সমতল জমিতেএরোপ্লেন নামালাম, এই জায়গাটিতে পূর্বে একটি লবণাক্তহ্রদের খাত ছিল—এখন পলি পড়ে পুরে উঠেছে। পূর্বেইটেলিফোনে আমাদের আগমন-বার্তা জানানো হয়েছিলবলে একদল আরবী উষ্ট্রারোহী সিপাহী আমাদেরআগমন-প্রতীক্ষা করছিল। তখনো রাতের অন্ধকার ভালোকরে কাটেনি, কারণ সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমরাপৌঁছেছি—চারিদিক ক্রমে ফর্সা হলে আমরা নিউয়ার সেন্নুসি দুর্গের গঠন-কৌশল দেখবার সুবিধা পেলাম।

মহাযুদ্ধের পূর্বে কোনো ইউরোপীয় সিউয়া ঢুকতে পারত না, ঢুকলে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হত—কিন্তু ১৯১৭সালে সেন্নুসি জাতিকে জয় করবার পর ভ্রমণকারীদের পক্ষে সিউয়া নিরাপদ হয়েছে।

পূর্বে এখানে খুব ম্যালেরিয়া ছিল। ব্রিটিশদের চেষ্টায়বর্তমানে সিউয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের মরুভূমিতে বালি নেই, শক্ত শুকনো মাটিরমরুভূমি অনেক স্থানে বিলিয়র্ড টেবিলের মতো সমতল।

সিউয়া থেকে যাত্রা করবার পূর্বে আমি ভবিষ্যৎবৈজ্ঞানিকগণের সুবিধার জন্য আমার এরোপ্লেন যেখানেনেমেছিল—সেখানে খানিকদূর পর্যন্ত জায়গা নিয়ে একটাবৃত্তাকার রেখা আঁকলাম মাটিতে এবং আমার এরোপ্লেনযেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে একটা ‘T’ অক্ষরের মতোচিহ্ন আঁকলাম।

স্থানীয় শাসনকর্তা বললেন এই চিহ্ন এখানে অন্তত বিশবছর অক্ষুণ্ণ থাকবে—কারণ সিউয়াতে কখনো বৃষ্টি হয় না।

মাটরু বনে একটা স্থানে একটি অতি সুন্দর হ্রদআছে—এক সময়ে এটা সমুদ্রের অংশ ছিল। প্রবাদ আছে, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা এখানে একটি বাড়ি তৈরি করে মাঝেমাঝে বাস করতেন।

তারপর তিনশ মাইল আমরা উড়ে চলি, আমাদের নীচেরুক্ষ অনুর্বর মরু, একজায়গায় হঠাৎ মরু শেষ হয়েশস্যশ্যামল ভূমি আরম্ভ হল, আমরা বুঝলাম নীলনদেরমোহনা অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছি।

দূরে দিকচক্রবালে যেন দুটি অস্পষ্ট পাহাড়ের চূড়া দেখাগেল। কয়েক মিনিট পূর্বেই আমরা বুঝলাম যে দুটি গির্জারপিরামিড। দূরে ও নিকটে ক্রমে আরো পিরামিড দৃষ্টিগোচরহল।

আমরা ফ্যারাওদের দেশে পৌঁছে গিয়েছি।

ইজিপ্টের উপর দিয়ে যাবার সময় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নীলনদ না থাকলে এখানকার অধিবাসীরা বাঁচতে পারত না। নীলনদের উভয় তীরই একমাত্র উর্বরভূমি—বাকিসবটুকুই অনুর্বর মরু।

কায়রো থেকে নীলনদের উপর দিয়ে লুক্সার রওনা হই। ট্রেনে লাগে সারাদিন। আমরা এলাম চার ঘণ্টায়। লুক্সারপৌঁছবার আগেই আমরা আমাদের নীচে বড় বড় প্রাচীনমন্দির ও মূর্তি দেখতে দেখতে এসেছি—ইজিপ্টের বহু প্রাচীন গৌরবময় দিনের নিদর্শন। আকাশ থেকে নজরেপড়ল জগদ্বিখ্যাত আবু সিম্বেনের পাষাণ-মন্দির—পাহাড়েরগায়ে পাথর কেটে তৈরি। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ৬৩ ফুট উঁচু কয়েকটি মূর্তি আছে—প্রত্যেকটি মূর্তি পাহাড় কেটেতৈরি, মন্দিরের মতো। মন্দিরের অভ্যন্তরে জানালা নেই, পুবমুখী প্রবেশদ্বার দিয়ে যা একটু সূর্যালোক ঢোকে।

লুক্সার থেকে ফিরবার পথে আমাদের ইঞ্জিন গেলবিগড়ে। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, শুধুই জলসেচনের খাল ও শস্যক্ষেত্র—এমন জমিতে এরোপ্লেন নামানো যায় না।ইঞ্জিনের মুখ একটু নিচের দিকে করে আমরা তখন মরুভূমিরদিকে ছুটলাম এবং সেখানেই এরোপ্লেন নামালাম।

অনেকগুলি লোক তখনি ছুটে এল আমাদেরদিকে—আমার ভয় হল এরা মেশিনটি বুঝি ভেঙে দেবে। আমরা গ্রাম্য পুলিশের কর্তাকে ডেকে বললাম—এদেরসরিয়ে দাও, নইলে এরোপ্লেন নষ্ট হবে।

পুলিশ সর্দার তার লোকজন নিয়ে লাঠি হাতে সবাইকে মারতে উঠল। আমি আবার থামিয়ে শান্ত করি। সে একব্যাপার। ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ স্প্রিং খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমরা বহুক্ষণ ধরে সেটি মেরামত করলাম। নিকটস্থ একটা ছোটো শহরের শাসনকর্তার গৃহে রাত্রিযাপন করে পরদিনসকালে কায়রো পৌঁছে গেলাম।

কায়রো থেকে প্যালেস্টাইন যাবার সংকল্প করে আমরাএকদিন হেলিওপোলিশ এরোড্রোম থেকে আকাশেউড়লাম। নীলনদের মোহনার পূর্বপ্রান্ত ধরে আমরা চলেছিভূমধ্যসাগরের উপকূলের দিকে।

আমাদের নিচে কিছুদূরে গিয়েই পড়ল ধু-ধু মরু—যতদূরদৃষ্টি যায়, শুধু বালি আর বালি।

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, পূর্বদিকের মরুভূমিরবালির উপর দিয়ে একখানা প্রকাণ্ড স্টিমার ধীরে ধীরেঅগ্রসর হচ্ছে।

তারপর আরো কাছে গিয়ে আরব ও আফ্রিকারমরুভূমির মধ্যস্থ সংকীর্ণ সুয়েজ খালের জল নজরে পড়ল। বাঁকাভাবে দেখার দরুন জলটা প্রথমে দেখতে পাইনি—সুতরাং স্টিমারটা জলের ওপর দিয়েই যাচ্ছেতাহলে !

বাইবেলে পড়েছিলাম ইজরায়েল জাতি মরুভূমি ছেড়ে প্যালেস্টাইনের উর্বর ভূমিতে এসে বাসস্থান স্থাপনকরেছিল। আকাশ থেকে এই পরিবর্তনটা ভারি সুন্দরদেখায়—প্রথমে মরুভূমি, মরুভূমি ছাড়িয়ে ছোটোখাটোগাছপালার জঙ্গল। তারপরে প্যালেস্টাইনের শ্যামলশস্যক্ষেত্র, তবুও আমায় এ কথা বলতেই হবে যে, প্যালেস্টাইনের অনেক জায়গাই অনুর্বর পাহাড় ওবালুমাটির প্রান্তর।

রোমানদের সময়ে উত্তর আমেরিকায় যথেষ্ট গমজন্মাত—সেইসব জায়গায় এখন সেখানে শুধু ধু-ধু মরুভূমি। আরব পশুপালকেরা কোনো কোনো স্বল্প শষ্পাবৃত ভূখণ্ডে ভেড়া ছাগল চরায়। চাষবাস একেবারেই চলে না।সাহারা পূর্বেকার উর্বর শস্যক্ষেত্রগুলি বহুদিন আগেই গ্রাসকরে ফেলেছে—এখন ক্রমশ এগিয়ে আসেছে সমুদ্রেরউপকূলের দিকে।

বেন্-গাজি থেকে মিসুরাটা পর্যন্ত পথ বড় বিপজ্জনক। মিসুরাটা সিদ্রা উপসাগরের ওপারে অবস্থিত ও বেন্-গাজিথেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫০০ মাইল। এই ৫০০ মাইলের মধ্যেসবটাই মরু, পেট্রোল নেবার কোনো জায়গা নেই, এরোপ্লেন নামানোও নিরাপদ নয়, কারণ দেশটা বর্বরসেন্নুসিদের অধিকৃত—এদের সঙ্গে সে সময়ে ইটালি যুদ্ধেব্যাপৃত।

ইটালীয় বন্ধুরা আমাদের জানালেন যে, যদি আমাদেরএরোপ্লেন মাঝপথে নামাতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে যদি আরবীয় দস্যুরা আমাদের বন্দী করে বা হাত পা নাক কেটেদেয়—এর জন্য তারা কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

কিন্তু আমাদের তখন ফিরবার উপায় নেই—মিসুরাটাদিয়ে যেতে হবেই।

আমার নিজের খুব সন্দেহ ছিল যে, প্রবল বিপরীতবাতাস বইলে সঙ্গের পেট্রোল কুলোবে।

ফলে এরোপ্লেনের প্রত্যেক ট্যাঙ্ক পুরোপুরি বোঝাই করেতো নেওয়া হলই, আরো কতগুলি বাড়তি গ্যাসেলিনেরটিন চাপানো হল। সৌভাগ্যক্রমে এরোড্রোমটা খুব ভালোপাওয়া গিয়েছিল, তাই অত বোঝাই থাকা সত্ত্বেও উড়বার সময় বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয়নি। সামনের ককপিটপেট্রোল টিনে এমন ভর্তি যে, আমাদের মিস্ত্রি উড্‌হ্যামকেকোনোরকমে মাথা নীচু করে গুটিসুটি হয়ে সেখানে বসতেহল।

যাতে না নেমেই শূন্যপথেই ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কে পেট্রোলভর্তি করা যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমাদেরসঙ্গে আরবীতে লেখা একখানা পত্রও এই মর্মে নিয়েছিলামযে, আমরা ইটালীয় সৈনিক নই, আমরা ইংরেজ, দেশদেখতে বেরিয়েছি—কোনো সামরিক উদ্দেশ্য আমাদেরনেই।

সৌভাগ্যের বিষয়, সে চিঠির কোনো দরকার হয়নি—নিরাপদেই আমরা মিসুরাটা পৌঁছে গেলাম। সেখানথেকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে স্পেন ও ফরাসী দেশেরউপর দিয়ে লন্ডন ফিরি। মধ্যে আমরা অবিশ্যি গ্রানাডা ও মাদ্রিদে নেমেছিলাম।

এর পরেই আমাদের ভারতবর্ষে উড়ে যাবার একটা সুযোগ উপস্থিত হল। বিমানবিভাগের বড়কর্তা হিসাবে স্যারসেফটন ব্রানকারের ভারতবর্ষে যাওয়ার দরকার ছিল। তিনিএরোপ্লেনে যেতে চাইলে ট্রেজারি থেকে আপত্তি উঠল যেএতে খরচ অনেক বেশি পড়ে যাবে, ট্রেজারি তা মঞ্জুরকরতে রাজী নয়। অবশেষে বিমান-কোম্পানিরা মিলেখরচের খানিকটা অংশ দিতে চাইল, এতে আর আপত্তিচলে না। আমি এরোপ্লেন নিয়ে যাব ঠিক হল।

সেবার ইংল্যান্ডে ভীষণ শীত। নভেম্বর মাসের কুয়াশা ওঅন্ধকারের মধ্যে আমরা লন্ডন ছাড়লাম, সারা ইউরোপেরকোথাও সূর্যের মুখ বড় একটা দেখা গেল না।

উপকূল-ভাগের অনেকটা অংশ নিয়ে অদ্ভুত ধরনেরপাহাড়। যেন সরু সরু মিনারের চূড়ার সমষ্টি, কোনোকোনো স্থানে সেগুলির আকৃতি পিরামিডের মতো। নীচেরদিকেচেয়ে মনে হচ্ছিল, আমরা পৃথিবীতে আর নেই। অন্যকোনো মৃত গ্রহের বুকের উপর দিয়ে চলেছি। ও রকম অদ্ভুতগড়নের পাহাড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

বন্দরাব্বাসের কাছে কতকগুলি পাহাড়ের রং ভারিচমৎকার। কোনোটা রাঙা, কোনোটা সবুজ আবার কোনোটাগাঢ় হলুদ রঙের। এই পাথরে অক্সাইড আছে বলে বহুপ্রাচীন কাল থেকে অক্সাইডের সংগ্রহের জন্যে ব্যবসায়ীরা আসে। প্রাচীন ফিনিসীয় বণিকেরা এখান থেকে অক্সাইডনিয়ে যেত এবং ৪০০ বছর পূর্বে পোর্তুগীজদের একটা খনি ছিল অর্মুজ দ্বীপে।

ভারতবর্ষে সে সময় শীতকাল, আকাশ বেশ পরিষ্কারছিল।

স্যার সেফটন ব্র্যানকার করাচী থেকে ট্রেনে নিজেরগন্তব্যস্থানে যাবেন। আমরা তাঁকে করাচীতে নামিয়ে দিয়েযোধপুরের পথে দিল্লি রওনা হই। করাচী ও যোধপুরেরমধ্যে থর মরুভূমি পড়ে—প্রথম দিন আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হয়ে একটা বড় নদীর খাত অনুসরণ করে যোধপুর শহরেপৌঁছবার চেষ্টা করলাম।

দূর থেকে দেখি দিকচক্রবালে কতকগুলি বড় বড় গাছদেখা যাচ্ছে এবং সেখানে যেন অনেকগুলি লোক জড়ো হয়েছে, একটা বড় মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য। কথা ছিল আমরা যোধপুরের মহারাজের অতিথি হব। নিকটেই একটা মিলিটারি ব্যান্ড বাজনা বাজাচ্ছে। ব্যাপার কি ?একটা এরোপ্লেন নামানো দেখতে এত লোক এসে জুটেছে ?

প্রায় মাঠে নেমেছি, এমন সময়ে দেখি মাঠের দূর প্রান্তথেকে দুজন অশ্বারোহী পোলো খেলোয়াড় আমাদের দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ আমার মনে হল, আমাদের অভ্যর্থনারজন্য এ আয়োজন নয়, এটা পোলা খেলার মাঠ এবং পোলোম্যাচ চলছে। ভুল বুঝতে পেরে তখনই আবার আকাশে উঠে একটু দূরে মহারাজের নিজের এরোপ্লেনের মাঠেনামলাম।

আগ্রার জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখবার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন থেকেই। শূন্যপথ থেকে আমরা এরোপ্লেন ঘুরিয়েফিরিয়ে নানা দিক থেকে এই অপূর্ব সমাধিমন্দিরের ফটোনিলাম।

প্রথমে আমাদের কথা ছিল করাচী পর্যন্ত যাওয়ার। কিন্তুভারতে পৌঁছে আমরা সে চুক্তির কথা ভুলে গেলাম।এতদূর এসে দেশটা ভালো করে দেখতে হবে বৈকি ! আগ্রাদেখে আমরা গেলাম কলকাতা। কলকাতার ময়দানেনামবার ব্যবস্থা করেছিল স্থানীয় সৈন্যবিভাগ। এরোপ্লেনের অবতরণভূমি সম্বন্ধে দেখলাম তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যেখানে তারা আমাদের নামাবার ব্যবস্থা করেছিল, সে স্থানসম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকেই দেখি লোকের ভিড়। বড় মুশকিলে পড়া গেল, আকাশে পাক দিয়ে বেড়াতে লাগলাম, নামি কোথায় ?

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল ময়দানের পাশেঘোড়দৌড়ের মাঠ। মাঠটা অসমতল বটে, সেখানে লোকের ভিড় আদৌ নেই। দর্শকদের কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই আমি এরোপ্লেন নামালাম এই নির্জন ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

কলকাতায় আমরা রইলাম কয়েকদিন। এখান থেকে অরণ্যাবৃত বঙ্গোপসাগরের তীর বেয়ে আমরা গেলামরেঙ্গুন। ভারত গবর্নমেন্টের ইচ্ছা ছিল, আমরা বিমানপথেরসুবিধা-অসুবিধা পরিদর্শন করবার জন্য সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাব।কিন্তু আমরা তাতে সম্মত হতে পারলাম না। এখনিইঅনেক দূর এসে গিয়েছি লন্ডন থেকে। আমাদেরএরোপ্লেনখানা একবার মেরামত করা দরকার। এদেশেসে-সব হবে না। আমরা ফিরে যেতে চাই।

সুতরাং তিন মাসের প্রবাস-যাপনের পরে বসন্তকালেরপ্রথমে এক সুন্দর দিনে আমরা ক্রয়ডন এরোড্রোমে অবতরণ করলাম।

এইবার আমরা লন্ডন থেকে কেপটাউন উড়ে যাবার সঙ্কল্প করি। এই যাত্রার জন্য আমি আমার পূর্বের প্লেনখানাইনেব ঠিক হল, কেবল ইঞ্জিনটা বদলে সিড্‌লি-জাগুয়ার শ্রেণীর ইঞ্জিন বসিয়ে নিলাম।

এই ভ্রমণের প্রথম অংশে যে জায়গাগুলির ওপর দিয়ে গেলাম সেখানে আমি পূর্বে গিয়েছি—সেই ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, ইজিপ্ট। ইজিপ্ট পার হয়ে সুদান পৌঁছে নতুনদেশের হাওয়া গায়ে লাগল। নীলনদের গতি অনুসরণ করেদক্ষিণমুখে যাচ্ছি। দেশীয় জাতিদের নানা গ্রামের ওপর দিয়েচলেছি। নীলনদের ধারে এক জায়গায় বড় জলা। এখানকারলোকে কাপড় পরে না। সভ্যতার বিশেষ ধার ধারে না।এখানে মোঙ্গলা বলে একটা গ্রামে আমাদের নামতে হল। গরম এখানে এত বেশি যে, কোনো দৈহিক পরিশ্রমেরকাজকরা বড় কষ্টকর। গ্রাম্য লোকের সাহায্য নিয়ে আমরাউড়োজাহাজের কলকব্জা পরিষ্কার করলাম। এ দেশেরজমির উচ্চতা বড় কম। ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকেনীলনদের উপর দিয়ে আমরা ৩০০০ মাইল এসে গিয়েছি—অথচ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখানকার উচ্চতা মাত্র১০০০ ফুট।

জিনজা বলে একটি ছোট শহরের কাছে আমরা বিখ্যাত রিপন জলপ্রপাত দেখলাম। এটাই শ্বেত নীলনদের উৎস।টাঙ্গানিকা ও রোডেসিয়া যাবার পথে অনেক আশ্চর্য দৃশ্যদেখেছিলাম বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্যভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

আকাশ থেকে দৃশ্যটা কি রকম অদ্ভুত দেখায় বর্ণনা করা আবশ্যক। অনেকদূর থেকে আমরা দেখছি একটা প্রকাণ্ড নদী, প্রায় সওয়া মাইল চওড়া, ধীরে ধীরে প্রান্তরের ওজঙ্গলাবৃত তীরভূমির মধ্যে দিয়ে বেয়ে আসছে। আসতেআসতে অত বড় নদীটা হঠাৎ যেন একটা মাটির ফাটলেরমধ্যে ঢুকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। অদ্ভুত !

নদীটা জাম্বেজী নদী এবং যেখানে নদীটা ফাটলে ঢুকল, সেখানটাতেই হঠাৎ একটা সংকীর্ণ পাহাড়ি খাদে ৪০০ ফুট ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বিশাল জলধারা। এটাই হল বিখ্যাতভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এমট বলে একজন ফটোগ্রাফারছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা খুব নীচে এরোপ্লেন নামিয়ে নানাদিক থেকে এই অপূর্ব দৃশ্যের ফটো নিলাম। অনেক দৃশ্যই দেখেছি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্র পৃথিবীতে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের গম্ভীর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আমি তো অন্তত দেখিনি। বহুদূর থেকে মেঘগর্জনের মতোগর্জন শোনা যায়।

জলপ্রপাতের ফটো নিতে খুব নীচে প্লেন নামিয়েছি, এমন সময় ইঞ্জিনের মধ্যে একরকম আওয়াজ শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। সেখানটাতেজলকণায় কুয়াশাসৃষ্টি করেছে। নিশ্চয় কারবুলেটারে জল ঢুকে গিয়েছে। বড় ভয় হল, আমাদের

ঠিক নীচেই ৬২২৫ ফুট গভীর খাদ এবংউন্মত্ত জলরাশি, এক দিকে গভীর অরণ্য, এক দিকে খরস্রোতা জাম্বেজী নদী। এরোপ্লেন নামাবার উপযুক্ত ফাঁকাজায়গা কোথাও নেই।

তাড়াতাড়ি এরোপ্লেন উঠিয়ে আমরা লিভিংস্টোনএরোড্রোমের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমেউপরে উঠবার কিছু পরেই কারবুলেটারের জল শুকিয়ে গেলবোধ হয়। কারণ ইঞ্জিনের পটপট আওয়াজ বন্ধ হল।

আমাদের এরোপ্লেন প্রথম সমগ্র আফ্রিকা লম্বালম্বি পাড়ি দিয়ে কায়রো থেকে কেপটাউনে পৌঁছালো। ফিরবার পথে কেপটাউন থেকে লন্ডন পৌঁছাতে ১৫ দিন লেগেছিল।

সুইডেনের পল্লীপ্রান্তে

জনৈক মার্কিন লেখিকার পূর্বপুরুষগণ সুইডেনে বাস করিতেন। ইনি নিজেও বাল্যকালে কিছুদিন সুইডেনেঅতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে নিউইয়র্কবাসিনী হওয়াসত্ত্বেও স্মৃতির টানে মাঝে মাঝে সুইডেনে কিছুকালকাটাইয়া থাকেন। ইঁহার লিখিত বিবরণ পড়িলে সুইডেনেরপল্লীগ্রাম সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি, যাহাসাধারণ ভ্রমণকারীদের চোখে পড়ে না। নিম্নে তাহার পরিচয়পাওয়া যাইবে।

সুইডেনের পল্লী-অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যে ধরনের রক্ষণশীল ও দেশের পুরাকালীন বা বংশানুগত বৈশিষ্ট্যবজায় রাখিতে যত্নবান, এমন পৃথিবীর আর কোথাও আছেকিনা সন্দেহ।

এঁদের জানা খুব সহজ নয়। বিশেষ করে পল্লীবাসীভদ্রলোক যাঁরা তাঁরা বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা বড় একটা করেন না—গ্রাম ছেড়ে বড় কোথাও যান না, নিজের গ্রামে নিজের জমিদারিতে বাস করেন। কাজেইবিদেশী-ভ্রমণকারীগণ এঁদের ভেবে থাকেন গর্বিত ওঅসামাজিক। আসলে কিন্তু এঁরা তা নন। শুধু খানিকটা আনাড়িপনা ও নিজেকে গোপন করে রাখবার প্রবৃত্তি থেকে এটা হয়েছে। এখানে ইংরেজের সঙ্গে ওঁদের মিল আছে।

আমি জাতিতে সুইডিশ এবং আমার বাল্যকাল সুইডেনেকেটেছে। তারপর আমি আজ বাইশ বছর আমেরিকায়আছি—সুতরাং আমার পক্ষে উভয় দেশের সামাজিক জীবন সম্বন্ধেপার্থক্য লক্ষ করার যথেষ্ট অবকাশ ঘটেছে। আমার মনে হয় সুইডেনের গৃহ ও গার্হস্থ্য-জীবন পৃথিবীর মধ্যেআদর্শস্বরূপ—বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত ও শিক্ষা-দীক্ষায়এদের মধ্যে এমন একটা মধুর গার্হস্থ্যধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সুইডেনের পল্লীগ্রামের বনেদী ভদ্রলোকেরগৃহে—যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

গত শীতকালে ন'বছর পরে আমি আবার দেশে ফিরেছিলাম এবং পাঁচ মাস সেখানে ছিলাম। সে সময় অনেক পুরানো জায়গা আবার দেখে বেড়িয়েছি-বাল্যকালের অনেক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আবারদেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

এবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সুইডেনে থেকে বুঝতেপেরেছি যে, বিগত মহাযুদ্ধ যদিও সুইডেনকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু তার পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিবর্তন পৃথিবীর অন্যান্যদেশের মতো সুইডেনকেও বেজায় ধাক্কা দিয়েছে।

তবুও এখনো এমন সব বনেদী বংশ আছে, যারা পূর্বেরমর্যাদা ও বনেদী চাল কিছু কিছু বজায় রাখতে সমর্থ।সুইডেনের ভূমি বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব অনেকটা এর জন্যদায়ী।

কিন্তু বড় বড় জমিদারের অবস্থা সুইডেনে একেবারেই ভালো নয়—প্রত্যেক মাসেই এদের জমি বা বাড়ি নীলামেরইস্তাহারে উঠছে। অনেক সময় জমিদারেরা পৈতৃক গ্রামকেআঁকড়ে পড়ে আছে এই জন্য যে, ছেড়ে গেলে তাদেরঅনুচরেরা মহা-কষ্টে পড়বে ! এক এক জমিদারের বহু অনুচর, তারা কোথায় দাঁড়াবে, আজ যদি মনিব তাদেরফেলে চলে যায় ?

সব দেশেই যে সমস্যা, সুইডেনেও সে সমস্যা প্রবল। অর্থাৎ কৃষিকার্য আর তেমন লাভজনক নয়। শিল্পের সঙ্গেকৃষি সংগ্রাম করে পেরে উঠছে না। গবর্নমেন্ট থেকে অবশ্যযথেষ্ট চেষ্টা চলছে কৃষিকার্যকে পুনরায় লাভবান করাবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোনো ফল দেখা যায়নি।

বাইরে থেকে কয়লা আমদানি বন্ধ করার জন্য সুইডেনেআন্দোলন চলছে যে, গৃহস্থের বাড়িতে ও সমস্ত সরকারী অফিসে, স্কুলে-কলেজে সুইডেনে উৎপন্ন কাঠ পোড়াতেহবে।

আমার কাছে ল্যাকো-ক্যাস্‌ল্ সুইডেনের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের প্রতীক। এই সুবৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ ভানের্ন হ্রদেরএক দ্বীপে অবস্থিত।

আমার শৈশব ও বাল্যদিনের মধুর স্মৃতির সঙ্গেল্যাকো-ক্যাস্‌ল্ জড়িত। আমার একজন পূর্বপুরুষ ১৮০৮খ্রিস্টাব্দে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্ব-প্রদর্শনেরপুরস্কারস্বরূপ এই প্রাসাদ রাজার নিকট পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তাঁর বংশধরেরা বহুদিন এখানেই বাস করেছিলেন।

তখন প্রাসাদটি ছিল বাসের অযোগ্য ও ভগ্ন অবস্থায় আমার সেই পূর্বপুরুষ—আমার পিতামহের ভ্রাতা এখান থেকে কিছুদূর আর একটা বাড়িতে বাস করে এটাকে মেরামত করে বাসযোগ্য করে তোলেন। মনে পড়ে এইপ্রাসাদের ২০০টি কামরা, গুপ্ত কারাকক্ষ ও অন্ধকার যাতায়াতের পথগুলি আমাদের শিশুমনে এক অপূর্ব ভয় ওবিস্ময়ের সৃষ্টি করত।

একটি ঘর বিশেষ করে আমাদের বড় কৌতূহলের বস্তুছিল।

এখানে ম্যাগনাস গেব্রিয়েলের মাতা সুন্দরী বাসকরতেন। বিখ্যাত বীর গস্টেভাস এভলয়াসের যৌবনকালেইনি ছিলেন তাঁর প্রণয়িনী।

আমরা কখনোকখনো প্রাসাদের পরিত্যক্ত ও বনাকীর্ণ উদ্যানে কোনো গাছতলায় বসে অতীত দিনের কথাভাবতাম—বাল্যের সে সব কত মধুর স্বপ্ন।

এখন এই প্রাসাদ আর আমাদের হাতে নেই—গবর্নমেন্টথেকে এটাকে কিনে নিয়ে মেরামত করা হয়েছে।প্রাচীন দিনের নিদর্শন হিসেবে একে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

ল্যাকো-ক্যাস্‌ল্ একটি সুদৃঢ় দুর্গের মতো। তখনকার দিনেজীবনযাত্রা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গীন, মানুষকে সর্বদা যুদ্ধেরজন্য প্রস্তুত থাকতে হত। জানালাগুলো এমনভাবে তৈরিযে তা থেকে তীর ছোঁড়া যায়।

তারপর দু'দিন কেটে গেলে এইসব দুর্গ-প্রাসাদকেবাসোপযোগী করা হল—নতুন নতুন ঘর তৈরি করা হল।

এইসব প্রাচীন দুর্গের মধ্যে স্কারহোল্ট, ভিটস্কোয়াল ওটরূপ সুবিখ্যাত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে নতুন ধরনের রেনেসাঁস-যুগের ভাস্কর্য-রীতি অনুযায়ী গঠিত এই সব প্রাসাদ সুইডেনের গৌরব-স্বরূপ।

টরূপ প্রাসাদের বর্তমান অধিকারিণী ব্যারনেস্হেনরিয়েট কোয়েট। এঁর সঙ্গে বর্তমান রাজপরিবারেরসকলের সঙ্গেই খুব সখ্য আছে। তাঁর প্রাসাদে বড় বড় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সর্বদা সমাগম হয়। গণ্যমান্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক যখনসুইডেন বেড়াতে আসেন, তখন টরূপ প্রাসাদে তাঁর আমন্ত্রণহয়ে থাকে। ব্যারনেস্ কোয়েট সর্বদা উচ্চ প্রতিভাশালীব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন।

ব্যারনেসের রুচি শুধু একদিকেই আবদ্ধ নয়।

টরূপ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে তিনি অনেক নতুন ধরনেরগাছ ও ফুল-ফলের আমদানি করেছেন। তাঁর ভৈষজ্য-উদ্যান দেখতে বিদেশ থেকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্যক্তিরা আসেন। নানাদেশের দুর্লভ ভেষজ লতাপাতা এখানে সযত্নে রোপণ করাও লালন-পালন করা হয়েছে—বিখ্যাত লেখিকা সেলমালাগেরলফ কতবার এসেছেন টরূপ প্রাসাদের ভৈষজ্য-উদ্যান দেখতে।

আমার মাসিমার পল্লীপ্রাসাদ ওভেন্‌স্-ভিহলসে গতশরৎকালে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। সেখানকার জীবন-যাপনের প্রণালী বর্ণনা করলেই সুইডেনের পল্লীবাসীবনেদী ভদ্র পরিবারে জীবন কীভাবে কাটে মোটামুটি বলাহবে।

উপরোক্ত গ্রামে মাসিমার বিস্তৃত জমিদারি আছে।সেখানকার সব কাজকর্ম এখনো প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হয়। তাঁর পরলোকগত স্বামী যেভাবে জমিদারিচালাতেন, এখনো সেই পদ্ধতিতেই জমিদারি চালানো হয়।প্রজা ও মজুরেরা তাঁর জমিদারিতে বেশ সুখে ও শান্তিতেইবাস করে।

এঁদের জমিদারিতে নিয়ম আছে, মজুরেরা যতদিন কাজকরতে পারে ততদিন জমিদারির কাজ-কর্ম করে, তাদেরবাসের জন্য জমিদার ছোট ছোট মাটির ঘর তৈরি করেদিয়েছেন। এরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই সব ঘরে বাস করে। কিন্তুবৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়লে তাদের দান-সত্র পাঠিয়ে দেওয়াহয়।

এই দান-সত্র জমিদারের খরচেই চলে। বৃদ্ধ ও অসক্ত মজুরেরা জমিদারি থেকে ভাতা পায়।

কিন্তু ওরা হঠাৎ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দান-সত্রে আশ্রয়নিতে চায় না—যতদিন একেবারে অশক্ত না হয়ে পড়ে, ততদিন কাজ করে। সুইডেনের কৃষক ও মজুর শ্রেণীরলোকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড় ভক্ত। ওদের কুটিরগুলি প্রায়ইবন ও

হ্রদের ধারে। শান্ত ও নির্জন স্থান। প্রত্যেক গৃহের সামনে ছোট ছোট বাগান, বাগানে ফলমূল ও শাকসব্জিরচাষ আছে, নানা ধরনের ফুল আছে, সে হিসাবে ওদেরজীবন খুবই সুখের।

সাধে কি ওরা ওদের জুটি ছেড়ে যেতে চায় না ?

মাসিমার জমিদারিতে বারো হাজার একর জমিতে বনআছে।

বনের গাছ কেটে বিক্রি করা হয়—জমিদারির প্রধানআয়ই কাঠ-বিক্রির। এখন বোঝা যাবে, বৃদ্ধ মজুরদের শেষবয়স পর্যন্ত চাকুরিতে রেখে দিলে জমিদারির কত ক্ষতি এবং জমিদারিকে কতটা ক্ষতি বহন করতে হয় এদের রেখেদিতে গিয়ে। তরুণবয়স্ক মজুরেরা এদের দ্বিগুণ কাজ করে, বড় বড় গাছ-কাটার মতো পরিশ্রম-সাধ্য কাজ বৃদ্ধ মজুরদেরদিয়ে ভালো হয় কি ?

তবুও তাদের রাখতে হয়, কারণ সুইডেনের জমিদারদেরতাই নিয়ম।

এই বারো হাজার একর জমির বন খুব ভালো অবস্থায়রক্ষিত হয়ে আসছে। বনবিভাগের বোর্ডের আইন আছে, একটা গাছ কাটলেই তার জায়গায় নতুন গাছ একটালাগাতে হবে।

এই বন-বিভাগের বোর্ডের সুদক্ষ পরিচালনার ফলেআজ সুইডেনের অরণ্যের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত। সমগ্র দেশেরজমির শতকরা ষাট ভাগে শুধু বন, সবসুদ্ধ প্রায় পাঁচলক্ষআশি হাজার একর বন।

আমার মাসিমা যে শুধু বন সুরক্ষিত রেখেছেন তা নয়, তাঁর ফলের বাগান, শূকর ও মুরগির চাষ সমগ্র জেলার দৃষ্টান্ত-স্থল। এসব ছাড়া তিনি বিদেশে ডিম চালান দেবারএকটা সমিতিও স্থাপন করেছেন।

পূর্বে মাসিমার জমিদারিতে মাখন পনীর যথেষ্ট উৎপন্ন হত, কিন্তু আজকাল ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের মাখন ও পনীরের ব্যবসায় তৈরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন জেলারসমস্ত জমিদার মিলে একটি সমবায় মাখন ও পনীরেরকারখানা স্থাপন করেছেন এবং একুশ মাইল দূরবর্তী শহরেপ্রতিদিন কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য চালান দেবার ব্যবস্থাকরেছেন।

কারখানার অবস্থা বর্তমানে খুব ভালো।

একটা অদ্ভুত জিনিস এখানে লক্ষ করেছি। মাসিমারবাড়ি যদিও রাস্তার ধারে, তবু বাড়ির সদর-দরজা রাত্রেকখনো বন্ধ করা হয় না।

সুইডেনের পল্লীপ্রান্তে সকলেই নিজেদের অত্যন্তনিরাপদ মনে করে চোর-ডাকাতের সম্বন্ধে। এমন কি এভাব ওখানে অবস্থানকালে আমার মধ্যেও সংক্রামিতহয়েছিল। সদর রাস্তার ধারের বাড়ির একতলায় আমিজানালা খুলে রাত্রে শুয়েছি, খুব নির্জন বাড়ি যেখানে, সেখানেও ভয় করেনি।

একটা বাড়িতে লক্ষ্য করেছিলাম বাড়ির উনিশ বছরবয়সের তরুণী মেয়ে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশের ঘরেএক রাত্রে আছে, অবশ্য যখন বাড়িতে অতিথি থাকে না সেসময়ে। সে ঘর আবার এমন যে, ভৃত্যদের আহ্বান করবারঘণ্টা পর্যন্ত নেই।

এই বাড়ি বড় একটা শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে।সেই সময় ওই শহরের বেকার-সমস্যা প্রবল হওয়াতে প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শোনা যেত।

তার ভয় করে কিনা একথা জিজ্ঞেস করলে মেয়েটিহেসে বলত—তাদের বাড়িতে রোগের ভয় আর চোরেরভয়, এই দুটো কারো নেই। মিথ্যা ভয়ের দরুন সে তারসুন্দর নির্জন কক্ষ ত্যাগ করতে কখনই প্রস্তুত নয়।

আমার মাসিমার বাড়ির কথাই আবার তোলা যাক।

অধিকাংশ পল্লী-প্রাসাদের মতো মাসিমার বাড়িতেওঅষ্টাদশ শতাব্দীর ছায়া এখনো সম্যক অপসারিত হয়নি।

মাসিমাদের বাড়ির নীচের তলায় অতিথিদের থাকবারঘর ও ভোজনকক্ষ। ভোজনকক্ষের দেওয়ালে লাল গালারকারুকার্য। চিত্রশোভিত প্যানেল ও দামী চীনাবাসনেসাজানো আলমারি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বাল্যকালে দেখেছি, এক এক সময় ভোজনকক্ষের টেবিলে ষাটজনলোক একসঙ্গে বসে খেত। এখন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরাবস্থার দরুন অন্যান্য গৃহের মতো মাসিমার বাড়িরআতিথেয়তাও অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ভোজনকক্ষের পাশেই পারিবারিক গ্রন্থাগার।সান্ধ্যভোজের পরে সকলে এখানে বসে আগুন পোহায় ওগল্পগুজব করে। এখানে যে শুধু বহুচমৎকার বাঁধানো প্রাচীনপুস্তক আছে তাই নয়, অনেকগুলি আসল চিপেন্‌ডেলচেয়ারও আছে।

দোতলায় অনেকগুলি বড় বড় বসবার ঘর। ঘরগুলিরদেওয়াল সুন্দরভাবে চিত্রিত, নীচটা বেশ কারুকার্যখচিত ওককাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধানো। পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবিদেওয়ালের সর্বত্র টাঙানো, অনেক সময় এইসব ছবি দেওয়ালের গায়েই আঁকা। ঘরের মেঝে পার্থন কাঠের।সর্বদা গরমজল ও সাবান দিয়ে ওই কাঠের মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়।

এসব সেকেলে ধরনের প্রাসাদে মোটরগাড়ি বা বিদ্যুতের আলো নেই; তাদের বদলে আছে ঘোড়ার গাড়ি ও প্যারাফিনের ল্যাম্প ও মোমবাতির বড় বড় ঝাড়। অগ্নিকুণ্ড সুইডেনের পারিবারিক জীবনের একটা বড় অঙ্গ। যেযে-ধরনের বাড়িতেই বাস করুক না কেন, শহরে প্রাসাদোপম ফ্ল্যাটে বা পল্লী-প্রাসাদে বা সাধারণ মধ্যবিত্তগৃহস্থের বাড়ি বা মজুরের কুটিরে শীতের সন্ধ্যায় সকলেই অগ্নিস্থানের চারিপাশে বসে গল্পগুজব করবে।

মাসিমা আমাকে তাঁর টেবিল-ঢাকা চাদর, রুমাল, জানালার পর্দা, বিছানার চাদর প্রভৃতি যেখানে রক্ষিত হয়, সে আলমারিগুলি দেখালেন। প্রত্যেক আলমারিতে থাকেথাকে সাজানো ধোয়া, ধবধবে পাট-করা রাশি রাশিল্যাভেন্ডার-গন্ধী সাদা কাপড়।

প্রত্যেক কাপড়ের থাকে কাঠের তক্তায় নানা লোকেরনাম লেখা। প্রধানত মেয়েদের নাম। জিজ্ঞেস করলাম—এনাম কিসের ?

মাসিমা বললেন, যাঁদের কাছ থেকে ওই সব কাপড়েরশিল্পকার্যের প্যাটার্ন নেওয়া হয়েছে, বা যাঁদের বিখ্যাতপ্যাটার্নের নকলে ওগুলো তৈরি, তাঁদের নাম লেখা। ওঁদেরমধ্যে অনেকে হয়তো এখন আর বেঁচে নেই, কেউ কেউবহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এ সব নাম কাপড়ের সঙ্গেআজকাল এমনধারা জড়িয়ে গিয়েছে যে, তাঁদের নাম আরকাপড়ের নাম এক হয়ে গিয়েছে। যেমন, হয়তো দাসীকেআদেশ করা হয় চায়ের টেবিলে এবেলা কাউন্টেস রুডেনসলিডহলস পেতে দিয়ো। কোল্ড পেতে দিয়ো।রবিবারের সান্ধ্যভোজের সময় মিসেস লিডহলস পেতেদিয়ো।

খুব ভালো ভালো রেশম কাপড় রয়েছে, পুরোনোধরনের ডিজাইন আঁকা। একটা থাকে আমি দেখলাম কাঠের তক্তায় লেখা আছে ‘স্টকহলম। মাসিমা অপ্রতিভ মুখেবললেন—ওগুলো দেখো না, ওগুলো বাজারে কেনাজিনিস।

যেন তাঁর কৃত প্রকাণ্ড এক অপরাধের কাজ আমি হঠাৎধরে ফেলেছি। মাসিমার মুখে এমনধারা ভাব সুপরিস্ফুট।

কিছুদিন আগে মাসিমা একটা কথা আমায় বলেছিল, যেকথাটার অর্থ এখন ভালোই বুঝলাম। বলেছিলেন যে, আগেকার চালে আর সংসার চালানো যায় না, অর্থের বড়ইটানাটানি। নানা দিক থেকে খরচ কমাতে হচ্ছে, নইলে চলেনা। স্টকহলম থেকে বাজারের কাপড় কিনে আনা সেই খরচকমাবারই একটা অঙ্গ।

মাসিমার বাড়িতে আগে এগারো জন দাসী ছিল, এখনমাত্র দুজন রাখা হয়েছে। আমার মনে হল, দুজন দাসীই তোএ বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট। মাসিমা বললেন—তা কখনো হয় ?কাজ কত ?এখন অবশ্য চলে, কিন্তু বড়দিনের সময় বাড়িতেকত অতিথি আসচে, তখন কাজের কত অসুবিধে হবে !

সত্যই আমার মনে হল, কাজ অনেক এসব বাড়িতে।শরৎকালে জানালা-দরজা, ঘরের মেঝে সব পরিষ্কার করতেহয়, জ্যাম তৈরি করতে হয় এক বছরের উপযোগী, মাংস কেটে নুন দিয়ে রেখে দিতে হয়—গেরস্থালির কত কাজ !

এছাড়া মাসিমার সমস্ত কাপড় ও আটাশখানা বিছানারচাদর বছরে দুবার ধুয়ে রাখতে হবে। ব্যবহৃত না হলেওধুয়ে রাখতে হবে, নইলে হলদে হয়ে যেতে পারে।

বাড়িতে চারখানা তাঁত আছে, তাতে ঘরের প্রয়োজনীয়পর্দা, টেবিলের ঢাকনি, কার্পেট, তোয়ালে, বিছানার চাদরইত্যাদি বোনা হয়। এসব কাজ কি মাত্র দুজন দাসীকে দিয়েহয় ?আমি মাসিমাকে বললাম, কেন মাসিমা, খরচ যখনকমানো হচ্ছে, তখন সব দিক থেকেই কমানো উচিত। এতজিনিস প্রতি বছর বোনার কি দরকার ?এত তো ফি বছরলাগে না !

মাসিমা বললেন, তা হয় না। কাপড়ের সংখ্যা শুধু যে বজায় রেখে যেতে হবে তাই নয়, তাদের না বাড়লেছেলেপুলেরা এর পরে তাদের মাকে কি বলবে ?এরা মনেদুঃখ করলে কি আমার তা সইবে ?বাড়ির গৃহিণী হিসেবেআমার কর্তব্য হচ্ছে, সংসারের জিনিস বাড়িয়ে যাওয়া।

কিন্তু শুধু সংসারের কাপড়-চোপড়ের দিক থেকেই নয়, আমার মাসিমা খুব সঙ্গীতপ্রিয়, দেশের মধ্যে সঙ্গীতেরপুরাতন ধারা বজায় রাখবার দিকে তার খুব ঝোঁক। মাসিমারবাবা ওয়েনারবার্গ ভালো গায়ক ও সুরস্রষ্টা ছিলেন।মাসিমাও নিজে একজন সুগায়িকা, তাঁর সন্তানদের মধ্যেদুটিকে উচ্চসঙ্গীত কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

ছোট ছেলেটি এরই মধ্যে পিয়ানো বাজনায় বেশ নামকরেছে। তার বড় সন্তানটি মেয়ে। সে বেশ ভালো গাইতেপারে, কিন্তু ওদের বড় ভাই, মাসিমার বড় ছেলে, যে এইবিস্তৃত জমিদারির তত্ত্বাবধান করছিল—হঠাৎ মারা যায়।এর পরে ছেলে মেয়ে দুটিকে আর সঙ্গীত-কলেজে রাখারসুবিধা হল না। ছেলেটি এখন জমিদারির হিসাবপত্রদেখাশোনা করে। মেয়েটিও ভাইকে সাহায্য করে। এখনতাঁদের সর্বদা আঁকজোক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় !

কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে যখনবসে, তখন ছেলেটি বাড়ির বড় পিয়ানো বাজায়, ওর বোনগান গায়, ওদের মাও সেই সঙ্গে যোগ দেন। এদের বাড়িরপিয়ানোতে তখন যে সুর বাজে, তা খুব উঁচুদরের সুর।

আমার আর এক মাসিমা এই বাড়িতে থাকেন। তাঁর বয়স ৭৬ বছর। রেশমের মতো নরম সাদা চুল মাথায়, মুখের ভাবে করুণা ও সাফল্য মাখা। তিনি একজন নামকরা লেখিকা। সন্ধ্যাবেলা গান শুনতে শুনতে ড্রইংরুমে বসেতিনি তাঁর নতুন উপন্যাসের প্লট ভাবেন, নয়তো তাঁর বইয়ের প্রুফ দেখেন।

বড়দিনের সময় বিরাট উৎসব হয় মাসিমার বাড়িতে।জমিদারির সমস্ত লোকজন, মজুর, কর্মচারী সেদিন ডিনারেনিমন্ত্রিত হয়। কয়েকদিন আগে থেকে বাড়িরগৃহিণী-পাচকেরা বস্ত থাকে মিষ্টি, রুটি, কেক ও নানারকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতে। ঘর-দোর ঝাড়তে পুঁছতে হয়, ফুল দিয়ে সাজাতে হয়। বড় 'ক্রিসমাস ট্রি' তৈরি করে তাকেখাদ্যদ্রব্যসম্ভারে ও ফুল, পাতা, বাতি দিয়ে সাজাতে হয়, জমিদারির সমস্ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়, উপঢৌকন দিতে হয়।

সে এক বিরাট ব্যাপার।

ম্যাডিরা দ্বীপ

আমি যখন ম্যাডিরা দ্বীপে ভ্রমণে যাই, তখন গ্রীষ্মকালেরমাঝামাঝি। ম্যাডিরা দ্বীপ পোর্তুগীজ গবর্নমেন্টের অধিকৃত পূর্ব আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপেরপুষ্পিত বনানী ও উচ্চ পর্বতমালা, গভীর উপত্যকারাশি ওঅন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে একটা স্থায়ী প্রভাবেরসৃষ্টি করেছিল।

সেখান থেকে যখন চলে এসেছিলাম তখন শীতকাল। কিন্তু ম্যাডিরার সৌন্দর্য তখনোঅক্ষুণ্ণ ও অটুট দেখেএসেছি, পরিপূর্ণ সূর্যালোক, পুষ্পসমাকুল অরণ্যানী শীতেরপ্রভাবে এতটুকু ম্লান হয়নি। উত্তাপও কমেনি।

ডিসেম্বর মাসে ম্যাডিরায় রাজধানীর পেছনদিকে অবস্থিত উচ্চ পর্বতমালার শিখরাগ্রভাগে কিছু কিছু তুষারসঞ্চার দেখা যায়—কিন্তু দ্বীপের অন্য সব জায়গায়শ্যামলতার প্রাচুর্য পূর্ববৎ থাকে। পুরাতন ফুঞ্চল শহরের সর্বত্র ফুলের শোভা অটুট থাকে।

ইন্দ্রনীল মণির মতো সমুদ্রের পটভূমিতে থাকে থাকেসজ্জিত শ্যামল শৈলশ্রেণির কী শোভা !

উদ্যান-রচনা ম্যাডিরা দ্বীপের ও তার রাজধানীর একটিপ্রধান শিল্প; এমন কোনো স্থান নেই, যা চক্ষুকে পীড়াদানকরে তার কুশ্রীতার দ্বারা। সমগ্র ম্যাডিরা দ্বীপ যেন একটিবর্ণসমৃদ্ধ উপবন।

শহরের প্রত্যেক রাস্তা, ফুটপাত, উদ্যান-পথ ব্যাসাল্টপাথর দিয়ে বাঁধানো। অধিকাংশ স্থলে সমুদ্রের ঢেউ এসেএসে ধুয়ে দিচ্ছে এই পথ-ঘাট ও সোপানাবলীকে।

বড় বড় রাস্তার দুধারে ধাপে ধাপে উঠেছে ফুলেরবাগান, তার প্রাচীরের পাথরগুলিতে নানা রকম কারুকার্য, ফুলের ক্ষেতের চারিধারে নানাবিধ জ্যামিতিক আকারেসাজানো পাথরের নুড়ি।

অনেক দেশ থেকে বৃক্ষলতা আমদানি করে ম্যাডিরাকে সাজানো হয়েছে। কোথাও ব্রেজিল দেশীয় পাইনশ্রেণি, কোথাও অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপটাস, ভারতীয় আম্রবৃক্ষ, তাল ও ম্যাগনোলিয়া, পত্র-নিবিড় ডুমুর গাছের পাশেই ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের বিচিত্রবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ। এমন কি ওয়েস্টইন্ডিজের প্রবাল বৃক্ষ এবং জাপানী কর্পূর বৃক্ষও দেখতেপাওয়া যাবে শহরের বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে।

সমস্ত গাছপালার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাদেরনামের তালিকা দিলে একখানা বড় বই হয়ে যায়।

তা বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, ম্যাডিরাদ্বীপে এইসব বিদেশী গাছ ছাড়া নিজস্ব উদ্ভিজ্জ সম্পদ কিছুনেই। এ দ্বীপের স্থানীয় বৃক্ষ-লতা বহু বিচিত্র শ্রেণির, তারমধ্যে ড্রাগন গাছ অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের ও দুষ্প্রাপ্য। দুঃখেরবিষয় দু'দশটি ড্রাগন গাছ ব্যতীত এই উদ্ভিদ প্রায় লুপ্ত হয়েএসেছে।

শীতকালে নানা জাতীয় পুষ্পিত লতাই বেশি।কমলালেবু রংয়ের বিগোনিয়া ও রাঙা বোগেনভিলিয়া লতা সর্বত্রই দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই সব লতারযখন ফুল ফোটে, দূর সমুদ্রের নীল পটভূমিতে রঙিন পুষ্পিতলতা ম্যাডিরা দ্বীপকে স্বর্গের মতো সুন্দর করে তোলে।

পাহাড়ের কোলে ওই সব ফুলগাছ, নীচে উপলাকীর্ণসমুদ্রতীর, বড় বড় সফেন ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রেরতীরে, সমুদ্রের ধারে ধারে লাল টালি-ছাওয়া ঘর-বাড়িরসারি—সবসুদ্ধ মিলে ফুঞ্চলের সমুদ্রতীরের শোভা ঠিকছবির মতো।

এক ঋতুতে যখন এক শ্রেণির ফুল শেষ হয়ে যায়, ফুঞ্চলে তখনই আবার অন্য ধরনের ফুলের উৎসব শুরু হয়।

বসন্তকালে ব্রেজিল দেশীয় জানাবান্ডা বৃক্ষ যখন পুষ্পিতহয় এবং তার সঙ্গে যখন মেশে উইস্টারিয়া লতারল্যাভেন্ডার রংয়ের ফুলের ঝাড় এবং প্রাইড-অফ-ম্যাডিরাবৃক্ষের নীলফুলের রাশি, তখন ভ্রমণকারীর মনে হয়, অর্থের সার্থকতা হয়েছে ম্যাডিরা বেড়াতে এসে।

ম্যাডিরা দ্বীপের অধিবাসীরা তাদের রুচির পরিচয়দিয়েছে এইসব সুদৃশ্য পুষ্পবৃক্ষ ও উদ্যানের দ্বারা, কিন্তু ধনের পরিচয় দেবার তেমন কিছু নেই।

এখানকার সবচেয়ে উপার্জনপ্রদ ব্যবসা বলতে হলে বলতে হয় এখানে আগত ভ্রমণকারীর দলকে। বড় বড়আটলান্টিক লাইনের জাহাজ ব্যতীত আরো অনেক ছোটছোট জাহাজ একক হিসেবে 'আটলান্টিকের পুষ্পোদ্যান' এই সুন্দর দ্বীপে যাত্রী নিয়ে আসে।

যেসব জাহাজ অন্য জায়গাতেও যাবে, যাবার পথেতারা অন্তত এক দিনের জন্যেও ম্যাডিরা দ্বীপে থামিয়েরেখে যাত্রীদের ম্যাডিরার সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ দিয়েথাকে।

আমি জনৈক পুরাতন অধিবাসীকে বলতে শুনেছি, 'আমাদের এখানে ফসলের চাষ নেই তেমন, কিন্তু আমাদেরপ্রাচীন ফসল এই ভ্রমণকারীর দল।'

ভ্রমণকারীরূপ শস্য কিভাবে নিখুঁতরূপে চাষ করতে হয়, বহু বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে ম্যাডিরাবাসী তা জানে।

এরা ভ্রমণকারীর কাছ থেকে পয়সা আদায় করার কৌশলঅদ্ভুতরকমে আয়ত্ত করেছে। ভ্রমণকারীরা জাহাজ থেকেস্টিম-লঞ্চে চেপে জেটিতে নামবার পূর্বেই ছোট ছোট দেশী নৌকা নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজ ঘিরে দাঁড়ায়। কেবল সরল ও অনভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর চক্ষু ধাঁধিয়ে দিতেপারবার ক্ষমতা থাকা ছাড়া এসব জিনিসের অন্য কোনোমূল্য বড় একটা নেই। ম্যাডিরার সর্বত্রই এইসব টুকিটাকি শৌখিন জিনিস তৈরি করবার কারখানা আছে। এর মধ্যেঅনেক রকম দ্রব্য আছে।

ম্যাডিরার বিখ্যাত সূচীশিল্পের নমুনা, বেত ও বাঁশেরকাজ, কাঠের উপর খোদাই ও পাথর বসানো কাঠের কাজ, ছড়ি, অলঙ্কার, পালকের ফুল ইত্যাদি সাধারণত বিক্রয়ার্থেথাকে। এসব বাদে আছে খাঁচা-বোঝাই সবুজাভ ক্যানারি পাখি, দেশী টিয়া। পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার বাঁদর ওনারিকেল।

জাহাজ যেমন এসে ডাঙায় ভিড়ল, অমনি ডুবুরিবণিকের দল আসে জলের তলায়, পয়সা ফেলে দিলে ডুব দিয়ে তা সংগ্রহ করবার জন্যে।

—একটা শিলিং ফেলে দিন, মিস্টার, একটা শিলিংফেলে দিন !

তারপর যেমন ফেলে দেওয়া, অমনি চক্ষের পলকে ডুবদিয়ে স্বচ্ছ সমুদ্রতল থেকে চকচকে মুদ্রাটি তুলে এনেএকগাল হেসে ভ্রমণকারীকে দেখায়। অবশ্য মুদ্রাটি আরফেরত দিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। যেদেশের পতাকাই উড্ডীয়মান থাকুক, জাহাজের মাস্তুল থেকেএরা সর্বদাই একটা শিলিং চাইবে, ব্রিটিশ মুদ্রার ওপর এদেরঅগাধ বিশ্বাস। ম্যাডিরা দ্বীপে পর্তুগীজ গবর্নমেন্টের ব্রিটিশ শিলিংও চলে। ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইংরেজদের সংখ্যাইবেশি থাকে।

তীরে নামলেই দেখা যায়, মোটর-চালকের দলমোটরগাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নানাদিকেমোটর-ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শুরু করবে এবং শাল গায়ে মেয়েরা ভায়োলেট গোলাপ প্রভৃতি বিক্রি করতেআসবে।

মোটর-বাস ও গাড়ি বাদে ফুঞ্চলের রাস্তায় দেশী গোরুরগাড়ি চলে। এই গোরুর গাড়ির ওপর আচ্ছাদন দেওয়া, মধ্যেবেঞ্চি পাতা আছে। ভ্রমণকারীরা নিজেদের ইচ্ছামতো মোটরবা গরুর গাড়ি পছন্দ করে নিয়ে ফুঞ্চলের পাথর বাঁধানোউঁচু-নীচু রাস্তা বেয়ে রেলওয়ে স্টেশনে নীত হয়।

রেল শুধু পাহাড়ে উঠবার জন্য। প্রায় খাড়া ঢালু পথদিয়ে কগ্ রেলওয়ের ট্রেন ৩৫০০ ফুট উঠে যায়। রেলওয়েট্রেন বেয়ে উঠবার সময় ছেলেমেয়েরা যাত্রীদের গায়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করে। এই রেলপথের দুধারে তারা ফুল হাতে আর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের এইকাজটি খুবই হৃদয়গ্রাহী বলে গণ্য হত যদি না তারা সঙ্গেসঙ্গে চেঁচাত একটা পেনি, মিস্টার, একটা পেনি।

পাহাড়ে উঠবার সময় ট্রেন খুব আস্তে আস্তে যায়, কিন্তুনামবার সময় যেসব যাত্রী চমক পছন্দ করেন, তাঁরা গড়ানোস্লেজযোগে নামতে পারেন।

ওপর থেকে চার-পাঁচখানা স্লেজ একসঙ্গে ছাড়ে।গড়ানোঢালু রাস্তা বেয়ে যখন স্লেজগুলো সবেগে নীচের দিকে বেগে আসছে, তখন সাহসী যাত্রীগণ মুহূর্তে মুহূর্তেনতুন নতুন দৃশ্যাবলীর সম্মুখীন হয়। এই ফুলের বন, এইহঠাৎ এক ঝলক নীল সমুদ্রের দৃশ্য, এই অনাবৃত ম্যাজেন্টারংয়ের পাহাড়ের দেওয়াল, এই হয় তো একটি লাল টালি-ছাওয়া আবাসগৃহ, কখনো বা পাশের প্রাচীরের ওপরদণ্ডায়মান উৎসুকমুখে সুশ্রী বালক-বালিকার দল।

স্লেজের সঙ্গে গাইড থাকে, বাঁকের মুখে স্লেজগুলোএলে সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে স্লেজের গতি সংহতকরে।

আপাতদৃষ্টিতে এরকমভাবে নামা বিপজ্জনক মনে হয়যদিও, কিন্তু এ পর্যন্ত ম্যাডিরার ঢালু পথে নামবার সময় কোনো দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়নি।

সময় হাতে থাকলে দর্শকগণ দ্বীপের আরো অনেক সুন্দরস্থান মোটরে বেড়াতে পারেন। শহর থেকে দূরে নিভৃতপার্বত্য উপত্যকাগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, কিন্তুআফ্রিকা থেকে যাতায়াতের পথে যাঁরা এখানে নামেন, তাঁদের সময় বড়ই কম থাকে, ফলে তাঁরা শুধু ফুঞ্চল শহরও চারিপাশের পাহাড়ের দৃশ্য দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্যহন।

খুব কম ভ্রমণকারীরাই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগের এই নির্জনউপত্যকাগুলি দেখেছেন। ম্যাডিরার সাধারণ লোকের একটিবিশেষত্ব সকলের চোখে পড়বে, তারা বোঝা বইতেঅদ্বিতীয়। পল্লী অঞ্চল থেকে তারা নানা জিনিস শহরেবিক্রি করতে আনে। পাথরের কঠিন রাজপথে চলবার সুবিধের জন্য তাদের পায়ে নরম ছাগচর্মের পাদুকা। কিন্তুতাদের কাঁধের বোঝার বিপুল বহর দেখলে আশ্চর্য হয়েযেতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দৈহিক ওজনঅপেক্ষা ভারী বোঝা অক্লেশে বহন করে।

পর্তুগালের এটি একটি উপনিবেশ, কিন্তু এইঔপনিবেশিকদের মাতৃভূমির রাজধানী লিসবন—এই শান্তঅর্ধ-নিদ্রিত ফুঞ্চল শহর ও ম্যাডিরার নিভৃত পল্লী-প্রান্তেরতুলনায় কর্মচঞ্চল ও শব্দমুখর।

লিসবনের রাজপথগুলি দ্রুতগামী মোটরগাড়ির ভিড়েও সচল যানবাহনের শব্দে সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে, অথচ ৬০০মাইল দূরবর্তী এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি যেন শান্তির আসর, কবি ওভাবুকের উপযুক্ত বাসস্থান বটে।

জানি না স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কবির সংখ্যা কত ?

এখানকার স্লেজ পাহাড়ি রাস্তায় ওঠা-নামা করবার পক্ষেসম্পূর্ণ উপযুক্ত, এদেশে এই গাড়ি না হলে স্থানীয়অধিবাসীদের চলে না। লিসবনের মতো মোটরের ভিড়হলে এখানকার অধিবাসীদের কোনো সুবিধা নেই।

পৃথিবীর সব দেশই যদি একরকম দেখতে হত, তবে বেড়াবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকত কি ?আজকাল বর্তমানসভ্যতার যুগে ঠিক এই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবী। সব শহর এক রকম; সেই মোটরের ভিড়, সেই ট্র্যাফিক পুলিশ, সেই লালনীল আলোর বিজ্ঞাপন, সেই সিনেমা, হোটেল, রেস্তোরাঁ...।

আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, ভারতবর্ষ সব দেশ ক্রমশ একাকার হয়ে আসছে। এখন তাই ভালো লাগেসেই সব দেশকে যে দেশের নিজস্বতা এখনো বিলুপ্ত হয়নি, এখনো যে দেশে গরুর গাড়ি চলে, রেডিও লোকে

চোখেওদেখেনি, মোটরগাড়িতে কালেভদ্রে চড়েছে। পৃথিবীর সেইশ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য দেশসমূহের মধ্যে ম্যাডিরা দ্বীপ একটি প্রধানস্থান।

ফুঞ্চলের রাস্তায় এতটুকু ধুলো নেই কোথাও। রাস্তাঘাটসর্বদা পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে। এই ধরনেরদ্বীপগুলি আসলে সমুদ্রগর্ভস্থ বিরাট পর্বতের স্কন্ধদেশ ওমস্তক। ম্যাডিরাকে যদি আমরা এইরূপ একটি পর্বত বলেধরি, তাহলে এর আকৃতি আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে।

ম্যাডিরার সর্বোচ্চ পর্বতের শিখর মাউন্ট রুইতো থেকে দ্বীপের গভীরতম তলদেশ, যা সমুদ্রতলে ঠেকেছে, সবটাপ্রায় ২০,০০০ ফুট।

এই পর্বতের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ম্যাডিরা দ্বীপ নামে পরিচিত হয়ে লোকচক্ষুর গোচরীভূত। বাকি অংশ শহরেরদক্ষিণ দিকের লবণাক্ত সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত।

ম্যাডিরা একটি দ্বীপ নয়, দ্বীপপুঞ্জ—আরো অনেকগুলিদ্বীপ পাশাপাশি ছড়িয়ে রয়েছে, ফুঞ্চলের পূর্ব উত্তরে পোর্টোসান্টো ও আরো দুইটি দ্বীপ, তাতে মানুষে বাস করে না। বেশ বোঝা যায় যে, এর উৎপত্তি ঘটেছে পুরাকালেরসমুদ্র-গর্ভস্থ কোনো আগ্নেয় উপদ্রবের দরুন।

চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের যা গভীরতা ম্যাডিরার নিকটবর্তীসমুদ্রের গভীরতা তার চেয়ে অনেক বেশি। সে আগ্নেয়গিরির জীবন্ত অগ্নিকটাহ ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জের কোথাও দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় আরো দক্ষিণে ক্যানারি ও কেপভাড দ্বীপপুঞ্জে।

শাসনকার্যের দিক থেকে দেখতে গেলে ম্যাডিরাপর্তুগালের ঠিক উপনিবেশ নয়, অন্তত সেভাবে এরশাসনকার্য চলে না। ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জকে পর্তুগালের একটাজেলা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট এখানেগবর্নর নিয়োগ করে পাঠান।

অন্য দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে, একজনক্যালিফোর্নিয়াবাসীর পক্ষে তাদের দেশের রাজধানীওয়াশিংটন ডি-সি-তে পৌঁছুতে যে সময় লাগে, একজন ম্যাডিরাবাসী তার অর্ধেক সময়ে নিজের মাতৃভূমির রাজধানী লিসবনে পৌঁছুতে পারে।

ম্যাডিরা দ্বীপের আবিষ্কারের কাহিনী বড় রোমান্টিক ধরনের। এই কাহিনীর মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিক সত্যআছে তা বিচার করে বলা শক্ত। সে কাহিনীটি এই যেচতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুটি ইংরেজ প্রেমিক-প্রেমিকা, রবার্ট ম্যাকিন ও আনা ডারফে, ক্ষুদ্র একটি নৌকায় জনকতকমাঝি-মাল্লা নিয়ে ফ্রান্সের উপকূলের দিকে যাত্রা করে।

লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে পরস্পরকে বিবাহ করবে, এইছিল এদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এদের ক্ষুদ্র নৌকাখানা ঝড়ের মুখে পড়ে গেল এবং ডুবু-ডুবু অবস্থায় ম্যাডিরা দ্বীপের পূর্ব উপকূলে নীত হল। সকলে জাহাজ থেকে নেমে এই দ্বীপের বনের ফলে ও ঝরনার জলে কিছুকাল নিজেদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে আনন্দে দিন কাটাতে থাকে।

তারপর এল দুর্ঘটনা।

এক রাত্রিতে বিষম ঝড়ে ওদের তরী বাহির-সমুদ্রে গিয়েপড়ল। সেই সময়কার কষ্টে ও বিপদে মেয়েটি মারা গেল। শোক সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন পরে রবার্টও মারাপড়ল। পূর্বের তরীখানা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মাঝি-মাল্লারা আর একখানা নৌকা তৈরি করে দেশের দিকেরওনা হল।

কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে তাদের নৌকা নীত হল বার্বারিউপকূলে—সেখানে ওরা মূর জাতির হাতে হল বন্দী।

এ ঘটনার পরে বহুদিন চলে গেল। অনেককাল পরে জুয়ান দ্য মরেল্‌স্‌ নামে জনৈক নাবিকের আত্মীয়েরা বিক্রয়পণস্বরূপ অনেক টাকা দিয়ে তাদের উদ্ধার করলে মূর দস্যুদের হাত থেকে। এই জুয়ান দ্য মরেল্‌স্‌ দেশে ফিরেপর্তুগীজ নাবিকদের কাছে রবার্ট ম্যাকিন ও তার প্রেমিকাআনা ডারফের গল্প করল ও প্রসঙ্গক্রমে ম্যাডিরা দ্বীপ আবিষ্কারের কথাও বললে। জুয়ান দ্য মরেল্‌স্‌ এ গল্প শুনেছিল বন্দী অবস্থায় অন্য বন্দীদের কাছে, যারা রবার্টম্যাকিনের জাহাজের মাল্লা ছিল। ক্রমে এই গল্প উঠল সেযুগের সুবিখ্যাত নাবিক ও দেশ-আবিষ্কারক প্রিন্স হেনরী দিনেভিগেটরের

কানে। তিনি এই গল্পের সত্যতা নির্ধারণেরজন্য একখানা জাহাজ সাজিয়ে সেকালের অন্যতম বিখ্যাতনাবিক জোয়াও গনসালভে জার্কোর অধ্যক্ষতায় দক্ষিণআটলান্টিকে পাঠিয়ে দিলেন।

জার্কোর সময়ে যখন গল্পটা এসে পৌঁছাল, তখন আমরাদৃঢ়তর ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এসে দাঁড়িয়েছি। প্রিন্সহেনরীর স্বপক্ষে তিনি সিউটার যুদ্ধে মূরদের বিরুদ্ধে লড়াইকরেছিলেন। তিনি ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দে পোর্টো সান্টোতেজাহাজ নিয়ে যান এবং এখান থেকে তেইশ মাইল দূরবর্তী আরো একটি দ্বীপে গিয়েও নোঙর ফেলেন। দূর থেকে দেখাগিয়েছিল, একখণ্ড সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দ্বীপটার উপর যেনউপুড় হয়ে রয়েছে। সে যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে এই দৃশ্যছিল অমঙ্গলসূচক। কিন্তু জার্কো তা গ্রাহ্য করেননি।

তিনি যখন জাহাজ নিয়ে দ্বীপের নিকটবর্তী হলেন, তখনদেখা গেল কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড আর কিছুই নয়, অতি সুন্দরঅরণ্যাকীর্ণ একটি উচ্চ পর্বতের উপরিস্থিত বাষ্পরাশি।দ্বীপটির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। জার্কো সঙ্গিগণসহনিকটবর্তী একটি শান্ত উপসাগরে জাহাজ নোঙর করলেন।

এই উপসাগরের তীরেই আজকাল ম্যাডিরা দ্বীপের অন্যতম ক্ষুদ্র শহর ম্যাটিকো অবস্থিত। এই স্থানটি ফুঞ্চলথেকে প্রায় উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

যদি ইংরেজ প্রেমিকযুগলের গল্পের কিছুমাত্র সত্যতাথাকে, তবে এই শহর আজও তাদের নাম বহন করছে।

অত্যন্ত বনাকীর্ণ হওয়ায় নবাবিষ্কৃত দ্বীপের নামকরণ করাগেল ‘ম্যাডিরা’। পর্তুগীজ ভাষায় এর অর্থ ‘বন’। জার্কোদ্বীপের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।বন্য জন্তু ও বিষাক্তসর্প বিতাড়নের জন্য প্রত্যেক দিন বনে আগুন দেওয়ারনিয়ম প্রবর্তিত হল। তাতে ম্যাডিয়ার আদিম অরণ্যানীরশোভা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। এ অগ্নিদান সম্পূর্ণইনিরর্থক ছিল, কারণ ম্যাডিরার বনে কোনো বন্য জন্তু বা সর্প ছিল না।

সিসিলি থেকে ইক্ষু আমদানি করা হয়। শীঘ্রই এখানেবড় বড় ইক্ষুক্ষেত্র গড়ে উঠল এবং নিগ্রো ও মূর ক্রীতদাসআফ্রিকা থেকে আমদানি করা হতে লাগল ইক্ষুক্ষেত্রের কাজের ও রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজেরজন্যে।

সেই প্রাচীন যুগের পয়ঃপ্রণালী ম্যাডিরার উচ্চ পর্বতমালার সানুদেশে এখন বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, এবং এখনো তাতে বেশ কাজ চলে যায়। এই পয়ঃপ্রণালী না থাকলে ম্যাডিরার সমতলভূমিতে বৎসরের অধিকাংশসময় জল পাওয়া যেত না।

ক্রমে অভিজাতবংশীয় একদল লোকের আবশ্যক হয়েপড়ল ম্যাডিরার সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের নেতৃত্বকরবার জন্য। তখন পর্তুগাল থেকে কয়েকজন অভিজাত-বংশীয় লোক ম্যাডিরায় প্রেরিত হল। এদেরমধ্যে তিনজন তরুণ অভিজাত যুবক ছিল। জার্কোর তিনমেয়ের সঙ্গে এদের তিনজনের বিবাহ হয়।

দ্বীপে প্রথম জন্মগ্রহণ করে যমজ শিশু—ভাই ও ভগ্নী।তাদের নামকরণ হয়েছিল আডাম ও ইভ। জার্কো অভিজাতপদটিতে উন্নীত হয়ে চল্লিশ বৎসর দ্বীপ শাসন করেছিলেন।আমি ফুঞ্চলের প্রাচীনতম গির্জা সান্টা ক্লারার সমাধিভূমিতেজার্কোর সমাধি দেখেছি।

আর একজন জগদ্বিখ্যাতলোকের সঙ্গে পোর্টো সান্টো ওম্যাডিরার পূর্ব ইতিহাস জড়িত আছে। অজ্ঞাত পশ্চিমমহাসমুদ্র সম্বন্ধে খবর নেবার জন্য ক্রিস্টোফার কলম্বাস তখন জাহাজে এখানে ওখানে বেড়াতেন, এ অবস্থায় তিনিপোর্টো সান্টোতে আসেন এবং স্থানীয় গবর্নরের সুন্দরীকন্যা ফিলিপা পেরেস্ট্রোলোকে বিবাহ করে কিছুদিন এখানে অবস্থান করেন। পোর্টো সান্টোতে ভিলা ব্যালিরা শহরে সেবাড়িটা আজও আছে।

কলম্বাস এই বাড়িতে বসে নির্জন পশ্চিম মহাসমুদ্রের চার্ট তৈরি করেন। মাঝে মাঝে ফুঞ্চলে এসে গ্রামীণ নাবিকদের কাছে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতেন। ম্যাডিরা, কার্নোর ও আজোরাস দ্বীপপুঞ্জে তিনি প্রত্যেক অভিজ্ঞ নাবিকের মুখে গল্প ধীরভাবে শুনতেন, তা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন ও পশ্চিম আটলান্টিকের ঢেউয়ে কূলেভেসে আসা কাঠ-কুটো, কি অন্যান্য জিনিসপত্র মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন।

তারপর যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রতিভা পশ্চিমমহাসমুদ্রের পারে এক অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কার করল—তখন এই সব দ্বীপের সুদিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী যেসব ছোট বড় জাহাজ এই পথ দিয়ে যেত, পোর্টো সান্টো ও ম্যাডিরার বন্দরে তারা জাহাজ ভিড়াত দু’একদিনের জন্য।এতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে গেল।

ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ম্যাডিরা দ্বীপের আরো উন্নতিশুরু হল।

ঠিক ওই সময় পর্তুগালের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রনৈতিক মৈত্রী সংঘটিত হয়, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয়চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিবাহ করার দরুন। ফলে ব্রিটিশ বণিকদল নানারকম সুযোগ ওসুবিধামূলক সনদ নিয়ে দলে দলে ম্যাডিরাতে আসতেআরম্ভ করল।

যদিও প্রায় এক শতাব্দী কাল হল ম্যাডিরা হতে ব্রিটিশবাণিজ্য-কুঠী উঠে গিয়েছে, এখনো দ্বীপের অধিকাংশবাণিজ্য ইংরেজদের হাতে। এখানে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশআছে এবং এখনো দ্বীপে যে সকল ভ্রমণকারী বেড়াতে আসে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ।

ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপে কেউ বাস করেনা।এদের মধ্যে বড়টির নাম ডেজার্টা গ্রান্ডি, এখানে বহুবন্য জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের সামুদ্রিক পাখিএর সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের ফাটলে বাস করে। ম্যাডিরা থেকে মাঝে মাঝে শিকারিরা পক্ষী শিকারের জন্য ওখানে যায়।

[হ্যারিয়েট অ্যাডাম্স্-এর লিখিত প্রবন্ধ হইতে]

আইল অফ ম্যান

ম্যান দ্বীপ আইরিশ সমুদ্রে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তরআয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত। হল্ ফেন্ তাঁর উপন্যাসে এইদ্বীপকে সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাইরের লোক এখনো ম্যান দ্বীপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীন যুগে জনৈক আইরিশ বীর ফিন ম্যাককুল শত্রুবিনাশের জন্য একমুষ্টি আয়ার্ল্যান্ডের ধূলি নিক্ষেপ করাতে এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রবাদেরমধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক ধরনের।ভূতত্ত্ববিদ্ গণের মতে ম্যান দ্বীপ এক সময়ে নিকটবর্তী বৃহত্তর দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ম্যান দ্বীপ আর ইংল্যান্ডের প্রাসাদ ‘লেক ডিস্ট্রিক্ট’-এর ভূতত্ত্ব একই।

এই দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীগণের বিবরণ ফিনম্যাককুল-সংক্রান্ত গল্পের মতোই অদ্ভুত। পূর্বে নাকি এখানে পরীদের রাজা রাজত্ব করতেন। তারপর আয়ার্ল্যান্ড থেকে সেন্ট প্যাট্রিক এসে দ্বীপ থেকে বিষধর সর্পকুল তাড়িয়ে দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন।

কিংবদন্তীর কথা বাদ দিয়েও যখন আমরা ঐতিহাসিকসময়ের মধ্যে আসি, তখনো দেখতে পাই, ম্যান দ্বীপের ইতিহাসের সঙ্গে বহু বিস্ময়কর ঘটনা জড়িত। এখানে কেল্টজাতির যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে, তাদেরওপর দিয়ে কালের মতো রূঢ় ঘটনাস্রোত অবাধ গতিতেচলে গিয়েছে—কিন্তু তাদের শক্তি ও আনন্দকে দমিয়ে দিতেপারেনি।

এই দ্বীপে আইরিশ, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান, স্কচ ও ইংরেজরাজারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছেন। তারপর যখনপ্রথম এডওয়ার্ডের শাসনাধীনে এই দ্বীপ এল, তখন তিনি ও তাঁর বংশীয়গণের প্রথা ছিল যে, সভাসদগণের প্রিয়পাত্রয়ে, তাঁকে এই দ্বীপ জায়গীর দেওয়া হত।

১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে এই ভাবে ম্যান দ্বীপ স্ট্যান্লি বংশেরজায়গীরভুক্ত হয়ে পড়ল। এই বংশের নাম ইংল্যান্ডেরইতিহাসে সুপরিচিত—এঁদের আদি বাড়ি ল্যাঙ্কাশায়ারে।১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এঁরাই ম্যান দ্বীপ শাসন করেন, পরেডিউক অফ অ্যাটোল-এর দখলে এই দ্বীপের জায়গীরস্বত্বচলে যায়।

এর ঊনত্রিশ বছর পরে ব্রিটিশ জাতির নিকট এই দ্বীপবিক্রিত হয়।

যদিও বর্তমানে ইহা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীন—কিন্তুদ্বীপের প্রাচীন প্রথাগুলি ও আইন এখনো বজায় আছে।ম্যান দ্বীপ বিশেষ বড় নয়, দৈর্ঘ্যে মাত্র ত্রিশ মাইল এবং প্রস্থে বারো মাইলের বেশি নয়। কিন্তু এখানে এদেরনিজেদের আদালত, আইন ও ব্যবস্থাপক সভা আছে। নতুনআইনগুলি অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনেরঅপেক্ষা রাখে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালের এক সুন্দর দিনে আমি দীর্ঘ অবকাশ যাপনের জন্যে ম্যান দ্বীপে পদার্পণ করি। যে জাহাজে আইরিশ সমুদ্র পার হচ্ছিলাম, তার নাম “বেন-মাই-ক্রি”—অর্থাৎ হৃদয়বাণী। ম্যান্ দ্বীপের লাল পতাকা জাহাজের মাস্তুলে উড়ছিল। পতাকায় যে চিত্রটিঅঙ্কিত আছে, এটা ম্যান্ দ্বীপের প্রাচীন জাতীয় পতাকারচিহ্ন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে রাজকীয় অসি এখানকার শাসনকর্তৃত্বের প্রতীক, তার হাতলের গায়েও এই চিহ্নটি খোদাইদেখতে পাওয়া যায়।

জাহাজে যতক্ষণ ছিলাম, বেশ কাটল। একদিন ল্যাঙ্কাশায়ারের নরনারী ছুটি পেয়ে বেড়াতে যাচ্ছিল ‘ম্যান দ্বীপে’, তারা খুব আনন্দে স্ফূর্তির সঙ্গে গান গাইতে গাইতেচলেছিল।

তারা সবাই যাচ্ছিল ম্যান্ দ্বীপের আধুনিক রাজধানীডগলাস শহরে। শহরটি খুব সুন্দর একটি উপসাগরের তীরেঅবস্থিত।

কিন্তু ডগলাস শহরের আধুনিক হোটেলগুলির উপর আমার নিজের কোনো মমতা ছিল না, সুতরাং আমি ট্রেনেচেপে পুরাতন রাজধানী কাস্‌লটাউনের দিকে চললাম।কাস্‌লটাউন দ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং এর সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে।

এখানে ট্রেনে চড়া বড় মজার ব্যাপার। এই ছোট্টপুতুলপুরীর মতো দ্বীপে সবই যেমন ছোট্ট, এখানকার রেলগাড়িও তেমন ছোট্ট ব্যাপার, বিশেষত ইংল্যান্ড ওইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকে আসবার পরে এরেলওয়ের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে কি করে ?কিন্তু কাস্‌লটাউনের একটা নিজস্ব আভিজাত্য আছে।

ম্যান দ্বীপের অন্যান্য শহর ভ্রমণকারীরা ক্রীড়াভূমিতেপরিণত করে, কিন্তু কাস্‌লটাউনের প্রতি তারা তেমন মমতাদেখায় নয়—শুধু প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গটি দেখেই চলে যায়।ফলে শহরটির প্রাচীন আবহাওয়া ও শান্তি আধুনিকতারহট্টগোলে কলঙ্কিত হয়নি।

কাস্‌লটাউন উপসাগরের তীরে এই শহরটি অবস্থিত। কাসেল রুশেন্ নামে প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গের চারিপাশ ঘিরে এই শহর তৈরি হয়েছিল। শহরের রাস্তাঘাট পুরানো ধরনেতৈরি ও অত্যন্ত সংকীর্ণ। বড় একখানা মোটর-বাস চলবার উপায় নেই রাস্তায়। কিন্তু শহরের অধিবাসীরা এজন্য কোনো অসুবিধা বোধ করে না, বরং তারা তাদের প্রাচীনত্বের জন্যগর্বই অনুভব করে।

প্রাসাদ-দুর্গের সামনে একটি পার্ক। এই পার্কে এক অদ্ভুতমনুমেন্ট আছে, পৃথিবীতে কোথাও তেমন নেই, একথাজোর করে বলা যায়।

পার্কের ঠিক মাঝখানে একটি প্রস্তরের উচ্চ পাদ-পীঠ, তার গায়ে লেখা আছে যে, কর্নেল কর্নেলিয়ান স্মেল্ট নামে জনৈক ভূতপূর্ব শাসনকর্তার প্রস্তরমূর্তি এখানে সাধারণের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হল—তাঁর প্রতি জনসাধারণের অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ।

কিন্তু পাদ-পীঠে সে প্রস্তরমূর্তি কই ?পাদ-পীঠ শূন্যকেন ?

জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে, যতদূর চাঁদা আদায়হয়েছিল, তাতে ওই পর্যন্তই নির্মিত হয়েছে। বাকি চাঁদা আজ পর্যন্তও কেউদেয়নি। সুতরাং মূর্তি গড়া সম্ভবপর হয়েওঠেনি। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপূর্ব নিদর্শন বটে !

আর একটা অদ্ভুত জিনিস এখানকার সময়জ্ঞাপক যন্ত্র।এটি একটি প্রাচীন সূর্যঘড়ি। এখানকার লোক এই ঘড়ি দেখেকিভাবে সময় ঠিক করে জানি না, আমি তো পারিনি। কিন্তুএর চেয়ে আরো অদ্ভুত জিনিস আছে এ শহরে। অনেককালআগে ইংল্যান্ডের রানী এই দ্বীপের রাজধানীকে একটিসেকালের ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন—ঘড়িটা একটা ক্লকটাওয়ারে বসানো আছে। খুব বড় ও খুব চমৎকার ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে থাকবার পরে দর্শকের মনে হয় ঘড়িটাতে কি যেন একটা নেই।তারপরেই তারচোখে পড়ে ঘড়িতে মাত্র একটি কাঁটা, ঘণ্টারকাঁটাটা আছে, অন্য কাঁটাটা বহুদিন হল ভেঙে গিয়েছে, আর সরানো হয়নি।

এসবের দরুন স্থানীয় লোকের বিশেষ কোনো অসুবিধাহয় না। কারণ অন্যান্য দেশের মতো এদের জীবন কর্মকাণ্ডনয়। কোনো কাজে এদের বিশেষ তাড়া নেই।

দু-এক ঘণ্টার এদিক ওদিক হলে এদের বিশেষ কিছু যায়আসে না। কাস্‌ল রুশেন মধ্যযুগের স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। স্থানীয় চুনা পাথরে এই প্রাচীন দুর্গের আগাগোড়া তৈরি এবং এই চুনাপাথরের প্রাসাদ বহু শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝাসহ্য করে আজও অটুট আছে।

রবার্ট ব্রুস ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ অবরোধের পরে এইদুর্গ দখল করেন। দুর্গ হিসেবে কাস্‌ল্ রুশেন প্রাচীনকালেঅর্থাৎ গোলাবারুদ আবিষ্কারের পূর্বে যে নিতান্ত দুর্ভেদ্যছিল, তা এখনো চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

এই দুর্গের সঙ্গে আর একজন ঐতিহাসিক পুরুষের নামজড়িত আছে।

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে এই দ্বীপে রাজত্ব করতেনসপ্তম আর্ল অফ ডার্বি। ইতিহাসে ইনি ‘গ্রেট স্টানলি’ নামেপ্রসিদ্ধ। ইনি ও এঁর স্ত্রী এখানে নিজেদের বাসের জন্য তাঁদের ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত প্রাসাদ ‘নোসলি হল্’-এর। অনুকরণে একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করেন।

এই আর্ল ও তার স্ত্রী ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সময়ে রাজাকেযথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এঁর স্ত্রীর নাম ছিল শার্লৎ দ্য লাত্রেমুই। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রাসাদে ইনি একা ছিলেন, যখনসৈন্যগণ তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে, তাঁর স্বামী তখন ম্যান্দ্বীপে রাজার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন—কিন্তু বীর-নারী একা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত শত্রুরআক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

স্টানলি নিজেকে খুব লোকপ্রিয় করতে পারতেন, যদিওতাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণকে কর দিতে হত বেশি এবংঅনেক সৈন্য পুষবার খরচাও দিতে হত। তাঁর একটা কথাএখনো ম্যান দ্বীপে প্রচলিত আছে :—

“আমার একটা অভ্যাস আছে, লোকজনের মধ্যে এসে প্রথমেই আমি মাথা থেকে টুপি খুলব, দু-একটা মিষ্টি কথা বলব, একটু হাসব সকলের দিকে চেয়ে। এতে করেসহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় লোকের কাছে—এসব করতেএমন কিছু বেশি হাঙ্গামা নেই, কিন্তু লোকজন খুব বাধ্যথাকে।”

রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইনি ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতহন।

তাঁর বিধবা স্ত্রী এই প্রাসাদ-দুর্গে বহুদিন রাজত্ব করেন। তারপর পার্লিয়ামেন্টের পক্ষের সৈন্যদলের কাছে ইনিআত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

এত ঐতিহাসিক স্মৃতি যে প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত—সেটিযে ম্যান দ্বীপের একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু, সে বিষয়ে কোনোভুল নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, মধ্যযুগের স্থাপত্যহিসেবে দুর্গটি চমৎকার হলেও এই দুর্গে সেকালে মানুষবাস করবে কি করে ! বেজায় পুরু পাথরের দেওয়াল, জানালা তো নেই বললেই হয়—যা আছে সে নিতান্তইক্ষুদ্র, মাঝে মাঝে আবার ফুটন্ত পিচ ঢালবার গর্ত—দুর্গহিসেবে খুব ভালো এবং এক সময়ে এসবের খুবই দরকারছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাসগৃহ হিসেবে কারাগারতুল্য ছিল নাকি ?তবে প্রাসাদের অধিবাসীদের একটা সান্ত্বনা ছিল দেখা যাচ্ছে। সেই একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, প্রাসাদেরভূ-গর্ভস্থ কারাকক্ষের বন্দিগণ তাদের চেয়েও দুরবস্থায়কালযাপন করছে।

অন্যান্য প্রাচীন প্রাসাদের ন্যায় কাস্ল্ রুশেনেও ভূতেরপ্রবাদ প্রচলিত আছে। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে নাকিশুভ্রবসনা স্ত্রীলোককে সদর ফটক দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্গে ঢুকতে দেখা যায়।

কাস্লটন শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে আধ মাইল দূরে একটাছোট পাহাড়, পূর্বে ওই পাহাড়টি ছিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতলোকের বধ্যভূমি। সমুদ্রতীর থেকে ছোট্ট পাহাড়টি উঠেছে।এর পিছনে বিখ্যাত কিং উইলিয়ামস্ কলেজ। কলেজেরসামনে যে সবুজ ক্রীড়াভূমি দেখা যায়—অত বড় খেলার মাঠ আমি কোনো কলেজে দেখিনি। কিং উইলিয়ামস্কলেজ শুধু ম্যান দ্বীপে নয়, সমস্ত ইংল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যেও একটি বড় ও ভালো পাবলিক স্কুল। অনেক নামজাদা ইংরেজ এই কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

এখান থেকে পায়ে হেঁটে ডার্বি হ্যাভেন বলে একটা ছোটজেলেদের গ্রাম পাওয়া যায়।

পূর্বে এই গ্রামে বেআইনী মদ চোলাই করার একটা বড়আড্ডা ছিল, বর্তমানে এটা এরোপ্লেনের আড্ডায় পরিণতহয়েছে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ভ্রমণের একটি সুন্দরস্থান আছে। স্থানটির নাম ন্যাংনেস, খানিকটা জায়গা সমুদ্রেরমধ্যে ঢুকে পড়েছে, আর একদিকে কাস্লটাউন উপসাগর, অন্যদিকে ডার্বি হ্যাভেন। এখানে গল্ফ খেলার সুন্দরবন্দোবস্ত আছে।

আকাশ যেদিন নির্মল থাকে, সেদিন এখানে গল্ফ খেলবার মতো আনন্দদায়ক ক্রীড়া আর কিছুই নাই। তিন দিকে নীল সমুদ্র, উঁচু নীচু মাঠে হিদার গাছে রক্তবর্ণ ফুল, পিছনের জমি একটু একটু করে উঁচু হতে হতে শেষে সাউথব্যারুল পর্বতের পাদভূমিতে গিয়ে ঠেকেছে। এ দৃশ্য দেখলেএই ক্ষুদ্র দ্বীপকে কখনো ভোলা যাবে না।

শহরের মধ্যেও বেড়াবার সুন্দর স্থান আছে। স্থানীয়লোকেরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, সন্ধ্যার সময় দিনের কাজ সেরে তারা শহরের পার্কগুলিতে বসে আড্ডা দেয় ও গান গায়, মাঝে মাঝে নানাবিধ লোক-নৃত্যেরও অনুষ্ঠান হয়।প্রাচীন দিনের প্রথা ও রীতিনীতি এখানকার অধিবাসীরা। আজও ঠিক বজায় রেখেছে, যদিও দ্বীপের আদিম ভাষা এখন প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।

ক্যাস্‌লটাউন শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে বিখ্যাতরুশেন অ্যাবী অবস্থিত। ভ্রমণকারীদের এটি একটি প্রিয় স্থান।এমন সুমিষ্ট স্ট্রবেরি ও সুস্বাদু ক্রীম ম্যান দ্বীপের আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঔদরিক ভ্রমণকারীরা স্ট্রবেরি খাবার লোভে গ্রীষ্মকালে দলে দলে এখানে আসে।

একদিন খুব বর্ষণ হয়ে গেল। ট্রাউট মাছ ধরার লোভে আমি ক্যাস্‌লটাউনের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র একটি খাঁড়িতে নৌকাকরে গেলুম; শহর পার হয়েই এক জায়গায় একটাজলচালিত ময়দার কল। কলের বৃদ্ধ মালিক আমাকে খুব গর্বের সঙ্গে তার কলটি দেখালে এবং বললে যে, প্রসিদ্ধঐতিহাসিক পুস্তক ‘ডুমস্‌ডে বুক’-এ এই খাঁড়ির ও এই স্থানের উল্লেখ আছে। নদীর দু-ধারে একপ্রকার বন্য লতারসোনালি ফুল অজস্র ফুটেছে—এখানকার ভাষায় ওই লতারনাম কুসাগ। ওর ফুল ম্যান দ্বীপের জাতীয় পুষ্প। প্রাচীনকালের বীরেরা কুসাগের ফুল বুকে ও টুপিতে গুঁজেশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করত।

অনেক ট্রাউট মাছ ধরেছিলাম সেদিন। তাই যখন রুশেনঅ্যাবীতে পৌঁছে দেখলুম যে, এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধঅট্টালিকার মধ্যে একটি পায়রার ঘর ও একটি স্তম্ভ ছাড়াআর কিছুই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নেই, তখন মাছ ধরার আনন্দে মনের কষ্ট ভুলে গেলাম। কয়েকশত বৎসর পূর্বে সিস্টার সিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক এই ভজনালয়নির্মিত হয়। ফলে এখানকার সাধুসন্ন্যাসীগণ রাজনৈতিকক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। মার্টিনলুথারের নতুন ধর্ম প্রচারের পর এঁদের শক্তি খর্ব হয়। এইবিরাট ভজনাগারের উদ্যানে আর একটি প্রাচীন কীর্তি কালের ধ্বংসলীলা উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে—সেটি একটি ক্ষুদ্র কুব্জ-দেহ সেতু। সেতুটির নামসন্ন্যাসীর সেতু (Monk’s bridge)। নামটি যদিও এখনোপ্রচলিত আছে, তথাপি সেতুর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, কেবল এর তিনটি প্রাচীন খিলানের নীচে দিয়েক্ষুদ্র শান্ত পল্লী নদী স্যানটন বার্ন চারশ বছর আগেকার মতোই নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর ট্রাউটমাছ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ম্যান দ্বীপের অধিবাসীরা সুনিপুণমৎস্যশিকারি। স্যানটন বার্ন নদীর ধারে কয়েকটি বড় জেলেদের গ্রাম ও মাছ ধরার আড্ডা আছে।

স্থানীয় পার্লামেন্টে যেসব আইন পাশ করা হয়, এখানকার প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতি বৎসর ৫ই জুলাইতারিখে ওই আইন টিনওয়াল্ড পাহাড় থেকে সকলকেপড়িয়ে শুনিয়ে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে এখানে একটি দরবার হয়।

এই নিয়ম যে কতদিনের পুরানো, তা কেউ জানে না।

তবে এটা ঠিক যে, ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যান দ্বীপের প্রথম পার্লিয়ামেন্ট বসবার সময় থেকেই এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। যখন এ দ্বীপে স্ক্যান্ডিনেভীয় রাজারা রাজত্ব করতেন, মনেহয় প্রথাটা সেই সময় থেকে চলে এসেছে, কারণস্ক্যান্ডিনেভীয় রাজারা মুক্ত আকাশতলে রাজসভা বসাতেনএবং পাহাড় বা কোনো উচ্চ স্থান থেকে তাঁদের আদেশ প্রজাসাধারণকে জানিয়ে দিতেন।

এবার ৫ই জুলাই এসে পড়াতে আমি ঠিক করলাম, আমিও দরবার দেখতে যাব।

জনৈক বন্ধু তাঁর মোটরে আমাকে সেন্ট জনস্‌ গ্রামেনিয়ে গেলেন, যেখানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ টিনওয়াল্ড পাহাড় অবস্থিত।

সারবন্দী হয়ে দর্শকদল দেখি পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়েরয়েছে। আমাদেরও তাদের মধ্যে স্থান-সংগ্রহের জন্যবিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

পাহাড়টি কৃত্রিম, বারো ফুট উঁচু এবং আশি ফুট পরিধিবিশিষ্ট। প্রবাদ এই যে, দ্বীপের সতেরোটি বিভিন্ন ধর্মযাজকীয় জেলা থেকে এই পাহাড়ের মাটি আনা হয়েছে।

ঢিবির ওপর একস্থানে বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের আসন, তাঁদের পাশেই ম্যান দ্বীপের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মচারীদেরআসন। শাসনকর্তার উপাধি লেফটেনান্ট গভর্নর। এঁরবসবার জন্যে একখানা উঁচু চেয়ার পাতা।

সেন্ট জনের ভজনালয় থেকে দুশো গজ দীর্ঘ সোজারাস্তা চলে গিয়েছে টিনওয়াল্ড পাহাড়ে। এই রাস্তার দুধারেলোকে লোকারণ্য। কিং উইলিয়ামস কলেজের একদলসামরিক ছাত্র সার দিয়ে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, কিং উইলিয়ামস কলেজেরএই ছাত্র-সৈনিকদল ব্যতীত ম্যান দ্বীপে আর কোনো সৈন্য নেই।

সকলে পাহাড়ে এসে সমবেত হওয়ার পূর্বে গির্জার প্রধান ধর্মযাজক একটি প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করলেন, তারপরগির্জার দরজা খুলে এক বিরাট শোভাযাত্রা ধীরে ধীরেপাহাড়ের দিকে রওনা হল। সকলের আগে জনৈক সামরিককর্মচারী রাজকীয় তরবারি হাতে যাচ্ছিলেন। তাঁর পেছনে লেফটেনান্ট গভর্নর, তাঁর পিছনে লর্ড বিশপ, তাঁর পিছনে ম্যান দ্বীপের প্রধান বিচারালয়ের বিচারকগণ (স্থানীয় নাম, ডিম্‌স্টারস)। এঁদের পিছনে স্থানীয় পার্লামেন্টের মেম্বারগণ।এঁদের পিছনে বিভিন্ন জেলার ধর্মযাজকগণ।

এঁদের সকলেরই পরনে নানারঙের জমকালো পোশাক।সুতরাং শোভাযাত্রাটি যে নানা বর্ণে সমৃদ্ধ, তা সহজেইঅনুমেয়।

লেফটেনান্ট গভর্নর আসন গ্রহণ করবার পূর্বে ব্যান্ডবেজে উঠল এবং সৈন্যগণের তলোয়ার ও বেয়নেট রৌদ্রে ঝকঝক করে উঠল।

গভর্নরের উঠবার সিঁড়ির ধাপগুলোতে খড় বিছানো। এনাকি এখানকার বহু প্রাচীন প্রথা।

গভর্নর আসন গ্রহণ করবার পরে একটি মজার রীতি অনুষ্ঠিত হয়। জনৈককর্মচারী, তাঁর উপাধি ‘করোনার,’ (আমাদের শেরিফের মতো) তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে সভাকে বেঁধে ফেলেন (যেমন ভূতের ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করে গৃহস্থের বাড়ি বাঁধে)।

এসব প্রাচীন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একজনকর্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজি ও ম্যান দ্বীপের ভাষায় নতুনবছরের আইনগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে সকলকে শুনিয়েদিলেন।

তারপর গত বৎসরের করোনারগণ কার্য পরিত্যাগ করে তাঁদের নিজ নিজ পদের পোশাক ও দণ্ড নতুন বৎসরেরকরোনারগণের হাতে তুলে দিলেন।

শোভাযাত্রা আবার পূর্বের মতো প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে গির্জার দিকে চলল। সেখানে গভর্নর আইনগুলিতেস্বাক্ষর করেন।

সভা ভেঙে গেলে আমি তো সেখান থেকে নিকটবর্তীপিন শহরে একটি বড় মেলা বসেছে, তাই দেখতে গেলাম।পথে একটা উঁচু পাহাড় পড়ে, আমার বন্ধু বললেন,—একসময় ডাইনিদের এই পাহাড় থেকে নীচে ফেলে মারা হত।

পিল শহরের নিকটেই সমুদ্রের খাঁড়ির মুখে সেন্ট প্যাট্রিকদ্বীপ। এই দ্বীপে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ আছে। দুর্গেরনাম সেন্টপ্যাট্রিক কাস্‌ল। বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে এই প্রাসাদদুর্গ সত্যই দুর্ভেদ্য ছিল।

ঢুকবার মুখেই একজন বৃদ্ধ অধিবাসী প্রাসাদ সম্বন্ধেএকটি ভূতের গল্প করলে।

দুর্গের সম্মুখে যে প্রহরীদের ঘর আছে, ওখানে আগেপ্রতিরাত্রে একটা কালো কুকুর এসে অগ্নিকুণ্ডের সামনেবসত। কুকুরটা যে ভূতযোনি, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিলনা।সেজন্য একা কোনো প্রহরী রাত্রে দুর্গের মধ্যে যাতায়াত করত না। একবার একটা সৈন্য মদ খেয়ে অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়ে। সে বাজি রেখে কালো কুকুরের পিছনে একা যায়। একটু পরে লোকটা প্রহরীদের ঘরে ফিরে এল বটে, কিন্তু তার বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গিয়েছিল। তিন দিন পর সেবিষম যন্ত্রণা পেয়ে মারা পড়ে। কুকুরটাকেও সেই থেকেআর কেউ দেখেনি।

এই প্রাসাদ-দুর্গের গল্প বহুকাল থেকে প্রচলিত। স্যারওয়াল্টার স্কট ম্যান দ্বীপের এই ভূতের গল্প শুনে এমনচমৎকৃত হয়েছিলেন যে, তাঁর ‘The Lay of the Last Ministrel’কবিতার মধ্যে এর উল্লেখ করেছেন :—

For he was speechless, ghostly, was,
Like him, of whom the story ran
That spake the spectre hound in Man.

[ক্যাপ্টেন এফ. এইচ. মিলার লিখিত বর্ণনা হইতে।]

মণিপুর রোড দিয়ে নাগা পর্বতে পৌঁছানো যায়। এই রাস্তাছ'হাজার ফিট পাহাড়ের উপর টপকে তারপর নেমে গিয়েইমফল শহরে মিশেছে। এই ইমফল শহর আসাম-বেঙ্গলরেলওয়ের স্টেশন থেকে ক্রমশ চৌত্রিশ মাইল দূরে। এখানথেকে বর্মা-সীমান্ত খুব বেশি দূর নয়।

নাগা পর্বতে পৌঁছবার আরো অনেক রাস্তা আছে। কিন্তুসে-সব রাস্তা দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে।কাজেই সভ্য মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। এই রকম একটা রাস্তা দিয়ে আমি এবং আমার বন্ধু টান্স্টাল ১৯৩৫ সালেরবসন্তকালের এক মধ্যাহ্নে যাত্রা করি। আমরা যে বিপদকে খুঁজছিলাম তা নয়, কারণ বিপদ না খুঁজলেও এ-পাহাড়ে তা যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা গেছিলাম দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ারসন্ধানে। আমরা জানতাম এই সব জনবিরল দুর্গম পার্বত্যঅঞ্চল ছাড়া দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া আর কোথাও পাওয়া যায়না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, আমাদের অভিযানসাফল্যলাভ করেছিল।

এ অঞ্চলের সকল গ্রামই শৈলচূড়ায় অবস্থিত এবংতাদের চারিপাশ দুর্ভেদ্য কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পূর্বে এইসব গ্রামের ফটক বন্ধ থাকত। আজকাল খোলা থাকে। নাগাজাতি স্বভাবত মনুষ্যমুণ্ড শিকার-লিপ্সু, কিন্তু বর্তমানেব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের কঠোর তাড়নায় তাদের এইশিকার-লিপ্সা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রামেই নাগাজাতির সর্দারেরা আমাদের সঙ্গেহাসিমুখে দেখা করল এবং চুঙ্গা নামে একপ্রকার চাল থেকে উৎপন্ন মদ দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। গ্রীষ্মের প্রাখর্যঅত্যন্ত বেশি ছিল। সুতরাং এই পানীয় গ্রহণ করতে দ্বিধাকরলাম না। একটি গ্রামে আমরা কতকগুলি বিচিত্র গঠনেরকাঠের গুঁড়ির খোল দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত ডোঙা, কিন্তু পরে যখন মনে পড়ল নাগা পর্বতের ত্রিসীমানায় কোনো নদী নেই, তখন ভাবলাম সেগুলি শবাধার। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, আসলে সেগুলিমদ চোলাই করবার পাত্র।

শীঘ্রই আমরা উলঙ্গ রেংমাস জাতির দেশে পৌঁছলাম। এখান থেকে নাগা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সারামতী দূর আকাশের গায়ে চোখে পড়ে। এর তুষারাবৃত চূড়াসূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে। চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

সারামতী বারো হাজার পাঁচশ ফুট উঁচু এবং এ পর্যন্তএতে কেউ ওঠেনি। দুর্গমতা এর কারণ নয়, এর অবস্থান সভ্য জগৎ থেকে দূরে হওয়াই এর একমাত্র কারণ। সারামতীর নাম কয়জন লোকে জানে ?প্রকৃতপক্ষে এই পর্বত-চূড়া মুণ্ড-শিকারি অসভ্য জাতির দেশের মাঝখানে অবস্থিত, ম্যাপে এই অঞ্চলের বর্ণনা দেওয়া আছে। 'অশান্তির দেশ'।

অবশ্য যত সময় যাচ্ছে এই অঞ্চলের সীমানা ক্রমে ততই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তবু বলা যেতে পারে যে, এইঅঞ্চলটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

এখানকার অসভ্য অধিবাসীদের কার্যে রাজপুরুষেরাকোনো হস্তক্ষেপ করেন না, কেবল তাঁদের বলে দেওয়া আছে যে কোনো কারণেই তাঁরা ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলেঢুকে উপদ্রব করতে পারবেন না। নিজের দেশে তাঁরা যা হয়করুন।

অনেক সময়ে আইনের ও সুবিচারের মূল সূত্রগুলি এঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ইচ্ছা দমন করতে হয়।

একবার এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

এক অসভ্য গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের অঞ্চল পারহয়ে ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলের গ্রামগুলির ওপর অত্যাচারকরেছিল। টিজু নদীপারের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে সেই লুঠেরদ্রব্য নিয়ে জমা করে।

যথাসময়ে অত্যাচারিত গ্রামবাসীরা স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ করলে। ডেপুটি কমিশনার খুবশান্ত মেজাজে অসভ্য জাতির দেশে গেলেন একটামিটমাটের জন্য। ভাবটা এই যে, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, ও নিয়ে আর আইন আদালত করে কি হবে, দুপক্ষ মুখোমুখিবসে ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করে একটা সুবিধাজনক মিটমাটকরে ফেলাই ভালো।

অবশ্য মিটমাটের রাস্তা অধিকতর সুগম করবার জন্য ডেপুটি কমিশনার সাহেব একজন ইংরেজ সৈনিক কর্মচারীরনেতৃত্বে আসাম রাইফেল সৈন্যদলের পঞ্চাশজন সৈন্য সঙ্গেনিয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং কাজের খুব সুবিধা হয়ে গেল। উভয়পক্ষ মিলেক্ষতিপূরণের একটা শর্ত নির্ধারিত হল এবং লুণ্ঠনকারীর দলঅনেকগুলো বর্শা, তীরধনুক, রন্ধনপাত্র, তলোয়ার এদেরদিয়ে নিষ্কৃতি পেলে। উভয়পক্ষের সর্দারের টিপসই নেওয়ার পরে ঘটনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হল।

আমি ও টান্‌স্টাল সাত দিনে একশো সাত মাইলঅতিক্রম করে টিজু নদীর গভীর খাতের পারে উপস্থিত হই। ব্রিটিশ-শাসিত রাজ্যের এই শেষ সীমানা। আমরা এখানেস্থানীয় ডেপুটি কমিশনার ও অরণ্য বিভাগের কর্মচারী মি. বোরকে তাঁবুতে অবস্থান করতে দেখলাম।

আমরা তাঁবুতে আগে পৌঁছালাম, আমাদের পথ-প্রদর্শকও কুলিরা এল পরে। টিজু নদীর ধারে পৌঁছে দেখি, নদীরওপর বেতের দোদুল্যমান সাঁকো এত বেশি দোলে যেতিনজন কুলির বেশি একসঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে তার ওপরদিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

একজন লোকের খালি হাত-পায়ে অন্তত চার মিনিটলাগে সাঁকো পার হতে। হিসেব করে দেখা গেল, এ রকমরেটে অগ্রসর হলে আমাদের সমগ্র দলটির নদী পার হতে আজ সারা দিন লেগে যাবে। খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করাগেল, নদীর একস্থানে জল বেশি গভীর নয়, সুতরাংসেখানে হেঁটে যাওয়া কিছু কষ্টকর নয়।

পার হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা বেয়ে সরু সংকীর্ণরাস্তা এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠেছে। সেই পথে যেতেযেতে এমন এক জায়গায় পৌঁছানো গেল, যেখানে পাহাড়েরধ্বস নেমে রাস্তার একদিকে পড়েছিল। নাগারা সেখানেকাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকেরক্ষা পাবার জন্যে; বেড়ার মাথায় মাথায় বাঁশের সড়কি।জায়গাটি দেখে মনে হল, আক্রমণকারী শত্রুর দলের পক্ষে যতই ভীতিপ্রদ হোক, আমরা যখন শান্তিপ্রিয় ভ্রমণকারীমাত্র, আমাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই এখানে।

আমাদের আসবার সংবাদ পেয়ে ও-পারের এইটি গ্রামে নাগা-সর্দারেরা আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিল।কিন্তু একথা আমরা সব সময়ে মনে রেখে চলছি যে, আমরা বর্তমানে ‘অশাসিত’ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; ডেপুটি কমিশনার বলে দিয়েছিলেন যে, একা যেখানে সেখানেএসব অঞ্চলে আমরা যেন না বার হই।

সেদিন বিকেলে আমরা নিমি পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের বাইরে এক জায়গায় তাঁবু ফেলা হল এবং চা-পানান্তে পথ-প্রদর্শকেরা আমাদের নিমি গ্রামের দুর্ভেদ্য মাঠের বেড়ার মধ্য দিয়ে গ্রামে ঢুকে সব দেখাতে নিয়েগেল। গ্রামটি একটি গভীর নদীখাতের ধারে হাজার ফুট উঁচু পর্বতচূড়ায় অবস্থিত। সত্যই যে দুর্ভেদ্য স্থান, এ বিষয়েকোনো ভুল নেই।

একদিকে পাহাড়ের ওপরকার সমতল মালভূমির সঙ্গে এই গ্রামের যে যোগ আছে, সেদিকে ২০০ গজ চওড়া দুর্ভেদ্য ফণিমনসার কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল। একটা ইঁদুর পর্যন্তসেদিক দিয়ে ঢুকতে পারে না, মানুষ তো দূরের কথা।

সামরিক যানবাহনের মধ্যে কেবলমাত্র ট্যাঙ্ক পারে সেদুর্ভেদ্য কাঁটাবন অতিক্রম করতে।

নিমিগ্রাম যেতে কাঁটা জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে একটাসংকীর্ণ পথ দিয়ে আমরা গেলাম; আমাদের সামনে-পেছনে বেয়নেটধারী সিপাহীর দল ও কোমরে বাঁশের বা কাঠেরখাপ বাঁধা জোয়ান নাগা যোদ্ধার দল।

খানিকটা গিয়ে সামনে আর এক বাধা।

কয়েক ধাপ খাড়া উঁচু সিঁড়ি পার হয়ে একটা শক্ত কাঠেরবেড়ায় গিয়ে খানিকটা ফাঁক। সোজা হয়ে যাবার যো নেই, হামাগুড়ি দিয়ে না গেলে বেড়া পার হওয়া যাবে না। যেকোনো মুহূর্তে ওপর থেকে একটা শক্ত ঝাঁপ ফেলে দিয়েএই ক্ষুদ্র ফাঁকটুকুও বন্ধ করে দেওয়া যায়। সেই ঝাঁপেরনীচের দিকে অসংখ্য ছোট বড় বাঁশের তীক্ষ্ণাগ্র সড়কি।

স্থানটি দেখে মনে হল যেন আমরা মরণের ফাঁদে পাদিয়েছি। পিছনের ফণিমনসার দুশো গজ গভীর জঙ্গল, সামনে এই সড়কি-কণ্টকিত ঝাঁপ ফেলা সরু পথ। নাগারাযদি হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করবার ইচ্ছা করে, তবেপালাবার পথ আমাদের বন্ধ।

আর কয়েকটি সিঁড়ি উঠেই আমরা একেবারে গিয়েওদের ঘাঁটির মধ্যে ঢুকলাম।

এখানে যদি নাগারা ইচ্ছে করত, আমাদের খুন করেনিশ্চিহ্ন করে ফেললেও আমাদের কিছু করবার উপায় ছিলনা।

এই সুরক্ষিত নাগা গ্রামটি টিজু নদীর গভীর খাতেরঢালুতে থাকে থাকে সাজানো। একটা বাড়ির স্লেটপাথরের ছাদ তার নীচের থাকের বাড়ির মেঝের সঙ্গে এক সমতলেঅবস্থিত। এখানে নাগা স্ত্রীলোকেরা হাতে মাটির নানা রকমপাত্র গড়ছিল। পাত্রগুলির সুঠাম গড়ন দেখে মনে হবে যে, সেগুলি নিশ্চয়ই কুম্ভকারের চক্রে ঘুরিয়ে তৈরি করাহয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে জিনিস এদেশে অজ্ঞাত। যাকিছু গৃহস্থালির আবশ্যক মৃৎপাত্র—সে হাতেই গড়া হয়েআসছে চিরকাল।

আমাদের দৃষ্টি একটা লম্বা বাঁশের খুঁটির দিকে আকৃষ্টহল।

খুঁটির আগায় বাটির আকারের একটা কি কালো মতোদ্রব্য উপুড় করে বসানো। তার ধারগুলো যেন আগুনে পোড়া বলে মনে হয়।

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, জিনিসটা আসলে মানুষেরমাথার খুলি। শত্রু বধ করে তার মাথার খুলি এভাবে জনসাধারণের সামনে প্রদর্শিত হওয়াতে গ্রামের গৌরববেড়েছে। যে সম্মুখযুদ্ধে এই খুলিখানা সংগ্রহ করেছে, সে-ও সেখানে উপস্থিত ছিল। তার বয়স বেশি নয়। মেয়েলিধরনের চেহারাটা। হাতে একখানা দা নিয়ে সে বাঁশের হুঁকোতৈরি করছিল ধূমপানের জন্য।

ছোকরা খুবই লাজুক, এ খুলি তারই দ্বারা সংগৃহীতহয়েছে কিনা, আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর সে অত্যন্ত বিনয়ও সংকোচের সঙ্গে দিলে। এরকম প্রকাশ্যভাবে সবাই তারবীরত্বের প্রশংসা করলে ছেলেমানুষের লজ্জা ও সংকোচহবারই কথা।

ব্যাপারটা শুনতে আমাদের দেরি হল না।

গত বৎসর এই সময়ে আমাদের নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গেরওপরকার চোমি গ্রামের লোক এই গ্রামে হানা দেয়মুণ্ড-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাদের এ মহৎ উদ্দেশ্য বিফল হয়নি, তিনটি নরমুণ্ড সংগ্রহ করে যখন তারা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরছিল, তখন এই তরুণ যুবক ভীত ও সন্ত্রস্তগ্রামবাসীদের মধ্য থেকে বাছা বাছা জনকয়েক লোক সংগ্রহ করে বনের পথ দিয়ে চোমি গ্রামের দিকে রওনা হয়।

বনের মধ্যেই একস্থানে চোমি গ্রামের কয়েকজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং তাদেরই একজনের মাথার খুলি বর্তমানে বাঁশের খুঁটির ওপর উপুড়করা রয়েছে। জিমি গ্রামযে কারো কাছে মার খেয়ে চুপ করে থাকার পাত্র নয়, এথেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে।

জিমি গ্রামের দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখা শেষ করে আমরা তাঁবুতে ফিরলাম।

আমরা কাঠের বেড়ার সেই ফাঁক পার হবার পরক্ষণেইএকজন দীর্ঘাকৃতি অর্ধউলঙ্গ নাগাযোদ্ধা দা ও বর্শা হাতেসেখানে এসে প্রহরী-স্বরূপ দাঁড়াল। জিমি গ্রামের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমাদের তাঁবু থেকে তার দীর্ঘদেহ অস্পষ্ট অন্ধকারে আমরা বেশ দেখতে পেলাম—তাকে দেখাচ্ছিল যেন রোমান সৈনিকের মতো। মুণ্ড-শিকারিদের দেশে রাত্রিকালে এরূপ পাহারার খুবইপ্রয়োজন।

এর পরে একদিন আমরা সারামতী শৃঙ্গ আরোহণ করবারসংকল্প করলাম।

জিমি গ্রামের লোক পথ-প্রদর্শক জোগাড় করে দিল।জিমি গ্রামের কেউ কখনো কিন্তু সারামতী আরোহণ করেনি।আমাদের সুবিধে হল সাকালু বলে একজন সেমা জাতিরসর্দারকে পেয়ে—লোকটির বয়স যদিও ষাট—কিন্তু কীচেহারা আর স্বাস্থ্য তার ! দেখার জিনিস বটে।

এক সময় সীমান্ত প্রদেশের কোনো এক অভিযানে বৃদ্ধনাকি কুলিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল।কি একটা গোলমাল বাধেও মারামারি হয়। সে সময় এই বৃদ্ধ একা আটটি নরমুণ্ডশিকার করেছিল।

জিমি গ্রাম ছেড়ে আমরা উপত্যকার তলায় নেমে গেলামও ছোট ছোট চারাগাছের বন পার হয়ে ক্রমে চলে গেলাম গভীর জঙ্গলে।

তারপর আমরা উপর দিকে ক্রমশ উঠতে আরম্ভ করি। দেখতে দেখতে জিমি গ্রামের উচ্চতা ছাড়িয়েও উঠে গেলাম। আমি এক জায়গার গাছের ডালে কতকগুলি অর্কিড দেখতে যেমন উঁচু হয়ে চেয়েছি, অমনি প্রায় সংকীর্ণ পথের ধার

ছাড়িয়ে একেবারে শূন্যে—ফলে তখনই সশব্দে পড়েগড়িয়ে যেতে যেতে একটা ঝোপের গায়ে আটকে থেমে গেলাম। নইলে কি গতি হত তা বোঝা শক্ত নয়।

আমরা যে পাহাড়টা ধরে চললাম, আশা ছিল যে সেটাইশেষ পর্যন্ত সারামতী শৃঙ্গের শিখরদেশে আমাদের নিয়েগিয়ে ফেলবে। কিন্তু এত সহজে সারামতী ধরা দেবার নয়।

আট হাজার ফুট ওপরে দেখা গেল শিখরদেশ হতেআমরা এখনো কয়েক মাইল দূরে রয়েছি। আমরা সেপাহাড়টার উপরে খুব সহজেই উঠে গেলাম এবং অন্যদিকের ঢালুতে খানিকটা নামলাম ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখবার জন্যে।

দেখেশুনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হল, সারামতী আরোহণজিনিসটা যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। আরো অনেক কঠিনব্যাপার। তখন আমরা পাহাড়ের সাত হাজার ফুট সেই খাঁজটাতে তাঁবু স্থাপন করলাম ও সেই তাঁবুতে সেদিনের মতো ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দিলাম। পরদিনই আমাদের সারামতী আরোহণের শেষ দিন। যদি সেদিনের মধ্যে উঠতে পারি ভালোনয়তো বাধ্য হয়ে পরাজয় স্বীকার করে তাঁবুতে ফিরতে হবে।

পরদিন যথেষ্ট চেষ্টা করা গেল এবং কদিন পরিশ্রম ওঅধ্যবসায়ের ফলে আমরা শিখরদেশ থেকে তিন মাইলেরমধ্যে এসে গেলাম। পথ অতীব দুর্গম, বেঁটে বেঁটে ন্যাড়াগাছের তলার তুষারের স্তূপ কেটে যেতে হচ্ছিল, প্রকৃতপক্ষে বরফের স্তূপ কেটে পথ না করলে সে পথে অগ্রসর হওয়া চলে না। পাহাড়ের যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি, সেটা যেমন সংকীর্ণ, তেমনি তীক্ষ্ণাগ্র, যেন ক্ষুরের মতো।দুইদিকেই গভীর খাদ, দেখলে মাথা ঘুরে যায়, মনে হয় ওরবুঝি তলা নেই, তেমনি অতলস্পর্শ খাদ নাগাপর্বতে এরআগে দেখিনি।

হঠাৎ এই পথে এল ঘন কুয়াশা।

কিছু দেখা যায় না, নিজেদের হাত পা চোখে পড়ে না, কুয়াশা চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। শিখরদেশসম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশায়।

সে অবস্থায় সেই ভীষণ দুর্গম গিরিশৃঙ্গ বেয়ে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব—নিশ্চিত মৃত্যু, যদি এতটুকু পদস্খলন হয়।পরাজয় স্বীকার করে আমরা ফিরলাম। সারামতী আমাদের ধরা দিলে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, যেই তাঁবুতে এসে পৌঁছেছি অমনিকুয়াশার মেঘ অপসারিত হয়ে সারামতীর তুষারাবৃত ঝকঝকে শিখরদেশ আবার আমাদের ক্লান্ত চক্ষুর সম্মুখে পরিদৃশ্যমান হল।

কী মায়াই জানে সারামতী !

আমাদের সঙ্গী জনৈক নাগা কুলি পাহাড়ের ওপর থেকেকিছু তুষার সংগ্রহ করে এনেছিল থলের মধ্যে করে। বরফদেখে তার খুব আনন্দ, সে জমা বরফ দেখেনি।বন্ধুবান্ধবদের দেখাবার জন্যেই সে কিছু বরফ থলের মধ্যেপুরেছিল, নইলে তারা তার কথা বিশ্বাস করবে কেন ?কিন্তু নেমে তাঁবুতে এসে থলে খুলে সবিস্ময়ে দেখলে, থলের মধ্যে বরফ নেই। কোথায় গেল বরফ ?সে দেবতার নামেশপথ করে বলতে পারে, এই থলের মধ্যেই সে বরফপুরেছিল। বার বার সে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে উঠল—এইথলেই সে পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়েছিল। তার আরকোনো সন্দেহ নেই।

পরদিন আমরা ফিরে এসে ডেপুটি কমিশনারের কাছথেকে বিদায় গ্রহণ করে টিজু নদীর খাত বেয়ে ব্রহ্মদেশেরদিকে রওনা হলাম।

কিছুদূরে গিয়ে দেখি নদীখাত দিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক নয়, পার্বত্য নদীর জলধারা সমস্ত খাতটা জুড়ে বসেছে। তখন আমরা খাত থেকে ওপরে উঠে দু'তিন হাজার ফুট একটা গিরিপৃষ্ঠ বেয়ে চলতে লাগলাম। আমরা সাংটুমজাতির দেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তখন, এদের ভাষা আমরাবুঝি না। বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। সুতরাং একজন কুকিছোকরাকে দোভাষী ঠিক করে সঙ্গে নিলাম।

এ ঘোর অরণ্যপথে মানুষের বাস খুবই কম। মাঝে মাঝেদু-একটা গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, দশ-পনেরোটা কুটির নিয়েএই সব পার্বত্য গ্রাম। অবাসীরা বেজায় নোংরা, কিন্তু খুব সদয় ব্যবহার তাদের।

নাগাজাতির বাসস্থান শুধু যে আসামে তা নয়, নাগাপর্বত চলে গিয়েছে উত্তর ব্রহ্মদেশের ছিন্দউইন জেলাপর্যন্ত।

আসাম প্রদেশে হিমালয় পর্বতের যে অংশ অবস্থিত, তারখবর যে বেশি কেউ রাখে না, তার একটা প্রধান কারণ এই, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যথেষ্ট বারিপাতের ফলে এই পার্বত্যঅঞ্চল ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্যে আবৃত। তার ওপরে এই অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলের সর্বত্রই দুর্ধর্ষ নাগা, কুকি ও অন্যান্য অসভ্য জাতির বাস। মানুষের মুণ্ড সংগ্রহ এদের জীবনের একটি প্রধান আনন্দ।

এ অবস্থায় উত্তর-পূর্ব হিমালয় যে এখনো অনেকখানিঅজ্ঞাত, এ আর বেশি কথা কি।

কিন্তু হিমালয়কে অতিক্রম করে তিব্বতের দিকে যেতেহলে এই পথে যাওয়াই প্রশস্ত, কারণ উত্তর-পূর্ব হিমালয়েরশৃঙ্গগুলি সিকিমে সবচেয়ে উঁচু। এদিকে এসে তারা খর্বাকৃতি হয়ে মাত্র বিশ হাজার ফুটে দাঁড়িয়েছে।

[ক্যাপ্টেন কিংডন ওয়ার্ডের বিবরণ হইতে]

আগ্নেয়গিরির দেশ গোয়াতেমালা

পিউর্তো ব্যারিওস্ থেকে কিরিগুয়া শুধু ৬০ মাইলরেলপথের ব্যবধান। যদি কেউ পিউর্তো ব্যারিওস্ থেকে কিরিগুয়া যায়, সে এই ষাট মাইল তো যাবেই—বহু শতাব্দীপূর্বের প্রাচীন অতীতেও সে চলে যাবে। কারণ কিরিগুয়াহচ্ছে প্রাচীন যুগের ‘মায়া’ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

এরই আশেপাশে কত স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সেই গৌরবময় অতীতের। এখানকার ঘনজঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের প্রস্তরস্তম্ভ দেখতেদেখতে এমন কোনো মানুষ আছে যে এইসব প্রাচীনকালেরজাঁকজমক ও বর্বর প্রাচুর্যের মধ্যে কল্পনায় না চলে যায় ?অন্যূন কুড়ি শতাব্দী পূর্বের সেই মায়া-সভ্যতার অতীত ?

জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে জঙ্গলকেই ‘বর্বর’ বলে মনে হয়।

এমন ভীষণ ঘন জঙ্গল, অজগর সাপের মতো মোটাআঁকাবাঁকা লতা, এত আগাছা মোটা চকাট গাছের গুঁড়ি, দুর্ভেদ্য কাটা-ঝোপ, পরগাছার রঙিন ফুল, নানা রকমেরবন্যফুলের বাহার, বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতির ঝাঁক—দক্ষিণআমেরিকার এইসব অরণ্যানী ছাড়া কোথায় দেখতে পাওয়াযাবে ?

এই নির্জন ঘন অরণ্যের পটভূমিতে মোটা মোটাপ্রস্তরস্তম্ভ সর্বত্র দেখা যাবে। এই সব স্তম্ভের গায়ে প্রাচীনদিনের অজ্ঞাত ভাষায় কি সব অক্ষর, নানারকমের মুখগভীরভাবে খোদাই করা আছে।

কত শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করেও এই সব পাথরেখোদাই লেখা বা ছবি এখনো টিঁকে আছে—এইটেইআশ্চর্যের বিষয়।

আমি এখানে গোয়াতেমালার প্রাচীন ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বলিখতে বসিনি—আমি সেখানে বেড়িয়ে যা দেখেছি, আমারযেমন মনে হয়েছে, তারই একটা মোটামুটি ছবি দেওয়াইআমার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গল দেশের ন্যায় আবহাওয়া হিসেবে গোয়াতেমালাতিন ভাগে বিভক্ত। এদেশে শুধু অবস্থান-বিন্দুর অক্ষ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করে আবহাওয়া নির্ধারিত হয় না, উচ্চতাওএকটা বড় হিসেব এ বিষয়ের।

যেমন ধরা যাক, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রেরতীরবর্তী অঞ্চল ও পাদদেশের সমতলভূমি খুব গরম। একেবলা যেতে পারে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। তারপর উঁচু জায়গাগুলি প্রায়ই নাতিশীতোষ্ণ, সাধারণত এই অঞ্চলের উচ্চতা তিনহাজার থেকে ছয় হাজার ফুটের মধ্যে।

তারপর হচ্ছে শীতপ্রধান অঞ্চল, এদের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠথেকে চৌদ্দ হাজার ফুট বা তারও বেশি। উত্তর কানাডারঅনেক অঞ্চলের শীতের সঙ্গে এই অঞ্চলের শীত সমান।

পিউর্তো ব্যারিওস্ স্টিমার থেকে ভারি চমৎকার দেখতে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি নীল অ্যাজাটিক উপসাগরের ধারেএই ক্ষুদ্র শহরটি অবস্থিত। ভ্রমণকারীর চোখে এই সুদৃশ্যশহরটি স্বপ্নের মতো সুন্দর দেখায়, যে স্বপ্ন এই সব অঞ্চলছাড়া পৃথিবীতে বুঝি আর কোথাও দেখা সম্ভব নয়। শহরটিছোট যদিও, কিন্তু ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির অফিস ওগুদাম এবং রেল স্টেশন থাকাতে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্রএ অঞ্চলের। এ সব সত্ত্বেও আমি একথা বলতে বাধ্য যে—এখানে বেশি দিন বাস করা চলে না বা শহরের হোটেলগুলির এমন অবস্থা নয় যে, সেখানে বার বার ফিরেআসতে ইচ্ছে করে।

যতক্ষণ সময় এখানে ছিলাম, রাত্রে মশা ও অন্যান্যকীটপতঙ্গের উপদ্রবে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হয়েছিল। সেইজন্যেই বলছিলাম, পিউর্তো ব্যারিওস্ দূর থেকেইদেখতে ভালো। খুব নিকট থেকে দেখতে গেলে এরঅনেকখানি সৌন্দর্য চলে যায়।

আজকাল জাহাজ থেকে নেমেই গোয়াতেমালার সর্বত্র ট্রেনে যাওয়া যায়। ত্রিশ বছর আগে তা সম্ভব ছিল না, তখনদেশময় রেল ছড়িয়ে পড়েনি। জনৈক মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারের যত্ন ও চেষ্টায় এখানে এল র‍্যাকোর মরুভূমি ও সমুদ্রতীরপর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়।

গোয়াতেমালা কফি ও কদলীর দেশ।

যেদিকে চোখ যায়, ট্রেন থেকে দেখা যাবে শুধুকলা ওকফির বাগান। কলার বাগানই বেশি। কলার বাগান শুরুহয়েছে খুব বেশি দিন নয়। গোয়াতেমালার এইসব উপকূল-ভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। কলার বিস্তৃত চাষআরম্ভ করবার পূর্বে এই নীচু অঞ্চলের জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা করে একে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করতে হয়েছে।

পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এ দেশে এত বেশি ছিল যে, কোনো ইউরোপীয় এদেশে টিকতে পারত না। চল্লিশ বছরআগে কলাবাগান অঞ্চলে সাহস করে কেউ আসত না, বিষমপীতজ্বরের ভয়ে। তারপর গর্গাস বলে একজন ধনী এসে জঙ্গল কেটে জল নিকাশ করে কলার আবাদ শুরু করেনএবং বহু বৎসর ধরে পীতজ্বর তাড়াবার বিশেষ চেষ্টাকরেন। প্রধানত তাঁরই যত্নে ও চেষ্টায় পীতজ্বর এ দেশথেকে নির্বাসিত হয়েছে।

এখানকার রেলওয়ে, হাসপাতাল, শহর, পুলিশ সব একউদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে—যাতে প্রতি বৎসর বিশ লক্ষ কলারকাঁদি সমুদ্রপথে আমেরিকার বাজারে নীত হতে পারে। চাষও ব্যবসা একসঙ্গে কি করে করতে হয়, এ দেশের কলার চাষিদের দেখলে তা বোঝা যাবে। গবর্নমেন্টও যথেষ্টসাহায্য করে থাকেন, তার কারণ এ দেশের গবর্নমেন্টের প্রধান আয় এই কলার ব্যবসা থেকেই।

কলা পচনশীল ফল। গাছ থেকে পেড়ে কতদিন আরতাকে অবিকৃত ও তাজা রাখা যায় ?সুতরাং সময় এবংকদলীর এই স্বাভাবিক পচনশীলতার মধ্যে এরা যেন সংগ্রাম বাধিয়েছে। ছোট জাহাজ, বড় সমুদ্রগামী ভালো জাহাজ, রেলওয়ে ট্রেন, রেডিও টেলিফোন, এরা সবাই মিলে কলাবাগান থেকে কলার কাঁদি পচে যাওয়ার পূর্বে মার্কিনযুক্তরাজ্যের দোকানে দোকানে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যর্থ হয়ে রয়েছে।

কর্ডিলেরা পর্বতমালা থেকে মোটাগুয়া নদী বার হয়ে এক অতি উর্বর উপত্যকা বেয়ে উত্তর দিকের উপকূলে গিয়েসমুদ্রে পড়েছে। কর্ডিলেরা পর্বতমালা গোয়াতেমালাররাজধানী থেকে দুশো মাইল দূরে। এই মোটাগুয়া নদীরদুধারে প্রাচীন মায়া-সভ্যতার বহু চিহ্ন বর্তমান।

বিশ ত্রিশ ফুট উঁচু পাথরের স্তম্ভ এখানে বড় বড় তালগাছও ঘন জঙ্গলের ছায়ায় আত্মগোপন করে রয়েছে। অরণ্যেরমধ্যে আরো কত স্তম্ভ আছে, এখনোআবিস্কৃতহয়নি। যে প্রাচীনকালের লোকেরা এই স্তম্ভ তৈরি করেছিল তারা যথেষ্ট সভ্য ছিল এ বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু এখন যে ভাষা স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে, তার অর্থবোধ পর্যন্ত সম্ভব নয়।তাঁদের ভাষা, তাঁদের সভ্যতার ইতিহাস আজ পৃথিবী-পৃষ্ঠথেকে চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়েছে।

আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বলে মনে হয় একটাব্যাপার।

এই প্রাচীনকালের অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোকেরা বিশটন ওজনের একখানা পাথর কি করে এখানে এনেছিল ?এই স্থানের নিকটে কোথাও পাথর কাটবার জায়গা নেই, একবহুদূর উত্তরের পর্বতমালা ছাড়া।

আজ এ প্রশ্নের কে উত্তর দেবে ?

যাই হোক, কদলীক্ষেত্র ছেড়ে ইন্টারন্যাশনাল রেলওয়েরছোট ছোট গাড়িতে চেপে আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা হই।

কিরিগুয়া থেকে রেলপথ এঁকেবেঁকে চলেছে মোটাগুয়ানদীর উপত্যকা বেয়ে, একদিকে পাহাড়শ্রেণি, অন্যদিকে নদী। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট বড় গ্রাম। তালবনের ছায়ায়গ্রাম্য ইন্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো পার্বত্য ঝরনারজলে স্নান করছে কি কাপড় কাচছে।

জাকাপা ছেড়ে গোয়াতেমালা শহরে গাড়ি উঠতে শুরুকরে। অনেক দূর থেকে এই ওঠা আরম্ভ হয়। রেলপথ একটু একটু ওঠে, মাঝে মাঝে পাহাড়ের অর্ধপথে অশ্বখুরাকৃতিবাঁক, ছোট বড় টানেল, পুল কত কি ?অতি দুর্গম পথে রেল ওঠাতে হয়েছে।

রেল থেকে মাঝে মাঝে নীচের দিকে চাইলে চওড়ারুপালী ফিতের মতো মোটাগুয়া নদী নজরে পড়ে। আমরা এমন সব পার্বত্য পল্লীর ধার দিয়ে চলেছি, যেখানেপাহাড়ের পাশ কেটে তরকারি ও ফসলের ক্ষেত তৈরি করাহয়েছে।

আমরা আরো উঠছি, উঠছি। আশেপাশে এইবার বড়বড় গন্ধকের জলের ঝরনা—তাতে গরম জল ফুটছে ওগন্ধকের ধোঁয়া ও জলীয় বাষ্পে মেঘের সৃষ্টি করেছে। আগ্নেয় পর্বতের ছাইয়ের মধ্যে দিয়ে কেটে মাঝে মাঝে রেল নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে, বাতাস ক্রমশ খুব ঠাণ্ডা হয়েআসছে। সূর্যাস্তের সময়ে রক্তবর্ণ আকাশের পটভূমিতে গৈরিক রংয়ের বড় বড় পর্বতচূড়া দৃষ্ট হল—তার পরে এলরাত্রির অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে আরো ঠাণ্ডা, আরো নৈশ বায়ু।রাত হওয়ার কিছু পরে গোয়াতেমালা শহরের বিজলীর আলোর সারি চোখে পড়ে। পাহাড়ের মাথায় এক সুন্দরসমতলভূমিতে এই শহরটি অবস্থিত।

রেলপথ কিন্তু এখানে শেষ হল না। গোয়াতেমালাছাড়িয়েও পর্বতের ওপর দিয়ে রেলপথ চলে গিয়েছে। রকিপর্বত ও আন্দিজ পর্বত, দুটো বৃহৎ পর্বতমালাকে যোগ করেছে এই বিরাট রেলপথ। ছোট এঞ্জিনটা এই দুর্গম পথেআমাদের ১৯৪ মাইল এনেছে।

গোয়াতেমালা শহর আধুনিক যুগের শহর নয়—প্রাচীনস্পেনের গৌরবময় সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনের দিনের শহরএটি। গোয়াতেমালা শহর দেখলে বিজয়ী মুরদের কথা মনে হয়, তাদের স্থাপত্য, তাদের পাথর-বাঁধানো সংকীর্ণ রাস্তা, রংবেরংয়ের বাড়ির জালিকাটা জানালা, বারান্দা প্রভৃতিমনে আসে—কারণ গোয়াতেমালা শহরের বাড়িগুলি ওই ধরনে তৈরি।

প্রাচীনদিনের গোয়াতেমালা এখনো বর্তমান সভ্যযুগেপ্রবেশ করেনি।

গোয়াতেমালার রাজধানীর প্রতি ভূমিকম্পের কোপ চিরদিনই বেশি।

কতবার যে ভূমিকম্পে এই শহর ভেঙেছে, চুরেছে, নাচিয়েছে, কাঁপিয়েছে দুলিয়েছে, পুরানো আমলের কতভালো বাড়ি ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছে—তার ফলে তিনটি বিভিন্ন স্থানে তিন-তিনটি বিভিন্ন নামে এই শহরতৈরি হয়ে উঠেছে, আবার বিধ্বস্ত হয়েও গিয়েছে।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে পেদ্রো দ্য আলভারাদো আগুয়া পর্বতের ঢালুতে প্রথম শহর বসান। দিব্যি শহর গড়ে উঠল-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে অনেক বাড়িঘর তৈরিহল। লোকসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে—এমন সময়১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের এক রাত্রিতে মুষলধারে নামল বৃষ্টি।

আওয়াজ দিল নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি। তার অগ্নিকটাহএকদিকে ভেঙে গেল এবং বর্তমানে তাতে যে হ্রদ অবস্থিতসেই হ্রদের জলে শহর ভাসিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দিলে। প্রথমশ্রেণীর শহর এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, আগুয়া পর্বতের চূড়ায় উঠলে প্রশান্তমহাসমুদ্র ও আটলান্টিক মহাসমুদ্র উভয়ই দেখা যায়।

কিছুদিন পরে কয়েক মাইল উত্তর-পূর্বে আর একটা শহরগড়ে উঠল। কালক্রমে এই শহর দক্ষিণ আমেরিকায় একটিবিখ্যাত শহর হয়ে দাঁড়ায়। ধনে, জনে, সৌন্দর্যে অতুলনীয়এই শহরে প্রাচীন স্পেনের ধনী ঔপনিবেশিক অভিজাতসম্প্রদায় বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় ষাটটিরউপর বড় বড় গির্জাও তৈরি হয় তাঁদের অর্থে।

সবাই বেশ আছে। প্রাচীন রাজধানী ও তার প্রাকৃতিকবিপর্যয়ের কথা স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সকলেরই হাতেদু'পয়সা জমেছে। এমন সময় ১৭১৭ সালে কিছু দূরবর্তী ফিউয়ে সো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে এক ভীষণভূমিকম্প হল। সেই ভূমিকম্পেই শহর ফর্সা হয়ে গেল।

আবার গড়ে উঠল, কিন্তু ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পেআবার গেল।

তখন অনেক পরামর্শের পর ত্রিশ মাইল দূরে শহরস্থানান্তরিত করা হল। বর্তমানে এখানেই শহর বিদ্যমান।১৯১৭ সালে এ শহরের বহু বাড়ি ভূমিকম্পে ভেঙেগিয়েছে, অনেক বাড়ির দেওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি করেছে।তবে কোনো রকমে এই শহর এখনো টিকে আছে, এখনো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি, এই পর্যন্ত বলা যায়।

১৯১৭ সালের ভূমিকম্পের পরে গবর্নমেন্টের তরফথেকে বিস্তর অর্থব্যয়ে রাজধানীর বিভিন্ন অংশ পুনর্নির্মিতহয়েছে। বড় বড় বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরির ছায়ায় বাস করেমরতে হয় সে-ও স্বীকার, তবু মানুষের কী মায়া নিজেরজন্মভূমি ও গৃহের ওপর !

বর্তমান শহরের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। শহরটি রিও ভাকাস নামে পার্বত্যনদীর উপত্যকায় অবস্থিত—এরচারিদিকে শৈল-শিখর এবং বড় বড় আগ্নেয়গিরি।

পূর্বে শহরে যাজক সম্প্রদায়ের প্রবল আধিপত্য ছিল।এখন সে সব নেই—পূর্বে যাজক সম্প্রদায়ের অর্থে যে সববড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল এখন সেখানে ডাকঘর ওকাস্টম্‌স অফিস। কোনো কোনো ভজনালয়ে আধুনিকরঙ্গালয় ও সিনেমা অবস্থিত।

শহরের মধ্যস্থানে একটি পার্ক, এই পার্কের চারিধারে১৯১৭ সালের পূর্বে সুন্দর সুন্দর গির্জা ও প্রাসাদ ছিল।এখন সে সব ভেঙেচুরে যাওয়াতে পার্কের পূর্বশ্রী নষ্টহয়েছে।

গোয়াতেমালা শহরের রাস্তাঘাট ভালো নয়—শীর্ণকায়অশ্বদ্বারা বাহিত যান এখনো এ শহরে যাতায়াতের একমাত্রউপায়—যদিও ধনী নাগরিকগণের মোটরগাড়ির অভাবনেই। শহরে ভালো হোটেল, ক্লাব এবং সিনেমা আছে।

শহরের পথে দেশের আদিম অধিবাসী ইন্ডিয়ানরা দলেদলে চলেছে। এ দেশে ওরা কুলি, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, অশ্বতর-চালক, ভিস্তি ও ভৃত্যের কাজ করে।

দশ মাইল দূরে মিস্ককো বলে ছোট একটা ইন্ডিয়ান পল্লীগ্রাম। শহরের অধিকাংশ ফল, শাকসব্জি ও দুগ্ধবিক্রেতা ইন্ডিয়ান আসে এই গ্রাম থেকে। যদি কেউ ইন্ডিয়ানদের জীবনযাপন প্রণালী জানতে ইচ্ছা করে, আমি তাঁকে উপদেশ দিই যে, কোনোনির্মেঘ প্রাতঃকালে সে যেন মিস্ককো গ্রামথেকে যে রাস্তা এসেছে শহর পর্যন্ত, তারই ধারে বসেথাকে।

সে যে বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখবে, সমগ্র আমেরিকারমধ্যে আর কোথাও তা সে দেখতে পাবে না।

ভোর হয়েছে। মিস্ককো গ্রাম থেকে দলে দলে ইন্ডিয়ানমেয়েপুরুষ বেরিয়ে চলেছে শহরে, সবাই হেঁটেই চলেছে, রোজ তারা দশ মাইল যাবে, আবার হেঁটে দশ মাইলফিরবে। যার যা জিনিস, খুব বড় একটা ঝুড়িতে মাথায়বসানো বা পিঠে ঝোলানো আছে। রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গেএকটি একটানা দীর্ঘ শোভাযাত্রা শহরের দিকে চলেছে এদৃশ্য প্রত্যহ দেখা যাবে।

গোয়াতেমালার বাজারে ইন্ডিয়ানদের হাতে তৈরি নানা প্রকারের জিনিসপত্র বিক্রি হয়। মেয়েদের জামা, ঘোড়ার সাজ, কোমরবন্ধ, টুপি, ছোরা, পুঁতির মালা, জুতা ইত্যাদি। আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীর কল্যাণে গরিব ইন্ডিয়ানরাদু'পয়সা রোজগার করে থাকে।

একদিন আমি গোয়াতেমালা শহর থেকে বার হয়ে নিম্নসমতলভূমি অঞ্চলে যাত্রা করলাম। ট্রেনে যেতে যেতেআসাটিট্‌লান হ্রদ পার হয়ে পালিন বলে একটা স্টেশনেগাড়ি দাঁড়াল। এখান থেকে অনেক দূরের সমতলভূমি প্রায়৪০ মাইল পর্যন্ত একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। পালিনস্টেশন পার হয়ে ক্ষুদ্র ট্রেনখানি এঁকেবেঁকে ক্রমশ নামতেথাকে—পাহাড়ের পাশ কেটে রেলপথ ক্রমশ নেমে এসেছেপ্রায় আড়াই হাজার ফুট ষোলো মাইলের মধ্যে। ওপরে যেমনঠাণ্ডা, যতই নীচে নামি ততই গরম। এস্‌কুঠটলা থেকেআমরা প্রায় সমতলভূমিতে এসে পৌঁছালাম—রেল লাইনেরধারে কফি ও আখের ক্ষেত, বড় বড় মারাগুয়া ঘাসের ক্ষেত। এখান থেকে একটা রেলপথ গেল প্রশান্তমহাসাগরের সাম্‌ জোসে বন্দরে। অপরটি গেল মিস্ককোরদিকে। যেখান থেকে দুদিকে রেলপথ বেরিয়ে গেল, সেইস্টেশনের নাম সান্টা মেরিয়া। খুব বড় জংশন স্টেশন।

এখানকার ইন্ডিয়ান মেয়েরা ট্রেনের টাইম-টেবল অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। দিনে চারবার করে ওরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আসবে জিনিস বিক্রি করতে-ঘড়ির কাঁটার চেয়েও তারা সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন।

গোয়াতেমালা থেকে যে ট্রেন সকালে ছাড়ে, তা এখানে আসে প্রায় দুপুরবেলা, সুতরাং আরোহীদের ক্ষুধা পাওয়াখুবই স্বাভাবিক। ইন্ডিয়ান মেয়েরা নানারকম খাবার জিনিস বিক্রি করছে দেখে কেনবার ইচ্ছে হল।

প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় একটি তরুণী বসে শাকসব্জিও ফলমূল বিক্রি করছে। সে একটা গোটা আর্মাডিলো-ভাজাউঁচু করে হাতে তুলে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আরএকজন তুলে ধরেছে একটা ভাজা গোসাপ—যতইক্ষুৎপীড়িত হই, খাদ্যদ্রব্যের নমুনা দর্শন করে খাবার ইচ্ছেচলে গেল।

রেলপথের দুধারে কফির ক্ষেত।

প্রতি বৎসর গোয়াতেমালা ন কোটি পাউন্ড কফি পৃথিবীরবাজারে বিক্রয়ার্থে পাঠায়। পর্বতসানুর সর্বত্র বিস্তৃত কফির চাষ।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কফির ফুল ফোটা দেখতে পেয়েছিলাম। কারণ কফি ফুল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেফোটে, তারপরেই ঝরে পড়ে।

কফি ক্ষেতের অঞ্চল শেষ করে, আমরা এবার যেখানেএসে পড়েছি, এখানে কোকো বাগান পাহাড়ের নীচেসমতলভূমিতে।

সান আন্টোনিও বলে একটা গ্রামে একজন বড় কৃষকেরবাড়ি আমি অতিথি হব বলে আগে থেকেই ঠিক ছিল। স্টেশনে তিনি আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। স্টেশন থেকে স্থানটি প্রায় দশ মাইল হবে। এই দশ মাইলপথ অতি সুদৃশ্য উঁচুনীচু সবুজ তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে যেতেযেতে ক্রমশ উঁচু হতে হতে দূরের পাঁচটি বিরাটকায় আগ্নেয় পর্বতে গিয়ে যেন শেষ হয়েছে মনে হয়।

সে রাত্রে গুরুতর নৈশভোজনের পরে আমি জীবনে প্রথম মারিম্বা বাজনা শুনলাম। মারিম্বা গোয়াতেমালারজাতীয় বাদ্য। শুকনো লাউয়ের খোলের ওপর কাঠ ও সরুপেতলের পাত দিয়ে তৈরি করে জলতরঙ্গের মতো কাঠিদিয়ে বাজাতে হয়।

চাঁদ উঠেছিল। বড় বড় তালগাছের ছায়া বাঁকাভাবে পড়েছে তৃণভূমির ওপর। উৎসববেশে সজ্জিত বহু ইন্ডিয়ানমজুর বাজনা শুনতে এসে তালগাছের তলায় জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মারিম্বা বাদ্যের অদ্ভুত ধ্বনির সঙ্গে সেইচাঁদ ওঠা রাত্রের স্মৃতি আমার মনে অনেক দিন জেগেথাকবে।

এখান থেকে আরো ৩৫ মাইল দূরবর্তী একটা জায়গায়পৌঁছে আমার রেলপথে গুয়াতেমালা ভ্রমণ শেষ হল।

রেলের ধারে দু'একটা গ্রাম দেখা গেল। সেখানেপুরুষেরা শুধু একটা সুতির প্যান্ট এবং মেয়েরা খাটো গাউনপরে থাকে। বহু অশ্বতর ও ইন্ডিয়ান কুলি জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাদের পথ যেখানে শেষ হল—তার কিছু দূরে সান্টামারিয়া আগ্নেয়গিরি কুয়াশার মধ্য দিয়ে একটু একটু দেখাযাচ্ছিল। ১৯০২ সালের অগ্ন্যুৎপাতে এর চূড়ার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। এখনো সেই অবস্থায় আছে বিরাট সান্টা মারিয়া আগ্নেয়গিরি—১৯০২ সালের পরে আর কোনো বড় রকমের বিপর্যয় ঘটেনি।

নৌকায় ইউরোপের নদীপথে

১৯৩২ সাল। জানুয়ারি মাস।

আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, ইউরোপের নদী ওখালপথে নৌকাযোগে বেড়াতে বার হব। আমার উপযুক্ত নৌকাও ছিল। নৌকাটির জন্মস্থান হল্যান্ড, নাম 'হক', চারজন লোক নৌকাখানায় আরামে শুতে পারে, এ বাদেরান্নাঘর, স্নানের ঘর এবং একটা ভাঁড়ার ঘরও ছিল।

এক হাজার বর্গফুট পাল ছাড়া একটা মোটরও ছিল, যারশক্তিতে 'হক' চলবে। আমার সঙ্গে নাবিক ও খালাসীহিসেবে ছিলেন কেবল আমার স্ত্রী, কাপ্তেন আমি স্বয়ং।আগস্ট মাসে ফ্রান্স দেশের মধ্যে দিয়ে ঘুরে রাইন নদীতে পড়বার উদ্দেশ্যে সাউদামটন থেকে রওনা হই।

আমরা ১৮ ঘণ্টা ধরে ইংলিশ প্রণালী পার হয়ে হ্যাভরবন্দরে পৌঁছে গেলাম। হ্যাভর ফ্রান্সের খুব বড় বন্দর এবংসমুদ্রের ধারে—লিভারপুল বা ফিলাডেলফিয়ার মতো নদীরধারে নয়। বন্দরে ঢুকবার কিছু পরে আমরা বুঝে নিলাম, বজরাওয়ালারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বন্দরে আমাদেরদেখেই ওরা আমাদের ওদেরই একজন বলে ধরে নিল এবংসর্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হল।

রুয়ে পর্যন্ত সমুদ্র থাকার দরুন হ্যাভর বন্দরে আমাদের আইনের কড়াকড়ি সহ্য করতে হল না। এখানে নানাজাতীয়ছোট বড় জাহাজের সমাবেশ। বড় বড় আটলান্টিকগামী জাহাজ থেকে ছোট মাছধরা নৌকা পর্যন্ত এই বন্দরেভেড়ে।

একদিন সকালে আমরা বন্দর ছেড়ে রওনা হলাম। পথেপড়ল হিভ্ অন্তরীপ ও ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা বড় বাতি-ঘর। কত রকমের জাহাজ যে দেখলাম এই পথে। সুইডিশ কাঠ বোঝাই জাহাজ, আমেরিকান তৈল বোঝাই জাহাজ, নানা দেশের মালবাহী জাহাজ—কত রকমের পতাকা বিভিন্নজাহাজে।

আর একটি ক্ষুদ্র বন্দর পড়ল পথে, হারফ্লিউর—একসময়ে এইটি ছিল নর্মান্ডির বড় বন্দর।ইংল্যান্ড তখন অর্ধেকফ্রান্স শাসন করত। রাজা পঞ্চম হেনরীর তৈরি একটা বড়টাওয়ার এখানে এখনো আছে, নাম সেন্ট মার্টনস্ টাওয়ার।

এবার সমুদ্রপথ ছেড়ে দিলাম। মাঠের মধ্যে দিয়েট্যাঙ্কারভিল খাল এসে পড়েছে সমুদ্রে। এই খালের মধ্যে ঢুকে আমরা কিবিউ বলে একটা ছোট শহরের কাছে সিন নদীতে পড়লাম।

সিন নদীতে তখন জোয়ার লেগেছে, হু-হু করে চললআমাদের ক্ষুদ্র নৌকা। রাতে একটা গ্রামের ধারে নঙ্গর ফেলেরইলাম এবং পরদিন প্রাতঃকালে কদোবে-এঁসো বলে একটা স্থানে পৌঁছে গেলাম। এরই নিকটে সেন্ট ফিলিবার্টের তৈরিএকটা পুরাতন আমলের মঠ আছে, এ অঞ্চলে সপ্তমশতাব্দীতে স্থাপিত এই প্রাচীন মঠ একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু।

‘হক’কে নঙ্গর ফেলে আটকে রেখে আমরা পদব্রজেমঠদেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে জোয়ারেরতোড়ে আমাদের তিন ইঞ্চি মোটা কাছি ছিঁড়ে নৌকা গিয়েপড়েছে মাঝ-দরিয়ায়। একটা নঙ্গর ভাগ্যক্রমে আপনা থেকেগড়িয়ে জলে পড়াতে নৌকাখানা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষাপেয়েছে।

পরদিন আমরা রুঁয়ে পৌঁছে গেলাম। রুঁয়ে শহর নর্মান্ডিরপ্রাচীন রাজধানী, যদিও বর্তমানে তার প্রাচীন গৌরব বিশেষকিছু নেই। কিন্তু রুঁয়ে বন্দর ফ্রান্সের মধ্যে বড় বন্দর। আমরাদেখলাম, আমাদের মতো ক্ষুদ্র নৌকার স্থান নেই বন্দরে।দুদিন রয়ে আমরা শান্তিতে নঙ্গর ফেলে থাকবার ঠাঁই পেলাম না; এখান থেকে ওখানে নোঙ্গর ফেলি, আবারসেখানে তাড়া খেয়ে অন্যত্র যাই—এ অবস্থার রুঁয়ে শহরের প্রাচীন স্থাপত্যগৌরবের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তা দেখবার সময় পেলাম না। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই শহর এক অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। এখানে কর্নেইজন্মগ্রহণ করেন; মিসিসিপি নদীভ্রমণকারী লা সাল জন্মগ্রহণকরেন, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্লাবেয়ার জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু রুঁয়ে শহরের নাম যেজন্য জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তার কারণ, সেন্ট জোয়ান অফ আর্ক এখানে তার পার্থিব লীলা শেষ করেন।

কিন্তু কাস্টম্‌স-বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ককরব, না ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করব ?আমাদের পক্ষে এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠতেলাগল। প্যারিসের দিকে যাত্রা শুরু করে যেন হাঁফ ছেড়েবাঁচলাম অবশেষে।

সিন নদীতে নৌকাযোগে ভ্রমণ খুব শান্তিপূর্ণনয়—অনবরত নানা শ্রেণীর নৌকার বজরা, মাল-বোঝাইপোত চতুর্দিকে যাতায়াত করছে। আমাদের মতো ক্ষুদ্রনৌকার পক্ষে এ পথে যাতায়াত করা রীতিমতো বিপজ্জনক।নর্মান্ডি প্রদেশের বেশির ভাগ অন্তবাণিজ্য সিন্ নদীপথেচলে। মাঝে মাঝে আমরা নদী ছেড়ে দিয়ে আশেপাশের খালে ঢুকে পড়েছিলাম।

এইসব খাল শ্যামল পল্লীপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকেঅনেক দূর চলে গিয়েছে। এখানে অত নৌকার ভিড় নেই।নিভৃত পল্লীপথের মতো শান্ত এই খালগুলি।

খালের ধারে কোথাও বড় বড় প্রাচীন আমলের প্রসিদ্ধগ্রাম্য ভজনালয়, মঠ–এলবিউ পার হয়ে, লেজাদলি পার হয়ে আমরা গেলাম বিশালকায় উন্নতশীর্ষ স্যাতো গেইলার দেখতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রিচার্ড দি লাইন-হার্ট এই সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এখনো তার গৌরব বিশেষ ক্ষুন্নহয়নি।

আমরা ভার্নন ছাড়লাম—সাঁত জারমেন পৌঁছেনেপোলিয়নের সময়কার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মাইলসাইজোপ্রাসাদ পরিদর্শন করলাম।

এফেল টাওয়ার যদিও দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, প্যারিসশহর এখনো অনেক দূরে।

প্যারিসের যত নিকটবর্তী হচ্ছি, নদীর দুধারের দৃশ্য অতিঅবসাদজনক। শুধুই কারখানা, ধোঁয়াভরা আকাশ, বড় বড় ধূসর রংয়ের গরিব ভাড়াটিয়া থাকবার উদ্দেশ্যে তৈরি লম্বা ধরনের বাড়ি, তার বাইরে কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই।

হঠাৎ আমরা বিখ্যাত বোয়া দ্য বুলোর সুরম্য সৌন্দর্যের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছি দেখলাম। এখান থেকেই প্যারিস শহরশুরু হল।

কোনো হোটেলে আমরা উঠিনি, উঠব না ঠিক করেইরেখেছিলাম। লুভর মিউজিয়ামের ছায়ায় নদীতে নঙ্গরফেলে তিনটি সপ্তাহ বড়ই আনন্দে যাপন করলাম।

আমি আমার স্ত্রীকে বল্লাম—এই দেখো, ইউরোপদেখবার আসল প্রণালীটা হচ্ছে ঠিক এই। আমার স্ত্রীওআমার কথায় সায় দিলেন।

শীঘ্রই কিন্তু বিপদের মুখে পড়তে হল।

আমরা যাত্রা করবার মতলব করছি, এমন সময় বন্যানামল সিন্ নদীতে—স্রোত এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, উজান দিকে সে স্রোত ঠেলে যাওয়া অন্তত এক সপ্তাহেরমধ্যে অসম্ভব।

কয়েকদিন পরে রওনা হয়ে সামান্য কিছুদূর গেলাম।বিখ্যাত নোতরদাম গির্জার নীচে আমাদের ছোট নৌকাখানা দুধারের উঁচু তীরের মধ্যে স্রোতে পড়ে ডুবে যাবার মতোহয়েছিল—একখানা পুলিশ বোট অবশেষে আমাদের উদ্ধারকরল। আমরা যেচে এই বিপদ বরণ করে তাদের হাঙ্গামায়ফেলেছি বলে বোটের পুলিশদের কি রাগ।

প্যারিস ছেড়ে কয়েক মাইল গিয়েই আমরা সিন্ নদীছেড়ে দিয়ে মার্নে নদী ধরলাম।

এ নদীতেও বন্যার তোড় খুব। স্যাতো থিয়েরি পর্যন্তআমাদের দুর্দশা সমানভাবেই রইল। এখানে গত মহাযুদ্ধে মৃত আমেরিকান সৈন্যদের উদ্দেশে একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ১৯৩০ সালে ইউনাইটেড স্টেটস গবর্নমেন্টের ব্যয়ে এই সুবৃহৎ প্রাসাদোপম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়, সামনের দিকে দুটি মূর্তি, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে সৈনিকের বেশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আরো কিছুদূরে গিয়ে আমরা মার্নেরাইন খালের মধ্যে ঢুকে পড়লাম, এই ২৪০ মাইল লম্বাসুদীর্ঘ খাল আমাদের যারা ফ্রান্সদেশের বুকের উপর দিয়ে ভস্‌গেস্ পর্বতে উঠিয়ে ওপারে রাইন নদীতে ছেড়ে দেবে।

যেখান থেকে মার্নে রাইন খালের শুরু, সেই ক্ষুদ্র প্রদেশটিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত স্যাম্পেন মদ প্রস্তুত হয়।এলার্নে নামক স্থানে একটা বড় স্যাম্পেনের কারখানা দেখতে গেলাম। মাটির তলায় বড় বড় ঘরে মদের পিপেসঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

বড় বড় শহরের রাস্তায় যেমন ট্রাফিকের ভিড়েগাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্যে, এইসব বাণিজ্যবহুল কর্মব্যস্ত অঞ্চলে মার্নে রাইন খালের মতোসংকীর্ণ খালের সেই দশা ঘটে।

শালোঁজ পৌঁছে দেখি, খাল নৌকোর ভিড়ে একদম বন্ধ, এখানটা একটা জংশন স্টেশনের মতো, একটা শাখা এখানথেকে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের দিকে গেল।

শালোঁজ পার হয়ে পল্লীপ্রান্তের দৃশ্য ক্রমে ভালো হতেলাগল। বা-লে-দুক ছাড়িয়ে দুই তীরে শান্ত পল্লীগ্রাম। বেশ ভিড়, গোলমাল নেই। এই হল বিখ্যাত ডমরেমি, জোয়ানঅফ আর্কের জন্মস্থান। যে গৃহে জোয়ানের জন্ম হয়েছিল, সে গৃহটা এখনো আছে। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রীরা দেখতে আসে। ক্যাথলিকদের তো একটি পুণ্য তীর্থস্থান। ডমরেমি ছাড়িয়ে লিভারপুল।

খাল এখানে শহরের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে। একটাটানেল দিয়ে সে অংশে প্রবেশ করতে হয়। ঘোর অন্ধকারটানেলের মধ্যে আমরা ঢুকে কোনোরকমে বেয়ে চলেছি, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা দ্রুতগামী মোটরপোতেরআলো দৃশ্যমান হল।

মোটর-পোতখানা একটা ভারী বজরা অর্থাৎ মালবাহীগাধাবোটের মতো নৌকা। সেই অন্ধকারের মধ্যে ফরাসীভাষায় ওই ভারী বজরার মাঝিমাল্লাদের বুঝিয়ে বলা যে, আমাদের ছোট নৌকা বাঁচিয়ে সাবধান হয়ে চল—সে এক ব্যাপার আর কি।

প্রতিমুহূর্তে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে, গাধাবোটের ধাক্কা খেয়ে আমাদের বেচারী 'হক' এই বুঝি মোচার খোলেরমতো ডুবে গেল।

তারা আমাদের বুঝিয়ে দিলে, তোমাদের নৌকা হটিয়েনিয়ে টানেলের বাইরে নোঙ্গর করো, আমরা চলে যাই, তখন তোমরা ঢুকো।

তাদের কথা শুনতে গিয়ে (না শুনেও উপায় ছিল না) আরো বিপদ। 'হক'-এর মাস্তুল টানেলের ছাদে আটকে গেল, মোটর গেল খারাপ হয়ে, পিছুদিকে হটতে চায়না—কি দুর্ভোগ যে বাঁধালো সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে।বহু কষ্টে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল।

যখন আমরা ন্যান্সি পৌঁছেছি, তখন খালের জলে বরফ জমতে আরম্ভ করেছে। আমরা প্রাণপণে আমাদের নৌকাখানা আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, খালের সমস্ত জল জমে যাওয়ার পূর্বেই।

সুতরাং ন্যান্সি শহরে আমরা বেশিক্ষণ কি করে থাকি, ন্যান্সি শহরের প্রাচীন ডিউকের প্রাসাদ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত গির্জা ইত্যাদি দেখবার সময় আদৌ পাওয়া গেল না।

শীত ক্রমেই বাড়তে লাগল।

বরফ না ভেঙে আর যেন অগ্রসর হওয়া যায় না।

হঠাৎ একরাত্রে এমনি শীত পড়লো যে, খালের জল জমে বরফ হয়ে গেল এবং আমরা এক নির্জন স্থানে আটকেপড়ে গেলাম।

এমন জায়গায় আমাদের নৌকা আটকে গেল যে, আপাতত খাদ্যদ্রব্যের জোগাড় করাই মুশকিল। নিকটবর্তী শহর বারো মাইল দূরে। এ অবস্থায় আমরা নিজেরাইনিজেদের রুটি গড়তে ও সেঁকতে বাধ্য হলাম। কিছু দূরেএক কৃষকের বাড়ি ছিল। তার কাছ থেকে দরদস্তুর করে তারক্ষেত-খামারে যা কিছু পাওয়া যায়—ডিম মুরগি দুধ শাকসব্জি ইত্যাদি কিনে নিতাম।

দেড় মাস কেটে গেল। দেড় মাসের মধ্যে আমাদেরএকমাত্র আমোদ ছিল, সেই কঠিন বরফের ওপর স্কেটিংকরে বেড়ানো।

দেড় মাস পরে একদিন ঘোড়ায় টানা বরফ ভাঙবার কল এসে খালের বরফ ভেঙে দিতে দিতে চলে গেল। আমরামুক্তি পেয়ে নৌকা ছেড়ে দিলাম।

আমরা অনেক ওপর দিয়ে চলেছি, খাল ভসগেসপর্বতের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকেরাইন নদীর সমতলে নামতে খননকারী ইঞ্জিনিয়ারকে বহু কৌশল করতে হয়েছে।

অনেক জায়গায় দুখানা নৌকা বা বজরা পাশাপাশি যেতে পারে না। কাজেই ভসগেস পর্বতের অপর পারে নামতেবিশেষ দেরি হয়ে গেল।

অবশেষে আমরা স্ট্রাসবুর্গে পৌঁছে গেলাম। আমরা এক নির্জন প্রান্তরে খালের মধ্যে আটকে পড়ে দেড় মাস কষ্ট পেয়েছি, তার ওপর ভসগেস পর্বতের উপর নৌকা ওঠাতে ও এ-পারে নামাতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, সুতরাং স্ট্রাসবুর্গেপৌঁছে আমরা তিন সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম করলাম।

স্ট্রাসবুর্গের বিখ্যাত গথিক প্রণালীতে নির্মিত ভজনাগারপ্রতিদিন দেখেও যেন আমাদের সাধ মিটত না। মধ্যযুগেনির্মিত এই ক্যাথিড্রালের শোভা অবর্ণনীয়। স্ট্রাসবুর্গ ছেড়েযাওয়ার প্রাক্কালে বহু অভিজ্ঞ বৃদ্ধ নাবিকের মুখ থেকেউপদেশ পেলাম, সঙ্গে একজন পাইলট নিতে।

নদীর উজানে বিস্তর বালির চড়া ও ভাসমান সেতুআছে, সঙ্গে অভিজ্ঞ লোক না থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আমরা পাইলট নিতে রাজী হইনি, কারণ পাইলটনিযুক্ত করবার মতো অর্থ আমাদের সঙ্গে ছিল না।

উত্তরদিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে নৌকারভিড় বড় বাড়ল; এ যেন আবার সিন্ নদী দিয়ে যাচ্ছি।ফরাসী, জার্মানী, বেলজিয়াম, ডাচ সব রকমের বজরা ওনৌকা।

এর মধ্যে পেছনে চাকাওয়ালা ছোট স্টিমারও আছে। একরাশ গাধাবোট টেনে নিয়ে চলেছে। এ গাধাবোটেরসারি কখনো কখনো এক মাইল লম্বা। পুরো পালতোলাঅবস্থায় সংকীর্ণ নদীর বাঁকে এই রকম গাধাবোটের সারিরসঙ্গে দেখা হওয়ার দুর্দৈব আর কি আছে।

স্ট্রাসবুর্গ থেকে এই নদীপথ দুধারের পাহাড়শ্রেণির উপরঅবস্থিত দুর্গ থেকে রক্ষিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগে তৈরিহয়েছিল এই সব দুর্গ রাইন নদীপথকে সুরক্ষিত করবারজন্যে, যদিও বিংশ শতাব্দীতে এদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েএসেছে।

জার্মানীর সীমান্তে অবস্থিত ম্যাক্সতে পৌঁছে গেলাম।স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত এক প্রকাণ্ড পতাকা উড়িয়ে কাস্টম্‌স বিভাগের বোট এসে আমাদের পাশে ভিড়লো, তবে তারা এত অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সেরে নিলে যে, আমাদের নৌকার বেগ কমাবার পর্যন্ত দরকার হল না।

ম্যাক্স থেকে স্পেয়ার পর্যন্ত এসে আমরা রাইন নদীর পথ কয়েকদিনের জন্য ছেড়ে দিয়ে নেকার নদী বেয়েহয়ডেলবার্গ গেলাম। এই অঞ্চলে কেবল বড় বড় মধ্যযুগের প্রাসাদ, দুর্গ, গির্জা, মঠ প্রভৃতির বিচিত্র সমাবেশ। যাঁরাই রাইন নদীতে নৌকা করে বেড়াবেন, তাঁরা যেন স্পেয়ারথেকে নেকার নদীপথে হয়ডেলবার্গ পর্যন্ত নিশ্চয়ই যান, নতুবা তাঁদের রাইনল্যান্ড ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আবার ফিরে এলাম রাইন নদীতে।

ওয়ার্মস্ পৌঁছে দু-একদিন বিশ্রাম করলাম।

ওয়ার্মস্ বিখ্যাত হয়ে আছে ইতিহাসে। মার্টিন লুথারেরজন্য। এখানে বসে তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বিধিনিয়ম তুচ্ছ করেছিলেন। লুথারের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভওয়ার্মসের রাজপথে বিদ্যমান।

ওয়ার্মস ছাড়িয়েই রাইন নদীর উভয় তীরের দৃশ্যপরিবর্তিত হল।

এইবার আমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃশ্যে ঢুকেছি। দুই তীরেখাড়া উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে দ্রাক্ষাক্ষেত্র; মাঝে মাঝে মধ্যযুগের প্রাসাদদুর্গ।

রাইন নদীর এই অঞ্চল ঠিক যেন ছবির মতো।

আমরা বিখ্যাত ওপেনহাইম প্রাসাদের নীচে একদিন সারারাত্রি কাটালাম। কিন্তু মোটের ওপর বলা যেতে পারে যে, রাইন নদীতে নৌকা বেয়ে প্রমোদভ্রমণে বিশেষ সুখনেই, এত ভিড়ে ওতে কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না। দ্রাক্ষারস বোঝাই গাধাবোটের হয়তো কোনো অসুবিধানেই, কিন্তু একটু অসতর্ক হলেই একটা ভারী গাধাবোটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নৌকা চুরমার হয়ে যাবে যেখানে, সেখানে আমরা নৌকা সামলাই, না প্রকৃতিরসৌন্দর্য দেখি।

এইবার মেন্ নদী বেয়ে আমরা লুডভিগ খালে উঠতে আরম্ভ করলাম। এখানে আমরা যথেষ্ট অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম নগরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। দলে দলে লোকআমাদের নৌকা দেখতে এল।

রাত্রে আমরা ফ্রাঙ্কফুর্টের গলিঘুঁজির মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতাম, আমাদের মনে হত এই শহরের প্রত্যেক অর্ধঅন্ধকার গলিঘুঁজি ভূত, ডাইনি, সম্রাট ও সৈন্যের ভিড়েভর্তি। কল্পলোকের ফ্রাঙ্কফুর্টের সঙ্গে বাস্তব জগতেরফ্রাঙ্কফুর্টের অনেকখানি তফাত। ওফেনব্যাক শহরে এসেও আমরা দুদিন বিশ্রাম করি। এই শহর বিখ্যাত হয়ে আছেএইজন্যে যে, এখানে গ্যেটে তাঁর প্রণয়িনী লিলির দেখাপেয়েছিলেন।

ওফেনব্যাক ছাড়িয়ে কিছু অগ্রসর হয়েই ভেটিনজেনের রণক্ষেত্র, যেখানে ইংরেজ রাজা দ্বিতীয় জর্জ স্বয়ং ইংরেজসৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

ভেটিনজেন ছাড়িয়ে আমরা একদিন বড় বিপদেপড়লাম।

রাত্রে এক জায়গায় মাঠের ধারে নোঙ্গর করে ঘুমিয়েছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আমাদেরনৌকা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নদীতে বন্যার জল কখন যে সরে গিয়েছে—খামখেয়ালী পার্বত্য নদীর কথা আমরা কি করে জানব ?

লোকজন ডেকে সে যাত্রা নৌকা ঠেলাঠেলি করে ফসলের ক্ষেত থেকে নদীগর্ভে নামানো হল।

আমরা সেদিন অপরাহ্ণে ব্যাভেরিয়া প্রথম লুডভিগেরপ্রাসাদদুর্গের ছায়ায় গভীর জলে নোঙ্গর করলাম। প্রথমলুডভিগ শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁর এই প্রাসাদকে একটি মিউজিয়াম করে রেখে গিয়েছেন। রাজকীয় শয়নাগারেরবাতায়নপথে দেখা যাচ্ছিল তাঁর তৈরি প্রাচীন পম্পাইনগরের ক্যাস্টর ও পোলাক্সের মন্দিরের আদর্শে প্রস্তুত ছোটএকটি মন্দির।

এইবার নদী ক্রমশ অতীব খরস্রোতা হয়ে উঠল।লুডভিগের দুর্গ ছাড়িয়ে কিছু দূর যেতে না যেতে আমরা বুঝলাম, এ স্রোতে গবর্নমেন্ট বোটের সাহায্য ভিন্ন অগ্রসরহওয়া বিপজ্জনক। এখানে নদীর স্রোতের প্রখরতার জন্য গবর্নমেন্ট থেকে ব্যবস্থা আছে। একটা পুরানো বড় বজরাশ্রেণীর নৌকার পেছনে খুব মোটা ও লম্বা শেকল বিপন্ন নৌকাকে সেই শিকলে বেঁধে ব্যামবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াইএই চেন-বোটের কাজ।

লুডভিগের প্রাসাদের নিকট থেকে ব্যামবার্গ কম দূর নয়।এখানে নদীর দৃশ্যও বড় সুন্দর। আমাদের কিছু করবার ছিলনা। গবর্নমেন্ট চেন-বোটে আমাদের ‘হক’ টেনে নিয়েযাচ্ছে, সুতরাং আমরা ডেকের উপর আরামে রৌদ্রে শুয়েউভয় তীরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এইবার সত্যিইরাইন নদীর সৌন্দর্য যেন উপভোগ করার সুযোগ পেলাম।

ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মতো একটার পর আর একটাদৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বনাবৃত শৈলশ্রেণি, গভীর খাদ, কখনো বা রাই-সরিষা, যব ওতামাকের ক্ষেত, ফলের বাগান। মাঝে মাঝে আমরা প্রাচীরে বেষ্টিত মধ্যযুগে নির্মিত গ্রাম ও ছোট শহর পার হয়ে যাচ্ছি।

সে সব শহর চারশো বছর পূর্বে প্রসিদ্ধ শিল্পী আসব্রেকট্ডুরার যখন নৌকা করে হল্যান্ডে ভ্রমণ করেন তখন যেমনছিল, এখনো তেমনি আছে।

একটা গ্রামে দেখি মেলা বসে গিয়েছে। নদীর ধারেচাঁদোয়ার নীচে নীল ও সোনালি রং মাখানো ম্যাডোনারমূর্তি শান্ত-চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

তারপর সন্ধ্যার দিকে দূর থেকে ব্যামবার্গ শহরের বিরাটক্যাথিড্রালের চূড়া দৃষ্টিগোচর হল। সূর্যাস্তের অব্যবহিতপরেই আমরা ব্যামবার্গের প্রাসাদ-দুর্গের নীচে নোঙ্গরকরলাম।

দেখে মনে হয়, যেন ইউরোপের মধ্যযুগ এসব অঞ্চলেশেষ হয়নি। ব্যামবার্গ রেলপথ থেকে দূরের ভ্রমণকারীরাএসে এ জায়গা নষ্ট করে দেয়নি। সমস্ত শহরটা যেনমধ্যযুগের অলস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মধ্যযুগের জার্মানমূর্তিশিল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নমুনা ব্যামবার্গ নগরে রক্ষিতআছে।

ওকেফিনোকি বনাঞ্চল

ইউনাইটেড স্টেটস্-এর অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশে একটাবিরাট জলাভূমি ও বন বহুকাল থেকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কৌতূহল উৎপাদন করে এসেছে। সুয়ানি নদীরসাধারণ গতিপথের মুখে সৃষ্ট এই জলাভূমি এত বিরাট যে, দু-চারজন বৈজ্ঞানিক ছাড়া এর অভ্যন্তরভাগে সাধারণলোকে কখনো প্রবেশ করেনি।

ওকেফিনোকি জলাভূমি ভালো করে দেখবার জন্য১৯১২ সালের মে মাসে আমি যখন প্রথম যাত্রা শুরু করিসে সময় দক্ষিণপূর্ব জর্জিয়া প্রদেশ সাধারণের নিকট প্রায়অজ্ঞাত। আন্দিজ পর্বতমালার অন্তর্গত কোনো অজানা গুহাবা সাউথ-সী অঞ্চলের কোনো অনাবিষ্কৃত দ্বীপের সমান।নানারকম অলৌকিক কিংবদন্তী এই অঞ্চলকে আশ্রয় করেবেড়ে উঠেছিল আর আমার সেইহেতু কৌতূহল ছিলওকেফিনোকি জলা ভালো করে দেখবার জন্য।

একটি লোককে আমি জানতাম—সে ওই অঞ্চলের কাঠও গাছপালা নিয়ে জীবনের অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছে।তার নাম জন হপকিনস্, ওকে আমি অনুরোধ করাতে সেআমায় একটি উনিশ বছরের ছোকরা পথ-প্রদর্শক ঠিক করে দিলে। ছোকরার নাম ডেভিড লি।

যাবার একমাত্র পথ সুয়ানি খাল। এক সময় আমেরিকানগৃহযুদ্ধের দুজন বিখ্যাত বীর মরিস্ ও উইল হেনরি পালিয়ে এসে সুয়ানি খালের পথ দিয়ে জলাভূমিতে আশ্রয় নেয়।তখন খালের অবস্থা ছিল ভালো, এখন ভাসমান কাঠের গুঁড়িতে পরিপূর্ণ হয়ে খালে চলাচলের পথ বন্ধ হবারউপক্রম হয়েছে।

আমরা অনেক ঘুরে কাউহাউস দ্বীপ থেকে যাত্রা শুরুকরলাম। বারো ঘণ্টা ধরে ঘন সাইপ্রেস গাছের বনের তলাদিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাবার পরে রাতদুপুরের সময়আমরা বিলিসদ্বীপে পৌঁছলাম। এই দ্বীপগুলি জলাভূমিরমাঝে মাঝে অবস্থিত। আরো অনেক দ্বীপ আছে, তাদেরওসব নানারকমনাম।

আমি প্রাণী ও উদ্ভিদতত্ত্বের দিক থেকে সুয়ানি খাল ওওকেফিনোকি জলা দেখতে এসেছি, সুতরাং যে মুহূর্তেখালের ঘোলা জলে নৌকা ঢুকেছে এবং দুধারের শেওলাঘোলানো সাইপ্রেস ও পাইন গাছ দেখেছি, সে মুহূর্তেআমার মন আকৃষ্ট হয়েছে এর সৌন্দর্যে, নির্জনতায়। সেইদিনটি থেকে আমি বার বার এ অঞ্চলে এসেছি গিয়েছি।

মোট চারশ দিন হবে, কিংবা তারও বেশি।

প্রথমে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এই বনাঞ্চলেরপক্ষিকুল পর্যবেক্ষণ করা, পরে আমি স্তন্যপায়ী জীব, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, মৎস্য ও গাছপালা সবই দেখে বেড়িয়েছি।

বহু শিকারি লোক এখানে আসে ভল্লুক, উদ্‌বিড়াল, বেজি ও বনবিড়াল প্রভৃতি শিকার করতে। প্রতি বৎসর এরা আসে নির্দিষ্ট সময়ে—একবার ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে ওদের সঙ্গে নৌকাতে এখানে আসি। ওদের গল্পশুনতাম, ওকেনিফোকি জলা সম্বন্ধে কত প্রবাদ, কতঅলৌকিক কাহিনীর খোঁজই যে ওরা রাখে।

১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে আমি এখানে অতিবাহিতকরি উভচর প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করতে। অনেক ধরনের ব্যাঙের ফটো সংগ্রহ করি সেবার। রাত্রে যখন জলাভূমিতেব্যাঙ ডাকে, তখন ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে আমি স্থানীয়বাইশ রকমের ব্যাঙের মধ্যে সতেরো রকমের ছবি তুলেছি।

‘জলাভূমি’র এ অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

এখানে সেই আদিম যুগের অরণ্য, বর্তমান মানুষের হাতে যা নষ্ট হয়নি। বহুকাল আগে এখানেই একটি কুমিরেরডাক শুনি—কুমির গাঁ গাঁ করে ডাকে অনেকেই বোধ হয় জানেন না, কারণ অনেকের এ ডাক শুনবার সৌভাগ্যহয়নি।

ডাকটি শুনেছিলাম বিগ ওয়াটার নামক অঞ্চলে, ওকেফিনোকি জলার পূর্ব-উত্তর কোণে বনের ধারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে সুয়ানি হ্রদে এক ঝোপের ধারে আমি নিজেরচোখে একটি গর্জনরত কুমিরকে প্রত্যক্ষ করি, তার ফটোনিই।

আরো অনেক অদ্ভুত দৃশ্যের ফটোগ্রাফ নিয়েছিলাম সেবার। দক্ষিণ অঞ্চলের গরম খোলাযুক্ত কচ্ছপের ডিমপাড়ার দৃশ্য, ছাতার পাখির মতো লেজযুক্ত চিলের উড্ডয়ন, হানি-দ্বীপের পাইনবনের মাথায় বসে একদল ফ্লরিডা বকডাকছে, জানুয়ারির হিমবর্ষী শীতের রাত্রে ফ্লয়েড দ্বীপে পেচক চিৎকার করছে, স্প্যানিশ শেওলার মধ্যে বাসা নির্মাণরত সোনালি ইঁদুর, চেসার, প্রেইরিতে মাকড়সাতেএকটা জীবন্ত ব্যাঙকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য অদ্ভুত।

প্রাণিজগতের যত অদ্ভুত জিনিস নিজের চোখে দেখেছি, দু-একটা এখানে বলি।

সুয়ানি হ্রদের ধারে একটা চাতক পাখি তারছানাগুলোকে নির্ভয়ে মাটি থেকে কি খুঁটে-খুঁটে খাওয়াচ্ছে, একটা সাইপ্রাস গাছের তলায়—আর আমি ঠিক এক হাতদূরে বসে ধূমপান করছি। পাখিটা আমাদের দিকে মাঝেমাঝে চেয়ে দেখছে, আবার আপনমনে ছানাদের খাওয়াচ্ছে।আমায় গ্রাহ্যও করলে না।

চেসার দ্বীপে একটা ব্যাঙকে ভয় দেখাবার জন্যে আমি লাঠিটাকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে মাটির ওপর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছি, আর ব্যাঙটা ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্যেলাঠিটাকে সম্ভবত ভয় দেখাবার জন্যে ফুলতে লাগলোইসপের গল্পের বিখ্যাত ব্যাঙের মতো।

আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হয়েছে এই জলাভূমিঅঞ্চলের শিকারিদের সঙ্গে আলাপ করে। এদের ভাষাবোঝা আমার পক্ষে কঠিন হত—কত রাত্রে ওদের সঙ্গে তাঁবুর আগুনের চারপাশে বসে ওদের মুখে জলা অঞ্চলেরকত গল্প, প্রাণীদের বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য, ভৌতিক প্রবাদইত্যাদি শুনে রাত কাটিয়েছি, ওদের বন্য গান শুনেছি।

ওকেফিনোকি জলাভূমির শোভা বাড়িয়েছে তার প্রেইরিঅঞ্চল। এগুলো হচ্ছে বহুদূরব্যাপী জলজ গাছের রাজ্য, ধারে ধারে সাইপ্রেসের নিবিড় বন। কি অদ্ভুত শোভা এই অঞ্চলের ! যে প্রকৃতিকে ভালোবাসে, সে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আনন্দে কাল কাটাতে পারে এখানকার পাখির গান, ব্যাঙের ও কুমিরের ডাক শুনে। তবেওকেফিনোকি প্রেইরির সবটাই জল, ওর মধ্যে মাটি নেইকোথাও।

কোথাও বা মাইলখানেক ব্যাসযুক্ত বৃহৎ হ্রদাকারেজলাভূমি, জলজ ঘাস ও গাছপালাহীন। সুতরাং নৌকাচলাচলের বেশ উপযুক্ত, কোথাও কয়েক হাত ব্যাসযুক্ত ক্ষুদ্রগর্ত বা ডোবা, এখানেই কুমিরের দল বাসা বাঁধে। এর মাঝেছোট বড় দ্বীপ, পাইন ও সুইট্‌বে প্রভৃতি গাছের বন তারউপর, সমস্ত গাছে সরু সরু শেওলার কম্বল ঝুলছে।

মাঝে মাঝে বহু একর ব্যাপী সাদা জলজ লিলির বন, তাদের চকচকে সবুজ পাতার রাশি জলকে সম্পূর্ণ ঢেকেরেখেছে। কোথাও বা আছে হলদে ফুলওয়ালা ঘাসের বন। দূর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। জলের ধারে পিকারেলউইডের বন, তার নীল ফুলের দল জলাভূমির প্রান্তদেশ আলো করেছে। জুন মাসে ফোটে পোটরুট্ নামক জলজ গাছের সাদা ফুল, আরো নানাপ্রকার জলজ গাছপালা ও ঘাসের ফুল। এদের প্রতিচ্ছবি পড়ে স্বচ্ছ জলে, ঘাসের দীর্ঘডাঁটা মাথা দোলায়। পিচারপ্ল্যান্ট গাছ এখানে এত বড় হয়যে অন্য কোথাও দেখা যায় না এরকম। জলের ওপর এক গজ উঁচু হয়ে থাকে এর ডাঁটা। পাতার নীচেই এদের ছাতিরআকারের হলদে ফুল ফুটে পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে।

আর এক ধরনের জলজ গাছের নাম ‘মেডেন কেন্’—এদের ফুল ফোটে না। কিন্তু এদের ঘন সবুজঝোপের আড়ালে নানাধরনের পাখি বাসা বাঁধে। নৌকাকরে যেতে যেতে এই ঝোপের কাছে এলে, অনেক রকমের পাখি হঠাৎ ভয় পেয়ে ঝাঁক বেঁধে আকাশে উঠে এক সুন্দরদৃশ্যের সৃষ্টি করে। পাখি ছাড়া ফ্লরিডা অঞ্চলের জলের ইঁদুরএই ঝোপে দেখা যায়।

শিকারিরা গোল গোল নৌকা লগি দিয়ে ঠেলে দিয়েজলাভূমির ওপর বেড়ায়। তাদের নৌকা এমনভাবে তৈরি, গভীর বা অগভীর সব রকম জলেই চলে। তবে এ নৌকাতে বসবার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে চালাতে হয়।নিপুণ মাঝি অতি দ্রুতবেগে জলার ওপরে নৌকা চালাতেপারে। শিকারিরা জলাভূমির মধ্যস্থ বনাবৃত দ্বীপের নিরাপদআশ্রয় থেকে হরিণ ও উল্লুক তাড়িয়ে নিয়ে যায় সে-দিকে, যে-দিকে তাদের সঙ্গী নৌকার ওপর ওৎ পেতে বন্দুক হাতেবসে আছে। সঙ্গীর বন্দুকের গুলিতে বেচারী হরিণ ওভল্লুকদের তারপর জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

এই জলাভূমিতে একা বেশি দূর গিয়ে পড়ার মধ্যেনানারকম বিপদ আছে।

একবার গ্রীষ্মকালে গ্র্যান্ড প্রেইরির সবুজ তৃণদল আমাকেআকৃষ্ট করে এক সপ্তাহের মধ্যে তার নির্জন বক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যখন ভ্রমণে রওনা হবার জন্য নৌকাতেজিনিসপত্র তুলছি, তখন আমার স্থানীয় বন্ধু অ্যালেন চেসারআমায় বললে, যদি বনে ভালুকের সামনে পড়ো, তবেপালাতে যেয়ো না যেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে।

অবশ্য ভালুকের সামনে আমি পড়িনি, কিন্তু বহুপ্রকারবন্য জীবের দর্শনলাভ ঘটেছিল আমার অদৃষ্টে। জলাভূমিরমাঝখানে একটা বনাবৃত দ্বীপে আমি তাঁবু ফেলি, এবং সেখান থেকে প্রত্যহ চারদিকে নৌকা করে ঘুরে আসতাম।

রাত্রে যে কত প্রকার শব্দ ! সে সকল শব্দের অভিজ্ঞতাঅর্জন করতে হলে অমন নিস্তব্ধ জলাভূমিতে গিয়ে রাতকাটাতে হয়। ওকেফিনোকি জলা সাধারণ জলাভূমি নয়, অত বিস্তৃত এবং অত বনাবৃত জলাভূমি জর্জিয়া অঞ্চলে আর কোথাও নেই। রাত্রে ডাকত পেঁচা, সারস, হরিণ কতরকমের ব্যাঙ, কুমির—প্রত্যেকের ডাক আলাদা আলাদা, চিনে নেওয়া যায়।

ফিরে যখন আসি তখন আর একজন স্থানীয় বন্ধু বলেন, কোথায় ছিলে এক সপ্তাহ ?তোমার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করিনা। সাহস অবশ্য আছে তোমার। কিন্তু প্রেইরি অঞ্চলে এক সপ্তাহ একা কাটানোতে সাহসেরচেয়ে দুঃসাহসের পরিচয়দেয় বেশি। আমি এতকাল এখানে বাস করছি, এক হাজারডলার যদি কেউ দেয়, তাতেও আমি কিন্তু যেতে রাজী নইবলে দিচ্ছি। কত রকমের বিপদ ওতে জানো ?সাপই তোকত আছে !

প্রেইরির বুকে অফুরন্ত সূর্যালোক, কিন্তু তীরবর্তীসাইপ্রেসের বনে ঘন অন্ধকার। এইসব সাইপ্রেস খুব বড়গাছ, অনেক সময় সত্তর-আশিফুট উঁচু, ফুটখানেক জলথেকে সাইপ্রেসের বন সাধারণত শুরু হয়, দ্বীপের ভেতরঅনেকদূর পর্যন্ত থাকে।

অনেক সময় জলের ওপরই সাইপ্রেসের বন। মধ্যেকার সুঁড়িপথ দিয়ে লগি ঠেলে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তুঅধিকাংশ স্থানেই সাইপ্রেসের বনের তলায় আগাছার জঙ্গলএত বেশি যে সে-জায়গা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই কঠিন, নৌকা তো দূরের কথা।

সাধারণত মিষ্ট গলবেরি, 'হুরা' ঝোপ ও কাঁটা বাঁশের বন। মানুষের পক্ষে এই ঘন বন ঠেলে যাওয়া অতীবদুঃসাধ্য, প্রায় অসম্ভব। একমাত্রযেতে পারে বন্য ভালুক।বাঁশের কাঁটাতে ভালুকের গায়ের পুরু লোমাবৃত চামড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। অনেক রকমের পাখির ডাকসারাক্ষণই পাওয়া যায়।

ক্যারলিনা রেন করুণ সুরে ডাকে, 'ভিরিও'এবং 'অ্যাকেডিয়ান' পাখি কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে ঘন সাইপ্রেসবনের অন্ধকারে আর আশি ফুট উঁচু বৃক্ষরাজির মাথায় ডাকেরাঙা গলা ও কাঁধ বিশিষ্ট ফ্লরিডা বাজপাখি। এসব বাদেকাঠঠোকরার ঠক্ ঠক্ শব্দ তো সব সময় আছেই।

'আইভরি বিল' নামে এক জাতীয় পাখির আজকালকোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন, কোনো ফল হয়নি। আমার মনে হয়, সতেরো বছর আগেই ওই ওকেফিনোকি জলার সাইপ্রেস বনে আমি সে পাখির ডাক শুনেছিলাম, অনেকটাখেলনা ভেঁপু বাজনার মতো আওয়াজটা, কিন্তু চোখেপাখিটা আমি দেখিনি।

সাইপ্রেস বনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছোট বড় হ্রদ, এইসব হ্রদ মৎস্য-শিকারির স্বর্গ। তিনটি হ্রদ—এদের মধ্যেপ্রধান বিলিস হ্রদ, মিনিস হ্রদ এবং বিগ ওয়াটার। এইহ্রদগুলি দৈর্ঘ্যে অনেক সময় কয়েক মাইল, কিন্তু প্রস্থে পঞ্চাশগজের বেশি নয় কোথাও।

হ্রদের জল ঢুকলে নৌকার মাঝিকে আর লগি ঠেলতে হয় না, জল বেশি গভীর, বৈঠা দিয়ে বাইবার দরকার হয়। 'বাস' ও 'ওয়ারমাউথ' মাছ অজস্র পাওয়া যায় এই সবহ্রদে—নৌকা থেকে সুতো ফেলে মাছ ধরতে হয়, কারণ ডাঙা নেই, সেখানে বসবার সুবিধেও নেই। হ্রদের সব মাছই খেতে সুস্বাদু।

হ্রদে জলের ধারে সার বাঁধা লম্বা সাইপ্রেসেরসারি—তাদের সারা দেহ থেকে স্প্যানিশ শেওলা ঝুলছে।গাছের গুঁড়ি ঘন সবুজ ঝোপে ঢাকা। মে মাসে 'হাউডি' গাছের সাদা ফুল ফুটে যথেষ্ট শোভা হয়।

মে মাসেই এইসব ঝোপে হাকলবেরি সুপক্ক হয়—থোলো থোলো রাঙা হাকলবেরি জলের ওপর ঝোলে, নৌকা করে যেতে যেতে তুলে খাওয়া যায়।

চওড়া পাতাযুক্ত বনেট গাছ এবং তাদের সোনালি রঙেরপুষ্প অনেক সময় জলের ধারে আলো করে থাকে। হ্রদেরজলের মধ্যে থেকে প্রায়ই কুমির মাথা বের করে আছেদেখা যায়, কারণ হ্রদের এই অংশে কুমির অত্যন্ত বেশি।

ওকেফিনোকি জলার দ্বীপসমূহে পূর্বে যথেষ্ট পাইনবনছিল, দুঃখের বিষয় সেসব পাইন বন গত পনেরো বছরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। তাদের কথা এখন স্মৃতিতে দাঁড়িয়েছে—ওকেফিনোকি জলার মধ্যে চারটি দ্বীপ, ফ্লয়েড, বিনিস, হানি ও ব্ল্যাক জ্যাক এই চার দ্বীপেই পাইনগাছের ঘন বন ছিল, লোভী মানুষের কুঠার থেকে তাদের মধ্যে একটি গাছও রক্ষা পায়নি।

কেবল জলার দক্ষিণ অংশে চেসার, হার্স্ট ও নাম্বারওয়ান দ্বীপে যে পাইনবন আছে, গবর্নমেন্ট আইন করে সেগুলি রক্ষা করছেন বলে সেগুলি এখনো আছে। শুধু আইন নয়, এই দ্বীপগুলি অত্যন্ত দুর্গম স্থানে অবস্থিত বলেও পাইনবনের দিকে মানুষের লোভাতুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

কোনো কোনো দ্বীপে পাইন ছাড়া অন্য গাছের বনআছে, এদের মধ্যে ওক গাছ বেশি দেখা যায়। ওক বাদেআছে ম্যাগনোলিয়া, স্ক্রু পাইন, হোলি গাছ।

এখানকার সব গাছেই সুদৃশ্য স্প্যানিশ শেওলা দেখতেপাওয়া যায়—আমেরিকান কবি সিডনি লেনিয়ার যে শেওলার সৌন্দর্য কীর্তন করেছেন তাঁর 'The Marshes of Glynn' নামক কবিতাতে।

হ্রদের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশ প্রকারের মাছ পাওয়াযায়। ছিপ দিয়ে যারা মাছ ধরতে চায়, তারা এখানে যথেষ্টমাছ ধরতে পারবে। বিশেষ করে সুয়ানি হ্রদে ছিপ দিয়ে প্রতি বৎসর অনেক মাছ ধরা হয়ে থাকে। সুয়ানি হ্রদ লম্বায়এক মাইলও হবে না, চওড়ায় গড়ে ত্রিশ গজের বেশিনয়—কিন্তু ১৯২৫ সালে এই হ্রদ থেকে চল্লিশ হাজার মাছ ধরা পড়েছিল ছিপে।

শীতের পর এখানে মাছ ধরবার সময়।

আশেপাশের ক্ষুদ্র গ্রাম ও খামারবাড়ি থেকে এই সময়দলে দলে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ছিপ হাতে মাছ ধরতেআসে।

জর্জিয়া প্রদেশের পল্লী-অঞ্চলের লোকের উপাদেয়ভোজ হচ্ছে মাছভাজা ও তরমুজ। অনেক দুষ্প্রাপ্য জাতীয় মাছ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। একবার বারো পাউন্ডওজনের একটা ট্রাউট মাছ একজনের ছিপে উঠেছিল।

এই জলাভূমিতে পৃথিবীতে মধ্যে ক্ষুদ্রতম মৎস্য বাসকরে। এদের নাম 'রেনওয়াটার' মাছ—যখন খুব বড় হয়, তখন মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা হয়—খড়কের মতো সরু, ধূসররং-এর মাছ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। তবে একসঙ্গেঅনেকগুলো পাওয়া শক্ত।

সাইপ্রেস বনের মধ্যে যে অগভীর ভোবা আছে, তাতেঅনেকপ্রকার সুদৃশ্য মাছ আছে—যেমন পিশমি মাছ, সানফিশ ইত্যাদি।

ওকেফিনোকি জলায় প্রায় তিন প্রকারের ব্যাঙ আছে।সাইপ্রেস বনের অঞ্চলে অসংখ্য ডোবায় এরা বাস করে। এ অঞ্চলকে ব্যাঙের স্বর্গ বলা যেতে পারে। জর্জিয়া প্রদেশেপ্রাচীন দিনে একটি ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে ওকেফিনোকি জলায় ব্যাঙের কথা আছে।

একটা দুষ্ট ব্যাঙ এক সময় ওকেফিনোকি হ্রদের ধারে বাস করত, আর সারাদিন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডাকত।

গ্রীষ্মকালের রাত্রে খুব বৃষ্টি হলেই ব্যাঙের গলারসম্মিলিত ঐকতান শুরু হবে। সে গান শুনবার জিনিস, নিজের কানে না শুনলে সে গম্ভীর ঐকতান বাজনার কোনোধারণা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙের স্বর যারাচেনে, এমন প্রাণিতত্ত্ববিদ লোকে অন্তত দশ-পনেরোরকমের ব্যাঙের ডাক ওই সমবেত কোলাহলধ্বনির মধ্যে বের করবে। সবুজ ব্যাঙ, ক্রিকেট ব্যাঙ, ফ্লরিডার গেছোব্যাঙ, সোফার ব্যাঙ, লেপার্ড ব্যাঙ, ছুতার ব্যাঙ—আরোকত ধরনের ব্যাঙ আছে—প্রত্যেক প্রকারের ডাক আলাদাআলাদা।

এইবার বলব কুমিরের কথা। এমন এক সময় ছিল যখনকুমিরের পিঠের ওপর দিয়ে হ্রদ পার হওয়া যেতো।

আজও পর্যন্ত সমস্ত ওকেফিনোকি জলাভূমির মধ্যেবিলিস হ্রদ কুমিরের জন্য প্রসিদ্ধ। সুয়ানি হ্রদেও কিছু কুমিরআছে। কুমিরের চিৎকার এবং অন্যান্য প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার উপযুক্ত স্থান।

কুমিরের আত্মীয় গিরগিটি এক রকমের। এক ধরনেরনীল লেজযুক্ত বড় গিরগিটি এ অঞ্চলে বেশি। স্থানীয় অধিবাসীদের ভুল ধারণা আছে যে, এই গিরগিটি বিষাক্ত এবং এরা কুকুরের মতো চিৎকার করতে পারে।

আর এক ধরনের গিরগিটি, মানুষ কাছে এসে পড়লেইচুপ করে এক খণ্ড শুকনো কাঠির মতো নির্জীব হয়ে পড়েথাকে—দূর থেকে সেটাকে সত্যই শুকনো কাঠি বলেই মনেহয়। আত্মরক্ষার জন্য এ এক প্রকৃতিদত্ত অভ্যাস। বহুরূপীজাতীয় গিরগিটিও এখানে আছে, তবে মানুষের চোখেরসামনে তাদের গাত্রবর্ণ কদাচিৎ পরিবর্তিত হয়।

এক ধরনের অদ্ভুত গিরগিটিকে এ দেশে বলে 'গ্ল্যাস' (কাচ) গিরগিটি। এরা নিজেদের লেজ ইচ্ছামতো তিন চার টুকরো করে ভেঙে ফেলে আবার জোড়া দিতে পারে। তবে জোড়া দেওয়ার সম্বন্ধে আমি কোনো বৈজ্ঞানিক মত দিতেপারব না, নিজের চোখে কিছু দেখিনি। স্থানীয় লোকেরমধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে বটে।

সাপও আছে নানারকম। এ পর্যন্ত আটাশটি বিভিন্ন জাতীয় সাপ ওকেফিনোকি জলার সাইপ্রেস ও ওকের বনেদেখা গিয়েছে। জঙ্গলাবৃত দ্বীপগুলিতে সাপ খুব বেশি।জলে সাপ খুব বেশি নেই, এদের অধিকাংশ জাতিই ডাঙায়বাস করে। বেশির ভাগই বিষধর।

পাইনগাছের কোটরে বা সাইপ্রেসের বনে সাপেরআড্ডা। কালো সাপ বা কোচ হুইপ দেখতে ঘোড়ার চাবুকেরমতো সরু লিকলিকে, নামেই চেহারার বর্ণনা আছে। এ সাপ দস্তুরমতো বিষাক্ত। ইন্ডিগো সাপের সারাদেহনীলবর্ণের, চমৎকার দেখায় দূর থেকে, এরাও বিষধর। মাঝে মাঝে সাইপ্রেসের বনে সাহসী ও বীর 'কিং'বা বাহা সাপকেদেখা যাবে, অন্য কোনো বৃহৎ সাপকে কুণ্ডলী পাকিয়েজড়িয়ে ধরে চূর্ণ করে তাকে উদরস্থ করবার চেষ্টায় আছে।রাজা সাপের বিষ নেই। এ অজগর জাতীয় সাপ। অনেক রকমের র‍্যাটল বা ঝুমঝুমি সাপ আছে, এরা নড়াচড়ার সময়ঝুমঝুম শব্দ করে বলে এদের নাম র‍্যাটলার বা ঝুমঝুমিসাপ।

ঝুমঝুমি সাপ অনেক রকমের। ডায়মন্ড ব্যাক র‍্যাটলারতার মধ্যে একজাতীয় অতি বিষধর সাপ, কিন্তু অন্যপ্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যদিও এ অঞ্চলে উপরোক্ত সাপেরঅস্তিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, আমি এ পর্যন্ত একটাওদেখিনি। সাধারণত এখানে ছোট ঝুমঝুমি সাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বিষ অত্যন্ত মৃদু, কামড়ালে মারাত্মকহয় না।

সর্বাপেক্ষা বিপদজনক হচ্ছে কটনমাউথ মোকসিন, একজাতীয় বড় ঝুমঝুমি সাপ, সাংঘাতিক বিষধর; এদেরসংখ্যাও খুব বেশি। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সাপকে অত্যন্তভয় করে। সাইপ্রেস গাছের ঘন জঙ্গলে বা দ্বীপগুলিরমধ্যেকার বেঁটে ওকের ঝোপে এদের আড্ডা। তবে আমিকিন্তু এত বেড়ানো সত্ত্বেও এক মাসের মধ্যে দু-তিনটি ছাড়াদেখিনি।

আর একটি কথা এখানে বলি। বিলিস হ্রদে যদিও যথেষ্ট কুমির আছে, কিন্তু সন্তরণকারী লোকেরা সেখানে কুমিরের চেয়ে কচ্ছপকে ভয় পায় বেশি। চার পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসেরছোট্ট খোলাওয়ালা মৃগনাভি কচ্ছপও আছে এখানকারজলে। শেষোক্ত প্রকারের কচ্ছপ অত্যন্ত বিপজ্জনক। মে ওজুন মাসে এইজাতীয় কচ্ছপ সুয়ানি হ্রদের ধারে চড়ায় অনেকদেখা যায়।

এক ধরনের কচ্ছপ আছে তারা সাইপ্রেস বনের মধ্যেগর্ত করে, কিন্তু গর্তের মধ্যে ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েক জাতীয়প্রাণীকে আশ্রয় দেয়। আমি এই ধরনের একটি গর্তে তিনটিব্যাঙকে থাকতে দেখেছি।

জলাভূমির স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফ্লরিডা ভালুক। এরা সর্বাপেক্ষা বড় এবং সর্বাপেক্ষাবিপজ্জনক। এদের শিকার করতে যথেষ্ট সাবধান না হলেশিকারির প্রাণসংশয় অনিবার্য। এরা গৃহপালিত শূকরেরপ্রধান শত্রু। স্থানীয় লোকে প্রায়ই নিজেদের শূকর দলবাঁচানোর জন্যে ভালুক শিকারে বের হয়। এক একজন বৃদ্ধলোক জীবনে দু-তিনশো ভালুক শিকার করেছে।

[ফ্রান্সিস হার্পারের বিবরণ হইতে]

মরুভূমির শহর টিউনিস ও প্রাচীন কার্থেজ

টিউনিসিয়া আফ্রিকাস্থ ফরাসী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এরএকদিকে বিস্তৃত সাহারা মরুভূমি, অপরদিকে সমুদ্র।ইউরোপের এত কাছে এ দেশ এবং ইউরোপের এত প্রভাবএর ওপরে পড়েছে যে, একে ইউরোপের উপকণ্ঠ বলা হয়।

সিসিলি দ্বীপের রাজধানী স্টাপালি থেকে স্টীমারেরাতারাতি টিউনিসিয়ার রাজধানীতে পৌঁছানো যায়।এখানে এত ইতালীয় বাসিন্দা আছে যে সারা লিবিয়া দেশেঅত নেই।

টিউনিসিয়া বহুকাল আগে ছিল সাহারা মরুর বুকে খর্জুর কুঞ্জশ্যাম মরূদ্যান—এখন এখানে এমন অনেক পণ্য উৎপন্নহয়, যা ফ্রান্স ও ইতালির উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়—বিশেষ করে মদ ও তৈল।

এগারো বছর পর আমি টিউনিসিয়াতে ফিরলাম।

প্রাচ্য দেশের জীবনধারার মধ্যে একেবারে যেনরাতারাতি ডুবে গেলাম। অথচ নাম যাই হোক টিউনিস প্রায় ইউরোপীয় শহর।

সে সময় ইতালির সঙ্গে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছে।অ্যাভিনিউ জুন ফেরি ও অ্যাভিনিউ কার্থেজেরসংযোগস্থানে প্রকাণ্ড টাইমস স্কোয়ারে আবিসিনিয়ার বড়ম্যাপ টাঙানো হয়েছে। ছোট ছোট পতাকা ম্যাপের ওপরপুঁতে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীয় সৈন্যের অগ্রগতিবোঝানো হচ্ছে প্রতিদিন।

এখানেও জুয়াখেলার জন্য কাসিনো আছে, রাস্তায় মোটরগাড়ির ভিড়, বড় বড় রেস্তোরাঁয় খাবার সময়েঅর্কেস্ট্রা বাজে। প্যারিসের অনুকরণে বড় বড় অ্যাভিনিউ তৈরি হয়েছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজ বর্তমান টিউনিসনগরির উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ প্রান্তর—শহর থেকে কার্থেজ দেখতে যাবার জন্যে বৈদ্যুতিকরেলগাড়ির ব্যবস্থা আছে, সুতরাং একেবারে আধুনিকশহর।

শহরের এ অঞ্চল ত্যাগ করে আমি বার্বার, বেদুইনআরবীয়দের জগতে প্রবেশ করতে চাইলাম।

বড় রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে পোর্ত দ্য ফ্রাঁন্স-এর অদূরেদেশী লোকের আবাসস্থান। এখানে রাস্তার ধারের টেবিলে, কফিপানরত লাল ফেজ পরা খরিদ্দারদের ভিড়। নিকটেইএকটি ক্ষুদ্র পার্ক, পার্কের চারিধারে পুরানো যুগের লাল ওসবুজ রঙ-এর স্তম্ভ ও খিলান এখনো দাঁড়িয়ে আছে—সেকালে এইটিই ছিল ক্রীতদাস বিক্রয়ের বাজার।

বার্বার জলদস্যুদের প্রধান ব্যবসায় ছিল ভূমধ্যসাগরের জাহাজ লুঠ করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা এবং টিউনিসের বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করা। মার্কিন যুক্তরাজ্য সর্বপ্রথমবার্বার জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করতে যথেষ্ট সাহায্যকরে এবং আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছিল।

এই শহরের উপকণ্ঠে মার্কিন কবি জন হাওয়ার্ড পেইনের সমাধি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। কবি এখানে কিছুদিন বাসকরেছিলেন। এখানেই শেষে দেহত্যাগ করেন। কোন্ এমনস্কুলের ছেলে আছে যে, কবির বিখ্যাত সঙ্গীত, “Home, Sweet Home” কবিতা হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে পড়েনি ?

কিন্তু কবির শবদেহ এখানে নেই। স্বদেশভক্ত কবির দেহ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে এখান থেকে ওয়াশিংটন শহরে নীত হয় এবং ওই সালের ৯ই জুনসেখানে জাঁকজমকের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়।

কফির দোকানের সামনে সকালে বার্বার নর্তকীরা কফিপানরত বেদুইন ও আরবদের মনোরঞ্জন করত, আজকাল রেডিওর লাউডস্পীকারের কণ্ঠনিঃসৃত কর্কশ ধাতব সঙ্গীত ও বাদ্য সেই কাজ করে। জায়গাটার নাম প্ল্যাস্বাচ্ সুইকা—রাস্তা দিয়ে ট্রামগাড়ি যাচ্ছে, কমলালেবুরফিরিওয়ালারা চিৎকার করে লেবু ফিরি করছে। আমাদেরপেছনে বড় বড় সাদা ডোমওয়ালা বাড়ি, ঘর, মসজিদ।

প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এখানে মিলন বড় সুস্পষ্ট।নিকটেই বার্তো মিউজিয়াম এক সময়ে টিউনিসের শাসকহামিদ বে’র হারেম ছিল বাড়িটায়। এখানে একসময় সুন্দরীঅন্তঃপুরিকাগণ সোনার খাঁচায় পোষা পাখির মতো আবদ্ধথাকতেন, আজকাল বিভিন্ন দেশের টুরিস্টরা সেই স্থানেপিউনিক, রোমান ও আরবীয় শিল্পদ্রব্য দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রাচীনকালের এই শিল্পসম্ভার এখানে এত বেশিপরিমাণে ও এত বিচিত্র শ্রেণীর আছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতকে বিস্মিত হতে হবে সে সব দেখে। এগুলি সবইটিউনিসের শাসকগণের দ্বারা সংগৃহীত এবং সব সময়ে সদুপায়েসংগৃহীত নয়, তা বলাই বাহুল্য।

হামিদ বে এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহু জায়গা থেকেলুঠতরাজ করে এই ঐশ্বর্যসম্ভার এনে নিজেদের প্রাসাদ ওহারেম সজ্জিত করেছিলেন। টিউনিসিয়া ফরাসী গবর্নমেন্টেরঅধীনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকবংশের প্রভাবঅনেকখানি কমে গিয়েছে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসমেত প্রাসাদটিমিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে।

মিউজিয়ামের বহিঃপ্রাঙ্গণেও অনেক ভগ্নস্তম্ভ ও মূর্তিরহাত পা ইত্যাদি জড়ো করা আছে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকারমধ্যে রোমান মন্দির, প্রাসাদ ও চত্বরের ধ্বংসস্তূপ সকলেরচেয়ে বেশি দেখা যাবে ডুগা ও যুগা বলে প্রাচীন রোমানউপনিবেশে।

ডুগাতে জনৈক ধনবান ব্যক্তি রোমান সম্রাটআলেকজান্ডার সেভারাসের সময়ে একটি মার্বেল পাথরেরসুন্দর মন্দির করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদগণ এই মন্দিরের মধ্যভাগ মাটির ভিতর থেকেখুঁড়ে দিনের আলোয় বার করেছেন। যুগাতেও এরকম কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। প্রধানত খ্রিস্টীয়দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

মার্বেল ও ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক রোমান দেবদেবীর মূর্তি টিউনিসিয়ার নানাস্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

তিরিশ বছর পূর্বে একজন ডুবুরি মাহ্দিয়ার নিকটবর্তীসমুদ্রে প্রবাল সংগ্রহের জন্য ডুব দিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেইসে জলের ওপর ভেসে উঠলো সমুদ্রের তলা থেকে, ভয়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। জলের গভীরতলদেশের অন্ধকারে সে এক ভীষণদর্শন মূর্তি দেখতে পেয়েভয়ে উঠে এসেছে। তার সঙ্গীরা তার মুখে এ বৃত্তান্ত শুনে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেখানে ডুব দিলে। জলের তলায়তারা যা দেখলে তাতে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল, নানারকমের মূর্তি ও শিল্পদ্রব্য এক জায়গায় প্রবালের বনেজড়ো হয়ে আছে। পরে জানা যায়, রোমান সেনাপতি সল্লাএথেন্স নগরী লুঠ করে রোম নগরীতে যখন যাত্রা করেন, তখন মাহ্দিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে তার জাহাজডুবি হয়েসব শিল্পদ্রব্য জলের তলায় সমাধিপ্রাপ্ত হয়, ডুবুরিদেরদৃষ্টিতে এই জিনিসগুলি আসলে প্রাচীন-যুগের রোম সেনাপতির দ্বারা লুণ্ঠিত সেই দ্রব্যসম্ভার।

বার্ডো মিউজিয়ামে একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি আছে, এটিপ্রসিদ্ধ এক ভাস্কর প্রাক্সিটেনিস নির্মিত এরোস বাকন্দর্পদেবের মূর্তির নকল। প্রেম যে অন্ধ, তা দেখাবার জন্যবোধ হয় প্রাক্সিটেনিস এই মূর্তির চক্ষু দুটিকেঅক্ষিতারকাশূন্য করেছিলেন। আসল মূর্তিটির বর্ণনা দিয়েছেনগ্রীক ঐতিহাসিক ক্যালিস্ট্রেটাস, কিন্তু এই মূর্তিটি বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বার্ডো মিউজিয়ামের যে বিরাটহলঘরে সল্লার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি জলতলে নিমজ্জিত হবারকুড়ি শতাব্দী পরে আবার দিনের আলো দেখছে, তারইএকটি উচ্চস্থানে মার্বেল বেদির ওপর এই প্রসিদ্ধ ও অমূল্যভাস্কর্যটি স্থাপিত আছে।

বার্ডো মিউজিয়ামের আরব শিল্পদ্রব্য প্রধানত চিত্রবিচিত্রটালি, চামড়ার কাজ, প্লাস্টারের খোদাই কাজ ওডামাস্কাসের তলোয়ার। কিন্তু আরবদের শিল্পকে ভালোকরে দেখতে হলে মিউজিয়াম না দেখে বাইরের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে মরুভূমির প্রান্তবর্তী পাহাড়ের ওপরকারগাছতলায় এসে দূরবর্তী শ্বেতবর্ণ টিউনিস শহরের দিকে চেয়েবসে থাকতে হয়।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কার্থেজ টিউনিস শহর থেকে বেশি দূরেনয়। টিউনিস থেকে মোটর গাড়িতে বা ইলেকট্রিক ট্রেনেকার্থেজ যাওয়া যায়।

দিদো, হানিবল ও হামিলকারের নাম আগেই মনেআসে। এই সম্পর্কে লাটিন কবি ভার্জিলের নাম ও ফরাসীঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুজন তাঁদের অমর লেখনীর সাহায্যে কার্থেজকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন।

লেখকরা এইভাবেই দেশকে, স্থানকে বাঁচিয়ে রাখেনবটে।

কার্থেজ অতীত যুগের গৌরবময়ী নগরীর শীর্ণ প্রেতাত্মাশক্তিমান লেখকের এ ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয় করেরেখেছে—যেখানে এখন কার্থেজের ইলেকট্রিক ট্রেনেরস্টেশন, তার কাছে ডেজি ও জিরোনিয়াম ফুলের ক্ষেতের মধ্যে ‘সালাম্‌বো’র অমর স্রষ্টার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত।

তাঁর ‘মাদাম বোভারি’র চেয়েও ‘সালামবো’ এ দেশেবেশি পরিচিত।

আমি ১৯২৩ সালে যখন প্রথম কার্থেজ দেখতেএসেছিলাম, তখন একথা আমার মনে না এসে পারেনি যে, ফ্লবেয়ার কার্থেজকে যে মহিমা দিয়ে গিয়েছেন তাঁর লেখনীর সাহায্যে, তা এখন কেউ দেখতে পাবে না। তাস্বপ্নলব্ধ সত্যসৃষ্টি।

ফ্লবেয়ারের কাজ তখন আরো কত কঠিন ছিল, কারণ যখন তিনি ‘সালামবো’ রচনা করেন, তখন পিয়ের দ্যলেগরের কার্থেজ নগরীর খননকার্য আরম্ভ হয়নি।

এখন মনে হয় যে ফ্লবেয়ার লিখে ভালোই করেছেন, অতীতের কুয়াশার মধ্য দিয়ে কার্থেজ দেখানোই ভালো।

বর্তমানে কার্থেজ কতকগুলি মাটির ঘর আর খড়েরচালের সমষ্টিমাত্র। যেখানে এক সময়ে কার্থেজের দুর্গ, ধনীদের প্রাসাদ, মন্দির, সভাগৃহ ছিল, এখন সেখানে অতি দরিদ্র আরবীয় পল্লীবাসীদের তরিতরকারির ক্ষেত ও কুটিরশ্রেণী বিদ্যমান। অথচ এক সময়ে সাত লক্ষ নাগরিকেরবাসস্থান ছিল এই মরুপ্রান্তর।

কার্থেজের বাস্তুদেবতা অবশ্য ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি মাত্র।কিন্তু সেই নামে এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম কার্থেজের অদূরে অবস্থিত আছে।

ইলেকট্রিক ট্রেনের কন্ডাক্টর কার্থেজের পথে যেতে যেতেযখন ‘সালামবোতে নেমে যাও’ বলে চিৎকার করে ওঠে, তখন এই ঐন্দ্রজালিক নাম শুনে হঠাৎ চমকে যেতে হয়।

একটি মাত্র পুরানো শিল্পদ্রব্য এখনো কার্থেজের নামএবং ফ্লবেয়ারের উপন্যাসের নায়িকার ছবি মনে এনে দেয়।পিউনিক যুগের একটি প্রস্তরের শবাধারের ওপর এক তরুণীউপাসিকার মূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিটির হাতে একটি ঘুঘু, লাবণ্যময়ী ভঙ্গি সারাদেহে, কার্থেজের শ্মশানের মধ্যে এইসুন্দরী নারীমূর্তিটি ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে।

প্রাচীনদিনের প্রতিহিংসাপরায়ণ যোদ্ধার দল ভালো করেই তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। কার্থেজের একখানা পাথরও তারা মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখেনি কিন্তু পাহাড়ের পাশের সমাধিগর্ভে লুকোনো এই তরুণী উপাসিকার মূর্তিটি তাদের চোখ এড়িয়েছিল বলেই আমরাআজ পিউনিক শিল্পীদের রুচি ও শিল্পপ্রতিভার প্রতি সুবিচারকরতে বাধ্য হই।

কার্থেজের প্রাচীন বন্দর বহুকাল পূর্বে সমুদ্র থেকেবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় আবার তা টিউনিসের ক্ষুদ্রউপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

কার্থেজের চক্রাকৃতি পাথরের গ্যালারির উপর একটিসাদা ক্রুশ পোঁতা দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। কার্থেজ কোনোকালেই খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করেনি, তবে তারধ্বংসস্তূপে ক্রুশচিহ্ন কিসের ?

পরে জেনেছিলাম এইখানে কয়েকজন প্রথম যুগেরখ্রিস্টান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল তাদের ধর্মের জন্য এখন থেকে প্রায় বারোশ' বছর আগে। কার্ডিন্যাল লাভাশোর সেইপর্বতস্থানে ক্রুশটি স্থাপন করেছেন।

'কার্থেজকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করতে হবে' এটা ছিল কথারকথা মাত্র। সিপিও কার্থেজকে আংশিকভাবে ধ্বংসকরেছিলেন বটে কিন্তু সম্রাট অগস্টাস ও সিজার এতস্থূলবুদ্ধি ছিলেন না। এই দুই উদারহৃদয় শাসক কার্থেজনগরীকে ভালো করে গড়ে তোলেন।

সম্রাট হ্যাড্রিয়ান নগরীর জলকষ্ট নিবারণ করবার জন্যে বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেন, হ্যাড্রিয়ানের এইপয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে টিউনিসিয়ার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ও সুদৃশ্য প্রাচীনকালীন কীর্তি।

রোমান পয়ঃপ্রণালী তখনকার কালে যেমন উঁচু স্তম্ভেরওপর খিলান করে তৈরি করা হত—এটিও সেভাবে তৈরিকরা হয়েছে। মাইলের পর মাইল ধরে শস্যক্ষেত্র ওপশুচারণভূমির ওপর দিয়ে এই সুউচ্চ পয়ঃপ্রণালী জাওয়ানপর্বতে চলে গিয়েছে। এই পর্বত পূর্বে যেমন কার্থেজকে জলসরবরাহ করত, বর্তমানে টিউনিসকেও তেমনি জলসরবরাহ করে।

কার্থেজের এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালীর পথে কাইরওয়ানমসজিদ। সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এই বিশাল মসজিদআমাদের মনে অভূতপূর্ব প্রাণ এনে দিল।

এটি আরবীয়দের পাড়া।

পথে গরিব আরবীয়েরা এসে হাত পেতেদাঁড়ায়—মিস্টার, একটা সিগারেট হবে ?কাইরওয়ান মসজিদএবং দক্ষিণ ওয়েসিসের মধ্যে বিস্তৃত সমতলভূমি। ফরাসীগবর্নমেন্ট এই মরুভূমিকে উর্বরা করেছেন বলে গর্ব করতেপারেন। আজকাল এখানে বড় বড় জলপাইবাগান—সারবন্দী জলপাই গাছ আশি ফুট অন্তর অন্তরপোঁতা, প্রচুর জলপাই ফলে। প্রাচীনযুগে যেমন এখনোতেমনি জলপাইয়ের তেলের এ-দেশে খুব আদর। প্রাচীন রোমান পালোয়ানেরা জলপাইয়ের তেলে শরীর মর্দনকরতেন, রোমান সুন্দরীরা মাথায় ও গায়ে জলপাইয়েরতেল মাখতেন, জলপাইয়ের তেল প্রদীপে পোড়ানো হত।এখনো হয়। আমার সাংবাদিক বন্ধু গার্ডফ্রেজ তাঁর গৃহে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর বাড়িটা তুর্কীস্নানাগার ছিল। ঢুকবার দেউড়িতে আমি একটা সেকেলে ব্রোঞ্জের প্রদীপ দেখেছিলাম, তাতে জলপাইয়ের তেলপোড়ানো হত।

আমার বন্ধু সামান্য দামে জনৈক ফেরিওয়ালার কাছে এইটি খরিদ করেন। তাঁর গৃহ জারজিস ওয়েসিসেরপ্রান্তভাগে—শহর থেকে অনেক দূরে, সেখানে গ্যাস বাবিদ্যুতের সরবরাহ নেই, সুতরাং বন্ধুটি এই প্রদীপেপ্রাচীনকালের মতো জলপাই তেল পুরে জ্বালিয়ে থাকেন।মিউজিয়ামে রাশীকৃত মাটির প্রদীপ দেখা যায়, বহু পুরানোআমলের প্রদীপ, সবগুলিতে জলপাইয়ের তেল ব্যবহৃত হত বলে তাদের গঠন থেকে অনুমিত হয়।

টিউনিস শহর থেকে কিছুদূরে সাউসি নামে আর একটাছোট শহর আছে। এখানে অনেক প্রাচীন রোমান কীর্তিরধ্বংসাবশেষ আছে। এখানকার বালির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রত্নপাওয়া যায়—তার গায়ে 'ইনিড' রচনারত অবস্থায়ভার্জিলের মূর্তি খোদিত। এই ক্ষুদ্র মণিটি বার্ডোমিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে।

বেদুইন আরবীয় মেয়েরা অত্যন্ত লাজুক। ক্যামেরারতেপায়া খাটিয়ে কালো বনাতের তলায় মুখ ঢেকেছি কিঅমনি তারা ঘরের মাটির দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছে। যখন বাধ্য হয়ে ভগ্নমনে ক্যামেরা তুলে চলেযাচ্ছি, হয়তো তখন পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, বেদুইনতরুণীরা আড়াল থেকে বার হয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাসছেআমাদের দুর্দশা দেখে।

একদিন সম্মুখের মরুভূমির মধ্যে বেড়াতে গেলাম।

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আমরা সাটমাটা পাহাড় অভিমুখেচলেছি। আকাশ থেকে কোনো বৈমানিক সাটমাটা পাহাড় ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তীভূমি দেখে ভাবতে পারে, তারা চাঁদেরদেশে এসে পড়েছে; জমি সেখানে এমন অসমতল ওঅসংখ্য গর্তে ভরা, জমির মুখে যেন বসন্তের দাগ হয়েছে।কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যাবে, গর্তগুলি আসলে মানুষেরবাসস্থান।

সাটমাটা পাহাড়ের গায়ে এবং চারিপাশে লোকে প্রাচীনযুগের গুহাবাসী মানবের মতো মাটিতে চতুষ্কোণ গর্তকেটে তার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করছে। এদের সংখ্যাপ্রায় পাঁচ হাজারের কম নয়।

এদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যন্ত কড়া পর্দা, বাইরের লোক অনেক সময়ে গুহাবাসীদের দেশে বেড়াতে গিয়ে অপমানিত হয়ে এসেছে, কারণ ওখানকার পুরুষেরা পছন্দকরে না যে, তাদের স্ত্রীলোকদের কেউ দেখে।

আরবীয়েরা যখন এদেশ আক্রমণ করেছিল কয়েকশ বছর পূর্বে তখন বার্বার অধিবাসীরা তাদের স্ত্রীপুত্র, ধনরত্ননিয়ে মাটির মধ্যে গর্ত কেটে আশ্রয় নেয়। বার্বারি অঞ্চলেপ্রাচীনকাল থেকে এ-রকম প্রথা প্রচলিত আছে।

বহু শতাব্দী হল আরবদের ভয় কেটে গিয়েছে, কিন্তুবার্বার যোদ্ধাদের বংশধরেরা এখনো গুহার মধ্যে বাসকরছে। এখন তাঁদের শত্রু আরবীয়েরা নয়, আফ্রিকার প্রখররৌদ্র এবং মশা-মাছি। আমি এই সমস্ত গুহায় প্রবেশেরসুযোগ লাভ করেছিলাম, তা থেকে জানি মার্চ মাসেও এই গুহাগুলির ভেতর বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিন এরা সাটমাটাপাহাড়ের পাশে ক্ষেতখামারের কাজ করে, প্রধানতকৃষিকার্যই এদের উপজীবিকা।

আলিবাবার গল্পে বর্ণিত তেলের জালার মতো বড় বড়খড়ে বুনুনি জালায় এদের শস্য রক্ষিত থাকে। গৃহপালিতমেষ ও ছাগলের জন্যে মাটির মধ্যে খোঁয়াড় আছে—ছাগলের দুধ থেকে পনির ও দই তৈরি করে, মাংস খায়।

মেয়েরা ছোট ছোট মেটে উনুনে রান্না করে। অনেক সময় গুহার উঠানটা খোলা জায়গায়, উঠানের মাথার ওপরআকাশ দেখা যায়, সেইখানেই উনুন বসানো। এদেশে বৃষ্টি এত কম যে, এরকম ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধাই হয় না।

আর এক ধরনের বাড়ি আছে, তা সাটমাটার গুহাবাসের ঠিক উল্টো, অর্থাৎ সেখানেও গুহা আছে বটে কিন্তু সেগুহা মাটির ভেতর নয়, একটার পর একটা হিসাবে থাকেথাকে সজ্জিত অর্থাৎ মাটির পাঁচতলা ছ'তলা বাড়ি।

মরুদস্যুদের উপদ্রব থেকে ধনপ্রাণ বাঁচানোর জন্যে এরাএইরকম বাড়িতে প্রাচীনকালে বাস করত—এখন ফরাসীগভর্নমেন্টের শাসনে দস্যুভয় পূর্বাপেক্ষা অনেক কম, তবুও লোকে আজও তালার ওপর তালা তুলে জানালাবিহীনগুহাকৃতি মাটির ঘরে বাস করে। এসব ঘরে কড়িবরগা নেই, শুধুই কাদা দিয়ে গাঁথা আগাগোড়া। মরুভূমির দেশে কাঠঅতি দুর্লভ ও দুর্মূল্য। এ ধরনের বাড়িকে এ অঞ্চলে "ঘোরকা" বলে। তবে আজকাল লোহা ও সিমেন্ট আমদানিহওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংক্রিটের 'ঘোরকা'ও তৈরি হচ্ছে।

সাহারা মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্তআজকাল এরোপ্লেন ও মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। মরুপ্রান্তের মধ্যে পূর্বে যেমন কূপ থাকত, আজকাল সেখানেপেট্রোলট্যাঙ্ক স্থাপিত।

একটি ক্ষুদ্র মরুপল্লীর নাম জেরবা। অধিবাসীদের দেখেমনে হয় এরাই টেনিসন-বর্ণিত Lotus-eater-এর দল। তবেএরা জীবনটাকে আরম্ভ করে অন্যভাবে। দলে দলে বিদেশেযায় অর্থোপার্জনের চেষ্টায়, যাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হন, তারা কিছুকাল পরে ফিরে এসে ছোট সাদা ডোমওয়ালা বাড়ি তৈরি করে, বাড়ির সামনে একটা বা দুটো উট বেঁধেরাখে (উট বাঁধা গৃহসজ্জার সামিল, এতে সচ্ছলতা প্রমাণিত হয়)। তারপর বাকি জীবনটুকু নিজেদের খেজুর ও ডুমুরগাছের ছায়ায় নিশ্চেষ্ট আলস্যে কাটিয়ে দেয়।

জেরবা গ্রামের কাছে তিনশ বছরের নরমুণ্ডের হাড়েরএকটি স্তূপ অবস্থিত ছিল। এর আকার অনেকটা পিরামিডেরমতো ছিল শুনেছি। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে আরব ও স্পেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন ড্রাগুট্ নামধারী জনৈক বার্বারী সর্দার জেরবা দুর্গ দখল করে যোদ্ধাদের মেরে ফেলে এবং তাদের মুণ্ডে এই পিরামিডটি তৈরি করে।

ফরাসী গবর্নমেন্ট প্রায় একশ' বছর আগে এটি ভেঙেফেলে মুণ্ডগুলিকে খ্রিস্টীয় ধর্মানুযায়ী সমাহিত করেন।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও তার অদ্ভুত জীবজন্তু

প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্যালাপাগোস দ্বীপের নাম অতি প্রসিদ্ধ।

১৮২৫ সালে তরুণ চার্লস ডারউইন 'বিগল' নামকজাহাজে এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন, সেই সময় থেকেই গ্যালাপাগোস দ্বীপের নাম ক্রমবিবর্তনবাদের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে খুব বেশি দূরেও নয়।নয়টি বড় বড় দ্বীপ ও কয়েকটি ছোট দ্বীপের সমবায়ে এইপ্রসিদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

চার্লস ডারউইন যে সময়ে এ দ্বীপে পদার্পণ করেন, তারঅন্তত তিনশো বছর পূর্ব থেকে স্পেনীয় ও ইংরেজ বোম্বেটে জাহাজের এটি একটি নোঙর করবার আড্ডা ছিল।

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পানামার বিশপ মহোদয় কর্তৃক এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়।

পেরুবিজয়ী বীর ফ্রান্সিসকো পিজারোর ক্ষমতা হ্রাসকরবার উদ্দেশ্যে পেরুতে যাত্রা করবার সময় বিশপমহোদয়ের জাহাজ 'হুমাবোল্ট' দক্ষিণ মেরুপ্রদেশীয় স্রোতের দ্বারা এই দ্বীপের উপকূলে নীত হয়। বিশপ দ্বীপেঅবতরণ করে দেখলেন দ্বীপটি সম্পূর্ণ মনুষ্যবাসশূন্য। জলপাওয়া যায় না, মহাবিপদ, কয়েকটি নাবিক জলাভাবে প্রাণত্যাগ করবার পরে অনেক কষ্টে পানীয় জলের সন্ধানপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

এর পরে বিশপ যখন স্পেনের রাজার কাছে পত্র লেখেনতাতে তিনি এই দ্বীপ এবং দ্বীপস্থ বড় বড় কচ্ছপের উল্লেখকরেন। এমন পক্ষিকুলের উল্লেখ করেন যারা মানুষ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় না।

স্পেনীয় ভাষায় স্থলচর বড় কচ্ছপের নাম 'গ্যালাপাগোস'—দ্বীপবাসী সুবৃহৎ কচ্ছপকুলের নামেই দ্বীপের নামকরণ হল 'গ্যালাপাগোস।

বিশপ মহোদয় যে জাহাজে ছিলেন, তার কাপ্তেন এইদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানবিন্দু নির্ণয় করেন ও তাঁরডায়েরিতে সেটা লিপিবদ্ধ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মানচিত্র প্রস্তুতকারক এব্রাহাম অর্টেলিয়াসের হাতে এই ডায়েরি পড়ে এবং ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন পেরুর মানচিত্র তৈরি করেন তখন গ্যালাপাগোস দ্বীপ উক্ত মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট হয়।

তিনি তাঁর মানচিত্রে এই দ্বীপকে 'আইসোলাসে ডিগ্যালাপাগোস' অর্থাৎ 'বৃহৎ কচ্ছপের দ্বীপ' বলে উল্লেখ করেন এবং সেই থেকে এর নামই হয়ে দাঁড়ালগ্যালাপাগোস।

বিশপ মহোদয়ের আগমনের বহু পূর্বে বোরুর একাদশ ইঙ্কা টুপাক উপাঙ্কি প্রশান্ত মহাসমুদ্রে কয়েকটি আগ্নেয় দ্বীপপরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানকার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদেরবন্দী করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন—এমন ধরনের প্রবাদপেরুতে প্রচলিত ছিল। ইঙ্কা এই দ্বীপগুলির নামকরণ করেন 'নিনাচুম্বি' ও 'হাহুয়া চুম্বি'।

কেউ কেউ বলেন সম্ভবত ইঙ্কা বর্তমান গ্যালাপাগোস দ্বীপই পরিদর্শন করে থাকবেন হয়তো। কিন্তু পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন না; তাঁরা বলেন এ দ্বীপে মনুষ্যবাসের কোনো চিহ্ন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যাই হোক, গ্যালাপাগোস দ্বীপ ও তাঁর বৃহৎ কচ্ছপকুলের কাহিনীচতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতেঅনেক স্পেনীয় নাবিক এই দ্বীপে জাহাজ নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন; এদের মধ্যে অনেকেরই উদ্যম শোচনীয় দুর্ঘটনারমধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

অবশেষে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ নাবিক স্যাররিচার্ড হকিন্স্ এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতদ্বীপবাসী বিখ্যাত কচ্ছপকুল দেখে হতাশ হন, কারণ তাঁর বর্ণনার মধ্যে কচ্ছপকুলের কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে এক ছত্রেই তিনি শেষ করেছেন দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিভীষিকা স্বরূপ সে-যুগেরকয়েকটি দুর্দান্ত ইংরেজ বোম্বেটে যেমন ডেভিস, জন ইটন, ড্যাম্পিয়ার শার্প, কাউলে প্রভৃতি এরাই গ্যালাপাগোসদ্বীপকে এদের জাহাজের আড্ডায় পরিণত করে। ১৬৩০থেকে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বোম্বেটেদের একটাবড় আড্ডা ছিল।

এই শেষোক্ত বোম্বেটে উইলিয়ম আমব্রোজ কাউলে, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলির ইংরাজি নামকরণকরে। যাদের নামে নামকরণ হয়, তারা প্রায় সকলেই কাউলের সহচর জলদস্যু। কেবল দুটি বড় বড় দ্বীপের নামকরণ হয় আলবিমাল ও নরফোকের ডিউকেরনামানুসারে।

অষ্টাদশে শতাব্দীতে কাপ্তেন কলনেট প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তিমি শিকারে এসে বার-দুই এই দ্বীপে জাহাজ নোঙর করেন। কাউলের দেওয়া নাম বদলে দিয়ে কয়েকটি দ্বীপেরতিনি নতুন নাম দেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইকোয়েডরগবর্নমেন্ট এই দ্বীপপুঞ্জকে তাঁদের রাজ্যভুক্ত করেন এবং ইংরেজি নাম উঠিয়ে দিয়ে অনেকগুলি দ্বীপের স্পেনীয় নামদেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দুটি দ্বীপে মানুষ বাস করতেআরম্ভ করে, সুতরাং ১৮৩৫ সালে চার্লস ডারউইন যখনএখানে আসেন, তখন বেশির ভাগ দ্বীপগুলিইমনুষ্যবাসশূন্য ছিল।

ডারউইনের মতে এই দ্বীপ অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ আগ্নেয় বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত হয়। তা ঘটেবহু পূর্বে, যখন পৃথিবীর বড় বড় আগ্নেগিরিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং সমুদ্রতল সেই আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে দ্বীপও সমুদ্র-গর্ভস্থ মগ্নশৈলাদিতে পরিণত হয়।

ডারউইন দ্বীপের সর্বত্র ছোট বড় অগ্নিকটাহ ও জমাটএবং ঠাণ্ডা লাভাস্রোত প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর এ ধারণা ক্রমশবদ্ধমূল হয় যে ভূতত্ত্বের দিক থেকে এই দ্বীপপুঞ্জই অত্যন্ত প্রাচীন নয়, দ্বীপস্থ গাছপালা ও অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তু নিশ্চয়ই বায়ু, ঢেউ ও সমুদ্রের স্রোতের দ্বারা দূরবর্তী আমেরিকামহাদেশ থেকে আনীত হয়েছে। বিশেষ করে এই অঞ্চলেরসমুদ্রে প্রসিদ্ধ 'হুমবোল্ট দক্ষিণমেরু স্রোত' নামে সমুদ্রস্রোতবর্তমান—বহুদূরেএ স্রোতের উৎপত্তি।

এই স্রোতে বাহিত হয়ে দূরের দেশ থেকে নানা ধরনেরগাছপালার বীজ একদিন এই দ্বীপে পৌঁছে থাকবে। আধুনিক যুগে আমরা এ সত্যকে গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করি না বটে, কিন্তু ডারউইনকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল এই সত্যকে নিজের মনে প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ জীবেরক্রমবিবর্তন ব্যতিরেকেও তৎকালে প্রচলিত আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদের সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্ব করতে হয়েছিল মনে মনে।

জীববিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার কথা নয়, ডারউইনেরপূর্বে এই আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদ সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত থাকার ফলে তখনকার চিন্তাশীললোকেও এই মতের বিরুদ্ধে কিছু ভাবতে সাহস পেতেন না।

ভগবান যেখানে যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তাএকেবারে তাঁর নিজের হাতের খাস সৃষ্টি; একই শ্রেণীরপ্রাণীদের মধ্যে আকৃতিগত যে সমুদয় পার্থক্য দৃষ্টিগোচরহয়, সে-সবও ভগবান নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন—এই ছিল সেকালে প্রচলিত আধিদৈবিক সৃষ্টিবাদ।

গ্যালাপাগোস দ্বীপ ও সেখানকার অদ্ভুতদর্শন গিরগিটি, গোধিকা, কচ্ছপ ও গাছপালা ডারউইনের মনে এই চিন্তারসৃষ্টি করলে যে এগুলি পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট সাধারণ শ্রেণীর ওই পর্যায়ভুক্ত জীব—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কোনো সৃষ্টিকর্তা এদের নির্জনে বসে তৈরি করেননি। এদের প্রাণবীজ বায়ু ও সমুদ্রস্রোত দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য দেশ বাদ্বীপ থেকে এই সমুদ্রমধ্যস্থ আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়েছিল বহুকাল পূর্বে এবং স্থানীয় আবহাওয়ার বৈশিষ্টে ভিন্ন ধারায়লালিত ও বর্ধিত হয়েছে বলে এদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আজ এতটা বেশি হয়ে পড়েছে।

এ থেকে কালক্রমে নতুনতর জীবের আর্বিভাব সম্ভবহয়েছে।

যেমন ডারউইন লক্ষ করলেন, সরীসৃপশ্রেণীর জীবগুলি বিশেষ করে এই দ্বীপেরই একচেটে সম্পত্তি। এই দ্বীপেইতাদের উৎপত্তি, এই দ্বীপেই ওদের জীবনও গেল কেটে।অন্য কোথাও ঠিক এই শ্রেণীর সরীসৃপ নেই। এমন কিঅতবড় যে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অত কাছে অবস্থিত, সেখানেও এ রকমের কোনো সরীসৃপ বাস করে না—কেবলখুব ছোট এক ধরনের সর্প ছাড়া।

গ্যালাপাগোস দ্বীপে যে সমুদ্রচর গোধিকা দেখা যায়, কোথাও এ ধরনের প্রাণী নেই। আর এক ধরনের স্থলচর গোধিকা আছে এখানে, যারা ফণিমনসার গাছের কন্টকময়পুরুশাঁসওয়ালা পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। এর জুড়িওকোথাও নেই—তবে এর নিকটতম আত্মীয় হচ্ছেআমেরিকার উষ্ণমণ্ডলের ম্যানগ্রোভ অরণ্যবাসী সাধারণশ্রেণীর গোধিকা।

এদের একটা জিনিস একেবারেই অদ্ভুত ও নতুন ধরনের বলে তাঁর ধারণা হয়, সে হচ্ছে এই দ্বীপের স্থলচর বৃহৎকায়কচ্ছপকুল। যাদের নামে এই দ্বীপের নামকরণ।

এ ধরনের কচ্ছপ কোথাও নেই। তবে প্যাটাগোনিয়াদেশে প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম এই জাতীয় কচ্ছপের চিহ্ন বহনকরে বটে। দ্বীপগুলি যদিও উষ্ণ কটিবন্ধে অবস্থিত কিন্তু খুবগরম নেই এখানে। হুমবোল্ট মেরুপ্রদেশীয় স্রোত দক্ষিণমেরুর হিমশীতল অঞ্চল থেকে শীতল জলস্রোত বহন করে আনে এবং ৫৫°ডিগ্রী (ফারেনহাইট) উত্তাপের জলধারায়এই দ্বীপের চতুর্দিক বেষ্টন করে। কাজেই এখানে গরম খুবকম।

নিম্নঅংশের কোনো কোনো স্থানে মরুভূমিতে-দৃষ্টগাছপালা আছে, যেমন কাঁটাওয়ালা ও কাঁটাহীন ফণিমনসা, বাবলা-জাতীয় বৃক্ষ, মেসকিট ইত্যাদি। উপকূলের নিকটে যেখানে যেখানে বন্ধ সমুদ্রস্রোত দ্বারা জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে

ম্যাজানিনো নামে একপ্রকার গাছ দেখা যায়—এ গাছের পাতায় বিষ আছে। বিষাক্ত আইভিলতারন্যায় এর ক্রিয়া। দ্বীপের উচ্চতর অংশে শিলাময় মালভূমিরওপরে চিরহরিৎজাতীয় বৃক্ষাদি বহুবিধ ফার্ন পরগাছা, বড়বড় লতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়।

চিলি ও মেরুর মরুভূমিসদৃশ অঞ্চল পরিদর্শনের পরেএই বৃক্ষলতাসমাকুল দ্বীপের শ্যামল অরণ্যে এসে ডারউইন অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন, একথা তিনি ডায়েরিতে লিখেগিয়েছেন।

এই দ্বীপের বিশেষ আকৃতির জীবগুলির উৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব হল, এ সম্বন্ধে ডারউইন মাত্র দুটি কারণ খুঁজেপান। প্রথমটি তিনি মনে মনে অস্বীকার করেন। সেটি হচ্ছেপূর্বোক্ত আধিদৈবিক জীবসৃষ্টিবাদ-সংক্রান্ত মত। অর্থাৎ এইদ্বীপের প্রাণীগুলি বিশেষ করে এই দ্বীপের জন্যেই তৈরিহয়েছে।

কিন্তু আসলে প্রাণীগুলি আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্যওইজাতীয় প্রাণীর মতোই। পার্থক্য যা কিছু দৃষ্ট হয়, তা শুধুনির্জন দ্বীপের বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বহুদিন বাস করার দরুন। এই থেকে ডারউইন সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্য পারিপার্শ্বিক অবস্থারদ্বারাও পরিবর্তিত হতে পারে।

এইভাবে আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানের এক নতুন যুগের এবং নবদৃষ্টিভঙ্গির সূচনা।

আমি ডারউইনের ঠিক একশত বৎসর পরে এই দ্বীপে উপস্থিত হই এবং চ্যাফম নামে যে ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে ডারউইনসর্বপ্রথম অবতরণ করেন, সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে একটিক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করি।ছ'মাসকাল এই দ্বীপপুঞ্জেঅবস্থান করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। এই ছ'মাসেরমধ্যে আমি প্রায় সমস্ত বড় বড় দ্বীপগুলি পরিদর্শন করি।

ডারউইনের সময়েও যা, এখনো তাই। এই একশতবৎসরেও দ্বীপগুলির অবস্থা অপরিবর্তিতই আছে। চার্লসদ্বীপে সে সময় ইকোয়েডর গবর্নমেন্টের চালক গুরুতরঅপরাধীদের নির্বাসিত করা হত, ডারউইন একথা তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। উক্ত দ্বীপে এখনোনির্বাসিত ব্যক্তিগণই বাস করে, তবে বর্তমানে তাদের 'কমিউনিস্ট' বলা হয়।

ওই দ্বীপের মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ পর্বত আছে, তারস্পেনীয় নাম 'সেরো ডি পাজা'—এই পর্বতের পাদদেশে লাভাস্রোতের বুদ্বুদ দ্বারা উৎপন্ন কয়েকটি অদ্ভুত গুহাডারউইন দেখতে পেয়েছিলেন।

প্রত্যেক গুহাতে একজন করে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি বাস করত। এখনো ওইসব গুহাতে ওই অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরাই বাস করে।

একটি ব্রিটিশ মানোয়ারি জাহাজের নাম অনুযায়ী মাঝেরবড় দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে ইন্‌ডেফেটিগেব্‌ল দ্বীপ (Indefatigable Island); এখানকার অধিবাসীদের মধ্যেআমরা তাঁবু ফেললাম। এদের মধ্যে দিনেমার, নরওয়েবাসী, সুইডিশ, জার্মান প্রভৃতিবিভিন্ন জাতির লোক আছে।

এই দলটি এখানে এসেছিল কৃষিকার্য করে জীবিকানির্বাহকরবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাধারণত যেমন হয়ে থাকেএক্ষেত্রেও তাই, কৃষি উপনিবেশের মতলব মাঠে মারা গেল।উৎপন্নদ্রব্যের বাজার নেই; তাছাড়া এই পাথরের দেশেজিনিসপত্রও উৎপন্ন হয় কম।

এখন তারা যা জিনিস উৎপন্ন করে নিজেদের খাওয়ার জন্যেই। সুইডিশ অধিবাসীরা সাধারণত তামাক, কফি, আলুও অন্য কয়েকটি ফসল উৎপন্ন করে।

আমরা এখানে কয়েকদিন ছিলাম বলে দ্বীপস্থ অদ্ভুতদর্শনসরীসৃপ ও পক্ষিকুলের আকৃতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। এই দ্বীপের ইতিহাসে এইসবজীবজন্তুর বিশেষ করে এখানকার স্থলচর কচ্ছপকুলের উল্লেখ থাকবেই।

সেকালের জলদস্যুদের এই দ্বীপে অবতরণ করবার মূলেরয়েছে কিন্তু এখানকার এই বৃহৎ কচ্ছপকুল। জল এখানেঅপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য বটে কিন্তু কচ্ছপের মাংস যথেষ্ট পাওয়াযায়। জাহাজে কচ্ছপ ধরে নিয়ে গিয়েও বহুদিনজীবিতাবস্থায় তাদের রাখা যায়।

কচ্ছপের মাংসের লোভে পূর্বকালে বহুতর জাহাজ এইদ্বীপে নোঙর ফেলত এবং হাজারে হাজারে, লাখে লাখে (জলদস্যুদের লিখিত বিবরণে ঠিক এই সংখ্যাই উল্লেখআছে) কচ্ছপ নিহত হত নাবিকদের মাংস সরবরাহ করতে।এখনো

যে এদের বংশ নির্মূল হয়ে যায়নি, এ নিতান্তই আশ্চর্য। এই জাতীয় কচ্ছপ পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—কেবল সেশেল দ্বীপের প্রাণিশালায় বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ কয়েকটি অতিকায় কচ্ছপ ছাড়া। এই দ্বীপ থেকে বহু বৎসর পূর্বে লর্ড রথচাইল্ড একটি বিরাটকায় কচ্ছপ সংগ্রহকরেন; তার ওজন ছিল দুশো পাউন্ড (প্রায় আট মণ ?)।এদের ডিমগুলি দেখতে বিলিয়ার্ড বলের মতো। তা থেকেযখন প্রথম কচ্ছপের ছানা বার হয়ে দিনের আলোর মুখ দেখে, তখন খোলসুদ্ধ তাদের দৈর্ঘ্য দু'তিন ইঞ্চি, ওজনে তিন আউন্সের বেশি নয়।

প্রথম পাঁচ বৎসরের পরে এদের বৃদ্ধির পরিমাণ বছরেএক ইঞ্চি মাত্র, সুতরাং দুশো পাউণ্ড ওজনের একটা কচ্ছপেরবয়স দাঁড়াবে ১৭৫ থেকে ২০০ বছর। তারপর তো সে কচ্ছপ আরো পঞ্চাশ ষাট বছর কেন না বাঁচবে। দীর্ঘায়ু প্রাণীবটে এরা। গ্যালাপাগোস দ্বীপের এই অতিকায় কচ্ছপ নিরামিষাশী। ক্যাকটাস গাছের শাঁসালো পাতা খেয়েই বন্যঅবস্থায় এরা প্রাণধারণ করে। যদিও বন্দী অবস্থায় এরা যাপায় তাই খায়। যেমন ঘাস পেঁপে কলা ইত্যাদি।

বন্য অবস্থায় ফণিমনসার পাতা ছাড়া এরা অন্য দু-এক প্রকার গাছের সবুজ পাতাও খায়।

এদের অভ্যেস হল খুব ভোরে বাসা থেকে বেরোনো।বেরিয়েই এরা গাছের পাতা খেতে শুরু করে দেয়।

ফণিমনসার পাতায় শতকরা আশিভাগ জল, তা বাদেচিনি ও শ্বেতসার থাকায় এদের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য।

ফণিমনসার গাছের ঘন জঙ্গলও এই দ্বীপে যেন এজন্যতৈরি হয়েছে। দ্বীপের অনেক স্থানে উপকূলের সমতলঅংশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘন ফণিমনসার বন। কচ্ছপেরদলও এই বনে ভিড় করে থাকে। তবে সব দ্বীপে কিন্তুসমুদ্রের ধারে ফণিমনসার বন নেই। যেমন ডানকান দ্বীপে —যেখানে হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায় এই গাছ জন্মায়। সে দ্বীপে কচ্ছপকুলও বাস করে পাহাড়ের মাথায়।

দুপুরের খররৌদ্র বেচারিদের সহ্য হয় না। রৌদ্র চড়লেইওরা খাওয়া ছেড়ে গাছের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়, ছায়াপড়লে আবার বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে কচ্ছপগুলি খাওয়া বন্ধ করে এবং রাত্রির বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। যদি কেউ তাদেরবিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়, তবে তারা যে যেখানে থাকেসেখানেই মড়ার মতো অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে। সাধারণত লোকের বিশ্বাস আছে যে, কচ্ছপেরা নিদ্রার সময় খোলারমধ্যে মুখ ও পা গুটিয়ে শোয়। কিন্তু আসলে এ ধারণা ভুল।ওরা মাথা মাটিতে রেখে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোয়। এই নির্জনদ্বীপে কচ্ছপদের জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে। খাদ্য অন্বেষণ ওভক্ষণ কার্যেই তাদের জাগ্রতাবস্থা অতিবাহিত হয়, বাকি সময়টুকু কাটে ঘুমিয়ে।

কেবল এক সময়ে বছরের মধ্যে এদের জীবনের সেএকঘেয়েমিটা কাটে—জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে, এদেরডিম-পাড়ার সময়।

আমি ওদের ডিম-পাড়ার ব্যবস্থা এবং তা দেওয়ার পূর্বে ডিমগুলি রক্ষণ করার কৌশল বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করারঅবকাশ পাইনি। তবে যতটুকু পেয়েছি এই কথাই আমার মনে হয়েছে, ওরা নরম আর্দ্র মাটিতে ডিম পাড়ে এবং গর্তখুঁড়ে ডিমগুলি গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে রাখে !

ডিম ফুটলে বাচ্চাগুলি আপনা-আপনি মাটি খুঁড়ে বার হয়ে আসে, যদিও আমার বিশ্বাস বেশির ভাগ ছানাই মাটিরমধ্যে আঁকাবাঁকা গর্তের মধ্যে থেকে বার হতে পারে না।

মানুষ এ-দ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্বে সারা গ্যালাপাগোসদ্বীপে কচ্ছপকুলের কোনো শত্রু বর্তমান ছিল না। কিন্তু আজআর সেকথা বলা যায় না।

মানুষ তো আছেই, তাছাড়া বন্যশূকর, বন্যকুকুর ও বাঁদর। কচ্ছপের বাচ্চা যে নির্বিবাদে গর্তের মধ্যে বর্ধিতহবে তার আশা খুবই কম।

এরকম অবস্থা বেশিদিন ধরে যদি চলে, তবেগ্যালাপাগোস দ্বীপের অতিকায় কচ্ছপের বাহিনী অচিরাৎরূপকথায় পরিণত হবে।

কচ্ছপ বাদেও গ্যালাপাগোস দ্বীপে আর এক জাতীয়প্রাণী আছে, যাদের সর্বত্র দেখা যায়। এই জন্তুই প্রথমে চোখে পড়ে যখন কেউ এখানে প্রথম পদার্পণ করে। এক প্রকারের কালো বৃহদাকারের গোসাপ জাতীয়জীব—সমুদ্রের ধারের লাভা পাথরের ওপর সব সময় দেখাযাবে এরা শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এরা স্থলচর গোধিকা থেকে পৃথক জাতি—সমুদ্রচরগোধিকা—বৈজ্ঞানিক নাম Amblyrhynchus cristatus, এরা দেখতে মোটাসোটা ভীষণদর্শন জানোয়ার। তবে যে রকমেরভীষণ দেখতে, প্রকৃতি এদের সে রকম নয়, অনেক শান্ত ওনিরুপদ্রব প্রাণী এরা।

তবুও গ্যালাপাগোস দ্বীপের সমুদ্রবেলায় লাভাপ্রস্তরশায়ীএই ভীষণদর্শন সরীসৃপ মনে করিয়ে দেয় অতীত যুগের পৃথিবীকে, যখন এদেরই বৃহৎ সংস্করণ ডাইনোসর, প্লীসিয়োসর প্রভৃতি অতিকায় সরীসৃপকুল ভূপৃষ্ঠে অবাধে বিচরণ করত।

যখন ছোট থাকে তখন এদের দেহবর্ণ থাকে মিশকালো।যে লাভা প্রস্তরে ওরা দিনরাত শুয়ে থাকে, সেই পাথরের মতোই ওদের গায়ের রঙ হওয়ায় শত্রুর আক্রমণ থেকেওরা অনেক সময় উদ্ধার পায়। এমনভাবে পাথরের সঙ্গেওরা মিশে থাকে সে প্রথমে এদের টেরই পাওয়া যায় না—কেবলমাত্র যখন ছুটে পালায় তখন ছাড়া।

এই সব গোধিকা খুব বড় জাতেরও আছে, আবারছোটও আছে। ছোট গোসাপগুলি ছ’ইঞ্চি থেকে চোদ্দ ইঞ্চিপর্যন্ত সাধারণত হয়ে থাকে।

বড় জাতের গোধিকাগুলি তীরবর্তী জলজ ঘাসের বনেলুকিয়ে থাকে। এই সব ঘাসের বনে বেড়াবার সময়অতর্কিতে দু-একটা গোসাপের ঘাড়ে পা দেওয়াও বিচিত্রনয়। পুরুষ জাতীয় গোসাপগুলি চল্লিশ থেকে ষাট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, এদের দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী।

এদের গায়ের রঙ হলদে, তার ওপর কমলালেবুর ও কালোবর্ণের ছিট ছিট দাগ। এই দাগগুলিই এদের দেখতে এত ভয়ানক করে তুলেছে।

মানুষ কাছে এলে এরা মাথা নেড়ে ও লম্বা জিব বারকরে ভয় দেখায়। এদের মুখের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঝকঝকে, ধারালো দাঁতের সারি তখন বার হয়ে পড়ে।

এদের পিছনের পা জোড়া, কিন্তু এরা সাঁতারে অভ্যস্তনয়। জলে প্রবেশ করেই এরা চার পা এমনভাবে গুটিয়েফেলে যে জলস্রোত এদের কোনো বাধাদান করে না। সেঅবস্থায় লেজ সঞ্চালন দ্বারা এরা জলের মধ্যে দ্রুত অগ্রসরহয়।

এদের লেজ দেহের চেয়েও লম্বা এবং মেরুদণ্ডেরহাড়ের সবটা জুড়ে বড় বড় কাঁটা এদের গায়ে বর্তমান। মনেহয় সামুদ্রিক হিংস্র মাছ এদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনা, কারণ সমুদ্রের জলে বহুদূর পর্যন্ত এদের নির্ভয়ে সাঁতারদিতে দেখেছি।

জোয়ার নেমে গেলে জলমগ্ন পাথরের গায়ে লাগাশেওলা এদের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। সামনের দুখানা পাদিয়ে পাথরখানা জোর করে আঁকড়ে ধরে এরা ধারালোদাঁত দিয়ে পাথরের গা থেকে শেওলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

অ্যাকাডেমি উপসাগরের বেলাভূমিতে জলচরগোধিকার এ ভোজনদৃশ্য প্রায় রোজই আমার চোখেপড়ত। মাদী গোসাপ শীতকালে বালির মধ্যেআধডজনখানেক ডিম পাড়ে। এদের ডিমের ওপরটা একটাপুরু ছালে ঢাকা। ডিম থেকে খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা বার হয়, শীতের শেষের দিকে লাভা পাথরের ওপর দেখা যায় গোসাপের বাচ্চার ভিড় জমে রয়েছে।

আকৃতি ও গঠনে গ্যালাপাগোস দ্বীপের স্থলচর গোধিকাজলচর থেকে পৃথক।

স্থলচর গোধিকার লেজ ছোট, জলচর শ্রেণীকে সমুদ্রে সাঁতার দিতে হয়, কাজেই লেজ তার জীবনধারণের প্রধানসহায়ক—স্থলচরের ক্ষেত্রে সেকথা আদৌ খাটে না।এদেরমাথা বড় ও বেশি চওড়া, মুখের ছুঁচালো অংশ আরো লম্বা, শরীরও বেশি ভারী।

মাটির মধ্যে এরা ঢালু ধরনের গর্ত করে এবং সন্ধ্যাহবার পরেই গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। এরা সম্পূর্ণরূপেনিরামিষাশী—পূর্বোক্ত ফণিমনসার পাতা, ঘাস, অন্যান্যগাছের পাতা, ফুল ও ফল খেয়ে এরা জীবনধারণ করে।

কিন্তু নিরামিষাশী হলেও এরা হিংস্র। অনেক সময়মানুষকে তাড়া করে পর্যন্ত কামড়াবে। মিউজিয়ামের জন্যেগোধিকা সংগ্রহ করবার সময় অনেকেই এদের কামড়খেয়েছে। খুব সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে এদের নিয়ে কার্যকরা দরকার।

এ দ্বীপে জীবজন্তু বিশেষ করে কচ্ছপ ও গোসাপ ধরাআয়ের ব্যাপার, দু পয়সা আছে এতে। বিভিন্ন প্রাণীশালা ওমিউজিয়াম থেকে প্রায়ই লোক আসছে নমুনা সংগ্রহ করতে।

আমাদের একজন চাকর, টার্ভিনো এই দ্বীপেরই অধিবাসী। গোসাপ ধরতে সে ছিল ওস্তাদ।

টার্ভিনো গোসাপের পিছনে তাড়া করত। গোসাপওপরিত্রাহি ছুট্ দিত। কিন্তু অনেকদূর ছুটে গিয়েও কোনো গর্তে ঢুকবার সময় পেত না, অবশেষে পিছন ফিরে চেয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত। এই সময়ে গোসাপের হলদে চোখ সত্যিই রক্তবর্ণ হয়ে উঠত—এমন রক্তবর্ণ যে মনে হবার কথা, আরিজোনার শিংওয়ালা গিরগিটির মতো এরচোখ দিয়ে এখুনি রক্ত ঠিকরে পড়ে বুঝি।

এই মূর্তি দেখে আনাড়ি লোকের ভয় পাবার কথা, কিন্তু টার্ভিনো আনাড়ি লোক নয়। মিউজিয়ামের জন্য গোসাপবিক্রয় করা একটি ব্যবসা। সে পেছনে গিয়ে গোসাপেরলেজ ধরে তাকে মাটি থেকে তুলে ফেলত, গোসাপেরধারালো দাঁতওয়ালা মুখ সামনের দিকে বাতাসকেকামড়াবার চেষ্টা করত মাত্র, তার পরেই টার্ভিনো সেটাকেনিয়ে গিয়ে জালের ভেতর পুরে ফেলত।

আমরা গোসাপের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য কয়েকটিকে একটি খাঁচার মধ্যে রেখেছিলাম। তারা সেখানেডিম পাড়ত, এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি এবং তাদের ফটোগ্রাফও নিয়েছি।

যদিও গ্যালাপাগোস দ্বীপ ইকোয়েডরের ভীষণ অরণ্যানীথেকে ৫৬০ মাইল দূরে অবস্থিত, তবুও এখানকার পক্ষিকুলউষ্ণমণ্ডলের অরণ্যদৃষ্ট পক্ষীর সমান নয়। এখানে সামুদ্রিক জলচর পক্ষী বেশি, যেমন আলবেট্রস, পেনগুইন, মানোয়ারি পাখি, হিরণ ও সিন্ধু শকুন। হুড দ্বীপে যথেষ্টঅ্যালবেট্রস দেখা যায়। সাধারণত টিয়ের ভেলফুয়েগোরউত্তরে যে পাখি চোখে পড়ে না তাদের পক্ষে এত উত্তরে বাস করা আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই। পেনগুইন থাকা খুবআশ্চর্যের বিষয় নয়। হুমবোল্ট দক্ষিণ মেরুপ্রদেশীয় সমুদ্রস্রোত মেরুঅঞ্চল থেকে পেনগুইনের খাদ্য নানাপ্রকার মাছ ও জলজ কীট ভাসিয়ে নিয়ে আসে সমুদ্র উপকূলে।সুতরাং পেনগুইন এখানে সহজেই জীবনধারণ করতেপারে।

এক ধরনের করমোর‍্যান্ট পাখি আছে, যারা উড়তে পারে না। এদের ডানা আছে, কিন্তু পেনগুইনের মতো ডানাশূন্য পাখি নয় এরা।

অ্যালিবিমার্ল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাজলের ধারে করমোর‍্যান্টকুল বাস করে। সামুদ্রিক পাখি বলেই বোধ হয় জলচর গোসাপের সঙ্গে এদের খুব বন্ধুত্ব, প্রায়ই দেখা যায় পাশাপাশি রোদ পোয়াচ্ছে এরা। জন ও সার্ভিস দ্বীপে যথেষ্ট ফ্লেমিঙ্গো পাখি দেখা যায়। এই একমাত্রপাখি গ্যালাপাগোস দ্বীপে যাদের গায়ের রং দেখা যায়, নয়তো অধিকাংশ পাখিই একঘেয়ে ধূসর রংয়ের, নয়তোখালি সাদা।

আমরা একদিন একটা ছোট ডিঙিতে করে জার্ভিস দ্বীপেরওনা হই। এই দ্বীপটির ব্যাস কোথাও তিন মাইলের বেশিনয়। মনে হয় গোটা দ্বীপটি অ্যালবিমার্ল দ্বীপের ক্রেটারেরমধ্যে ঢুকে যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছিল,জার্ভিস দ্বীপের পর্বত থেকে কুয়াশার মেঘ রঙিন অস্ত আকাশে উঠছে। আমরা জার্ভিস দ্বীপে নেমে একটা ঘনবনের আড়ালে ক্ষুদ্র জলায় অনেক ফ্লেমিঙ্গো পাখি দেখতে পাই। জলাভূমির সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়, তার পিছনে কিছু দূরে হাজার ফুট উঁচু জার্ভিস পর্বত, ওর ধারে অতিকায়ফণিমনসার গাছ, রঙিন ফ্লেমিঙ্গো পাখির ঝাঁক জলের ধারে, জলের ওপরে। তীরে মোচাকৃতি মাটির ঢিবির অপেক্ষাকৃতসমতল মাথায় একটি করে ডিম। এখানেই যে ফ্লেমিঙ্গোপাখির ডিম পাড়বার ও তা দেওয়ার জায়গা বেশ বোঝা গেল। আমরা জায়গাটার ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলাম। বড়ইদুঃখের বিষয় এই যে, গ্যালাপাগোস দ্বীপের অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তু মানুষের অত্যাচারে নির্মূল হতে বসেছে। স্থলচর অতিকায় কচ্ছপের বংশ নির্বংশ হয়েছে পাঁচটি দ্বীপে। স্থলচর গোসাপের অবস্থা এ থেকে ভালো নয়। স্থানীয় অধিবাসীরাউড্ডয়নহীন অসহায় করমোর‍্যান্ট পাখীদের মেরে মাংস খায়বা শৌখিন ধনীরা বেড়াতে এসে প্রমোদতরীতে তুলে নিয়েযায়।

সুখের বিষয়, Galapagos Committee for the Advancement of Science এ বিষয়ে মনোযোগদিয়েছেন। এই কমিটিতে লর্ড ময়েন, স্যার এডওয়ার্ডপুলটন, ডক্টর জুলিয়ান হাক্সলি, প্রোফেসর সলসবেরিপ্রভৃতি বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে ইকোয়েডর গবর্নমেন্ট এক আইন পাশ করেছেন এই দ্বীপের জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্যে।কারণ গ্যালাপাগোস দ্বীপের এ জীবকুল নির্বংশ হয়ে গেলে প্রাণিবিজ্ঞানের দিক থেকে যে প্রভূত ক্ষতি হবে, তাকিছুতেই পূর্ণ হবার নয়। প্রত্যেক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই তা মনেপ্রাণে অনুভব করেন।

[উল্‌ফ গাং ফন হাগেনের বিবরণ হইতে]

রচনা-পরিচয়

ভ্রমণ-কথা

উত্তর ক্যানাডার জলপথ, বিচিত্রা, পৌষ, ১৩৩৬

কিলিমান্‌জারো—আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত, বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩৬

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত ভূভাগ, বিচিত্রা, বৈশাখ, ১৩৩৭

'যাচ্ছি যাব'র দেশ আফ্রিকা, অলকা, চৈত্র, ১৩৪৬

আরিজোনা মরুভূমির পর্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি, বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৭

কলোরাডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৩৭

নীল নদীবক্ষে ইজিপ্ট হইতে সুদান, বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৪২

কাপ্তেন কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস, বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৪২

ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ, বিচিত্রা, বৈশাখ, ১৩৪৩

লা সিবা, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এন্ডোরা, বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৪৩

ইউগান্ডা, বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

রাইডার হ্যাগার্ডের দেশে, বিচিত্রা, পৌষ, ১৩৪৩

কুইন মেরী, বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৪৩

আঙ্কোর্থ, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

মধ্য আফ্রিকার বন্যজন্তু, বঙ্গশ্রী, মাঘ, ১৩৩৯

উদ্যান রচনায় শিল্পীর হাত, বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৩৯

দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত পর্বত, বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৩৯

উত্তর কানাডায় রেডিয়ম খনি আবিষ্কার, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, ১৩৪০

হলদে ডানা টুনা মাছ শিকার, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, ১৩৪০

ইউকাডানের অরণ্যে প্রাচীন যুগের নগরের ধ্বংসাবশেষ, বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

ক্রিস্টোফার রেন, বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪০

কলোরাডো নদীপথে সাড়ে সাত শত মাইল, বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪০

পদব্রজে ইংল্যান্ডের পল্লীপথে, বঙ্গশ্রী, কার্তিক, ১৩৪২

মাইক্রোনেসিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চলে, বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৪২

এশিয়ার নদীপথে, বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

বাইবেল-প্রসিদ্ধ পেট্রা, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, ১৩৪৪

অজ্ঞাত তুবা জাতির দেশে, বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪৪

ফরাসী ইন্দোচীনের পথে, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ, ১৩৪৪

নর্ত ক্যারোলিনার ধীবর দল, বঙ্গশ্রী, ভাদ্র, ১৩৪৪

হোরেস; রোমের পল্লীপ্রকৃতির কবি, বঙ্গশ্রী, কার্তিক, ১৩৪৪

উড়োজাহাজে পৃথিবীভ্রমণ, বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৪৪

সুইডেনের পল্লীপ্রান্তে, বঙ্গশ্রী, মাঘ, ১৩৪৪

ম্যাডিরা দ্বীপ, বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৪৪

আইল অফ ম্যান, বঙ্গশ্রী, চৈত্র, ১৩৪৪

নাগাপর্বত ও সারামতী, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, ১৩৪৫

আগ্নেয়গিরির দেশ গোয়াতেমালা, বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

নৌকায় ইউরোপের নদীপথে, বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪৫

ওকেফিনোকি বনাঞ্চল, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ, ১৩৪৪

মরুভূমির শহর টিউনিস ও প্রাচীন কার্থেজ, বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও তার অদ্ভুত জীবজন্তু, বঙ্গশ্রী,অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

[সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত